

গোয়েন্দা উপন্যাসিকা
স্যাংচুয়ারি
অতিথাকৃত উপন্যাসিকা
ঘুমবাড়ি
গুচ্ছ হরর গল্ল
ভয়াল চতুষ্টয়

অক্টোবর, ২০১৪

রহস্য পত্রিকা

Banglapdf.net



পিশাচ কাহিনি
গন্ধর
দুটি রহস্য গল্ল
সাইকো ও শেষ চাল
রোমাঞ্চ গল্ল
নিয়তির টানে

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!



Visit Us at
Banglapdf.net

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!



অঙ্গোন, ২০১৪



সম্পাদক কাজী আনোয়ার হোসেন

সহকারী সম্পাদক
কাজী শাহবুর হোসেন
কাজী মায়মুর হোসেন

শিল্প সম্পাদক
প্রক্র. এবং

প্রকাশনা ও মুদ্রণ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
সেন্টনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেন্টনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগ

রহস্যপত্রিকা

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেন্টনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

জি.পি.ও বক্স নং ৮৫০

টেলিফোন: ৮৩১৪১৮৪

মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৮০৫০

mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩০২৭

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

মূল্য | আটব্রিশ টাকা

ফিচার

জানবার কথা ৬

কলম হক টোকুরী

দাঁত ও মুখের প্রাক্তিক

চিকিৎসা ৪৮

জি. মোঃ ফারুক হোসেন

প্রস্তাবে অ্যালবুমিন ৬৫

জি. মোঃ ইসলাম কুরী গাজো

প্রশ্ন-উত্তর ৮২

বিদ্যা ইয়াসমিন

জনা-অজনা ১০০

শাহীন মেলিয়া

কুখ্যাত ৫৮ ঘটনা ১১৬

সামাজিক মেরামত

মনোবৈজ্ঞানিক বড় গল্প

আরোগ্য ৮

ইয়াবন ধৰ্ম

ইত্য ৮৪

সাইকো ২২

বিলাতুল আলম শাখা

শেষ চাল ১০১

ভাবক মাঝ

বিষাক্ত প্রজাপতি ১২৭

বুরুল কাহার

প্রত্রাজকের জার্নাল ১

মধ্যমুগ্ধের এক বিকেলে ৩১

ভারেক দ্রু

সময়ের শুচ গল্প

??! ৩৬

মাস্য

আরও রয়েছে *****

খোলা চিঠি ৫ বিজ্ঞান বার্তা ২০ আপ্নার বাস্থ ৪০ শব্দ-ফাঁদ ৪৪

ভাগচক্র ১০৫ খন্তিত্ব ১১৩ ঘর-সংসার ১২২ তিনটি অভিজ্ঞতা ১৩২

শৃঙ্খিচরণা ১৩৯ বই-পরিচিতি ১৪৪

পিশাচ কাহিনি

গদ্দর ৪৫

শাবিল মাশকিল আলম

গুচ্ছ হরর গল্প

ভয়াল চতুর্ষয় ৪৯

জোকির হস্তি উর বাকি

গোয়েল্ডা উপন্যাসিকা

সাঙ্গুর্যারি ৬৬

সারেম দোশার্থী

অভিপ্রায়ত উপন্যাসিকা

ঘূর্ণবাড়ি ৮৪

আকাশ হোলে

বোমাখ গল্প

নিয়তির টানে ১০৮

হনু পিচির

ইতিহাসের গল্প

জীবন সায়াহে ১১৪

কবেল কাটি নাম

সারেল কিকশন

কিউপিড-ব্যালাস ১১৮

আবৃত্ত পাক্ষৰ মনি

অ্যাম্প

চা-বাগানের বুকে

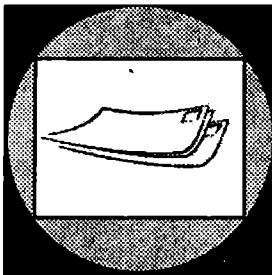
সমনভাগ লেক ১৩৭

বিস্ত মৌর্য

রহম গল্প

অপারেশন অয়েলহেডেন ১৪১

বাস্তু ধৰ্ম



মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

আবুল কালাম আজাদ
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

সে টেক্সেরের
রহস্যপত্রিকাটা হাতে
নিয়েই মনটা ঝুশিতে ভরে
গেল। কল্পনাও করতে পারিনি
এতে রকিব হাসানের
সাক্ষাত্কার ছাপা হবে।
ছেটবেলায় সবচেয়ে পছন্দের
বই ছিল তিনি গোয়েন্দা। বড়
হবার পর তিনি গোয়েন্দা পড়া
শাভাবিকভাবেই কমিয়ে
দিয়েছি। ওই জায়গাটা ছেড়ে
দিয়েছি কমবয়সীদের জন্য।
নিজে সবে এসেছি মাসুদ
রানা, ওয়েস্টার্ন, অনুবাদ
এবং হররের দুনিয়ায়।
তবে তিনি গোয়েন্দার স্বাদে
রকিব হাসান আমার সবচেয়ে
প্রিয় লেখক। ফেসবুকে এবং
রংগে বিভিন্ন জায়গায় তাঁর
সাথে সেবার সম্পর্ক নিয়ে
কিছু নেতৃত্বাত্মক কথা চোখে
পড়েছিল। খুব মন থারাপ
হয়েছিল ওগুলো পড়ে। কিন্তু
সাক্ষাত্কারটা পড়ে জানতে
পারলাম ওগুলো কেবলই

মিথ্যে সাজানো নাটক। খুব
অবাক হলাম। খুবাতে
পারলাম সবকিছু। কারা
করেছে এবং কেন করেছে।
সেবার উচিত অনলাইনে
সক্রিয় হওয়া। অন্তত একটি
ওয়েবসাইট এবং একটি
অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ
এখন সময়ের দাবি। কি
বলেন, কাজীদা?

লেখক তোফির হাসান উর
রাকিবকে ধন্যবাদ এত
চমৎকার একটি সাক্ষাত্কার
আমাদেরকে উপহার দেবার
জন্য। তিনি নিজেও আমার
একজন পছন্দের লেখক।
রহস্যপত্রিকায় তাঁর লেখা সব
সময়ই আমি আগ্রহ নিয়ে
পড়ি। দৰ্দান্ত লেখেন তিনি।
তবে রকিব হাসানের
সাক্ষাত্কারটা আরও বড় হলে
পূর্ণ তত্ত্ব পেতাম। তাই তাঁর
কাছে এবং কাজীদা, আমরা
কাছে আমার কিছু দাবি
আছে। আমরা এমন
সাক্ষাত্কার রহস্যপত্রিকায়
নিয়মিত চাই। এত অল্পতে
কি আর আমাদের মন ভরে?
আগে রহস্যপত্রিকায় নিয়মিত
লেখক পরিচিতি এবং
সাক্ষাত্কার প্রকাশ হত।
পাঠকদের কাছে সেটা অনেক
আকর্ষণীয় একটা বিভাগ ছিল
বলেই জানি। আমরা চাই
অন্তত সেবার বষ্যীয়ান
লেখকদের সাক্ষাত্কার যেন
রহস্যপত্রিকাতে আমরা পাই।
এবং তরফটা যেন কাজী
পরিবারকে দিয়েই হয়।
আপনার সাক্ষাত্কার চাই,

কাজীদা, কাজী শাহনূর
হোসেন এবং কাজী মায়মুর
হোসেনের চাই। জানতে চাই
আমাদের সবার প্রিয় সেবা
পরিবার সম্পর্কে। আপনাদের
প্রতি পাঠকদের অনেক
ভালবাসা, তাই আপনাদের
ব্যাপারে জানার অধিকারও
তো আমাদের রয়েছে। কি
বলেন, কাজীদা? দয়া করে
আমাদেরকে হতাশ করবেন
না। সেবা প্রকাশনীর সর্বাঙ্গীণ
মঙ্গল কামনা করি।

বৈয়দা তাহসিনা
সিলেট।

সে টেক্সের ২০১৪
সংখ্যাটির জন্য র.প.-কে
ধন্যবাদ। এই সংখ্যায় প্রদেয়ে
রকিব হাসানের সাক্ষাত্কার
ছাপা হয়েছে যা আমরা
পাঠকরা দীর্ঘদিন ধরে আশা
করছিলাম। তোফির হাসান
উর রাকিবকে ধন্যবাদ
সময়োপযোগী সাক্ষাত্কারটি
নেয়ার জন্য। সেবা
প্রকাশনীর আরও যে
পাঠকপ্রিয় লেখকরা এখন
দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছেন
তাঁদের সাক্ষাত্কার পরবর্তী
সংখ্যাগুলোতে পেলে খুব
ভাল লাগবে। কাজীদা-র
একটি সুনীর্ধ সাক্ষাত্কার
পাওয়ার জন্য আমরা বিশেষ
উদ্বীব!

সবশেষে, র.প.-র মাধ্যমে
সেবা, সেবার স্মষ্টা কাজীদা,
এবং অতীত, বর্তমানের সব
লেখককে ভালবাসা জানাতে
চাই। ■

জানবার কথা

ফজলুল হক চৌধুরী

আরব নাবিকেরা তাদের মরক্কুমির মাদি
মোড়া সিংহলের জঙ্গলে ছেড়ে দিত।

এক

বাংলাদেশের নিজস্ব গাছের নাম—হিজল ও পাব। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও এই গাছ দুটি হয় না। মোগল যুবরাজ খসরক (পরবর্তীতে স্বাইট জাহাঙ্গীর) সুবে বাংলায় সফরে এলে হিজল ফুলের লাল ঝুপ দেখে এতই মুক্ষ হন যে তিনি লাহোরে মোগল গার্ডেনে হিজলের কয়েকটি চারা নিয়ে শিয়েছিলেন। এদেশের দু'চালা ঘর তাঁর এতই পছন্দ হয়েছিল যে তিনি শালিমার গার্ডেনে চন্দনুরকির কয়েকটি ঘর তৈরি করেছিলেন। আর্মি লাহোরে বেঢ়াতে শিয়ে হিজল গাছ ও ওই বৃক্ষ দুটি ঘর দেখেছি। বর্তমান শরিয়তপুরের ইংরেজ আমলে এক হিন্দু পুরোহিত বাড়িতে তাঁর পুঁজার ঘর দেখেছি। ওই জেলার তথন নাম ছিল পানং। শালিমার গার্ডেনের হিজল গাছে ফুল ও ফল দেখিনি। হিজল ফল দেখতে হরিতকীর মত :

দুই

উত্তর ভারতের সর্বত্র হিন্দুরা পানিকে বাঙালী হিন্দুদের মত জল বলে না। তারা বাঙালী মুসলিমদের মত দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা-চাচী, ফুকা ইত্যাদি বলে। বাঙালী ব্রাক্ষণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্য জাতের হিন্দুরা পৈতা ব্যবহার করে না। কিন্তু উত্তর ভারতের সকল শ্রেণীর হিন্দু পৈতা ব্যবহার করে।

সিলেটে ও চট্টগ্রামে চ্যাটার্জি, মুখার্জি, ব্যানার্জি পদবীধারী কোন হিন্দু নেই। তবে, দেব, ভট্ট, ভট্টাচার্য, আচার্য, চক্রবর্তী, গাঙ্গুলী আছে। এরা সংখ্যায় কমে যাচ্ছে।



তিনি

বাংলাদেশের গোমতী নদীর জল বাংলায় ও এই দেশেই সীমাবদ্ধ। এর জোয়ার-ভাটা শুরু একটা দেৰা যায় না।

সুবান্দু বেল ফল বাংলাদেশ ও আসাম ছাড়া অ্যাত্র জলে না। পাট ও পল্ল ফুলের আদি জন্মস্থান মিশ্র। এই পাট শাক জাতীয়। বাংলাদেশের পাটের মত এর কোন আঁশ ও সুতা হয় না। নীলপঙ্ক্তি হিমালয়ের মানস সরোবরে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ওই নীলপঙ্ক্তি ছোট শাপলা ফুল। পরের কোন মধ্য নেই। পদামধুর কোন অস্তিত্ব নেই। তরমুজ মরক্কুমির ফল। আদি জন্মস্থান কালাহারি মরক্কুমি।

চার

একটা শূন্য ও নয়টি সংখ্যা (১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,০) দুনিয়ার সর্বত্র Arabic numerals নামে পরিচিত। ভারতের গুজরাটের হিন্দু বৈশ্য সম্প্রদায় এই পদ্ধতির আদি আবিক্ষারক। তাদের কাছ থেকে

আরব ব্যবসায়ীরা এটা শিখে দুনিয়ার সর্বত্র প্রচার করে। সুতরাং এর নাম হওয়া উচিত Gujrati numbers. গাঢ়ী ও জিন্নাহ দুজনেই গুজরাটী।

পাঁচ

আরবী তাজি ঘোড়ার সুনাম দুনিয়াজোড়া। আরব নাবিকেরা তাদের মরম্ভমির মাদি ঘোড়া সিংহলের জঙ্গলে ছেড়ে দিত। জংলী পুরুষ ঘোড়ার ওরসে এই ঘোড়াই ‘তাজি আরবী’। সুতরাং এর নাম হওয়া উচিত ‘সিংহলী ঘোড়া’। হীনযান বৌদ্ধ যুবরাজ বাঙালী ছিলেন। তাঁর উৎপাতে অস্থির হয়ে প্রজারা নালিশ করলে তাঁর পিতা তাঁর দলবলসহ নির্বাসন দিলে তিনি পালের জাহাজে করে সিংহলে অবতরণ করে ওই দেশে আবাদ করেন। মানুষ ও ঘোড়ার কোন প্রজনন সিজন নেই। বর্তমানে এই দেশ প্রীলংকা নামে পরিচিত।

ছয়

ইংল্যান্ডের রাজা ব্রান্সি আমৃত্যু রাজত্ব করেন। কোন শাসন করেন না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ৪ বছর শাসন করেন। রাজত্ব করেন না। বাংলাদেশের ও ভারতের প্রেসিডেন্ট রাজত্ব বা শাসন কোনটাই করেন না। ■

বিঃ দ্রঃ আমার কাছে ২০০৬ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত রহস্যপত্রিকা আছে। কারও যদি ওই সময়ের কোন সংখ্যার দরকার হয় তবে মীচের ঠিকানায় ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করুন।

ফজলুল হক চৌধুরী

বাড়ি নং ৭০ আরবান লোটাস অ্যাপার্টমেন্ট নং ৫
বি-৬তলা রোড নং ৮/এ সাত মসজিদ রোড,
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫।



অচিরেই আসছে রোমাঞ্চ-হরর কাহিনি ঈশ্বরী

তৌফির হাসান উর রাকিব
ঈশ্বর আর শয়তানের রাজত্বে কে এই
ঈশ্বরী? কেন এতকাল গোটা
মানবজাতির কাছে গোপন রাখা
হয়েছে তাঁর কথা? সত্যিই কি তিনি
দিতে পারেন অমরত্ব? জানতে হলে
পড়তে হবে—ঈশ্বরী!

দুটি উপন্যাসিকা সহ সর্বমোট দুই
ডজন ছেটবড় লেখা নিয়ে আমাদের
এবারের নৈবেদ্য। বইটির প্রতিটি
পাতায় পাতায় রোমাঞ্চ, চমক, ভয়,
শিহরণ, আর অসহ্য সাসপেন্স। পড়া
শুরু করার পর থেকে শ্বাসরোধকর
উত্তেজনায় কাটিবে আপনার প্রতিটি
মুহূর্ত! রহস্যপত্রিকার সময়ের অন্যতম
জনপ্রিয় লেখক তৌফির হাসান উর
রাকিব-এর নিখাদ মৌলিক গল্পের
মায়ারাজ্য আপনাকে জানাই সাদর
আমন্ত্রণ। তবে সাবধান! এ রাজ্যে
একবার ঢুকলে আর বের হতে
চাইবেন বলে মনে হয় না!

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

অ্যারোসল

ইমরান খান

সে হাঁটু
দিয়ে
বাটার
গলা
পিয়ে
ধরল।
জিভ
বেরিয়ে
এল

চেয়ারম্যানের।



এক

নি

জেকে হঠাত হঠাত খুব বয়ক মনে হয় ননতুর। এটা মনে হওয়ার অন্যতম কারণ তার ভুলোমন। এমন সব কাজ করতে সে ভুলে যায়, যা কি না বয়ক মানুষেরই সাজে। ঘর থেকে বেরোনোর সময় পাখা বন্ধ করতে ভুলে যাওয়া, চুল আঢ়াতে ভুলে যাওয়া, এমনকী মাঝে মাঝে রাতে ঘুমোতে পর্যন্ত ভুলে যায় সে। রাত প্রাণ্তবয়ক হলেই তার মধ্যে নানান বোধ কাজ করে। সমস্ত পথবী, মহাবিশ্ব, মহাকাল, সৃষ্টিগৎ এক দুর্জ্জের রহস্য হয়ে ধরা দেয় তার মানসপ্তটে। সেই অঙ্গীয়াসনের রহস্য এতটাই হতভিস্তুল করে দেয় তাকে, যে ঘুমনোর কথা বিস্তৃত হয়।

সঙ্গাহ দেড়েক ধরে প্রতিদিনই সে বেরোবার সময় তাবে, আজ ফেরার পথে অবশ্যই এক বোতল অ্যারোসল কিনে ফিরতে হবে; ফেরার সময় একদিনও মনে থাকে না, ঘরে এসে কাপড় বদলানো মাত্র মনে পড়ে; তখন অ্যারোসল কিনতে যাওয়া মানে আবারও পাঁচতলা থেকে নেমে আবারও ওঠা; শরীর সায় দেয় না, কিংবা কে জানে, হয়তো মনও সায় দেয় না; অথচ এক বোতল অ্যারোসল তার জরুরি ভিত্তিতে দরকার, ইদানীং তেলাপোকার ওয়ুধগুলো কোনও কাজের না, নকরোচ বাজার থেকে উঠে গেছে, অথচ ওটাই ছিল কাজের; তবে অ্যারোসল পছন্দ করার প্রকৃত কারণ হলো, অ্যারোসল দিলে তেলাপোকারা আদিম পাখা ফরকরিয়ে ঘরময় ছুটে বেড়ায়, আপনা-আপনি চিত হয়ে পড়ে পাঞ্চলো উর্দ্ধমুক্তি ভুলে ছুটফট করে মরে, নৃশংস এই দৃশ্য দেখতে ননতুর বড় ভাল লাগে; ঘরে তেলাপোকা বেড়ে যাচ্ছে জ্যামিতিক হারে, এই প্রাণীটিকে মনে-প্রাণে শৃঙ্গ

করে সে; অনেকের তেলাপোকার ব্যাপারে ফোবিয়া থাকে, নন্তুর তা নেই, মেঝেতে তেলাপোকা দেখে সে লাফিয়ে থাতে ওঠে না; তার তেলাপোকে অপছন্দ করার প্রধান কারণ, এরা তার শর্খের বইগুলোকে কেটে ফেলছে; বই হচ্ছে তার ঘরের এবং মনের একমাত্র শোভা; সঙ্গে অস্তি একটি বই না হলে তার এক সঙ্গাহের খোরাক হয় না, প্রতি বহুস্মিতিবার আজিজ মার্কেট, নীলক্ষেত্র কিংবা নিউমার্কেটে একবার টু দিতে কখনও ভুল হয় না তার; এই কঠোর, কঠিন, বাস্তবতা জর্জরিত জরাহস্ত পৃথিবী থেকে তাকে দু'দণ্ড শান্তি দেয় তার বইগুলো; বইয়ের দুই মলাটোর মাঝে যেন বল্দি করা আছে এক টুকরো স্বাধীনতা, বইয়ের সাদা পাতায় কালো অক্ষরগুলো যেন তাকে কোনও এক উটোপিয়ার সন্ধান দেয়; বই তাকে বস্তি দেয়, শান্তি দেয়, আশ্চর্য করে কানায়, যে কান্না মনকে পরিশুদ্ধ করে দেয়; না, বই তাকে বাস্তব বিমুখ করে তোলে না, বরং আরও বেশি করে বাস্তবকে চিনিয়ে দেয়, সাহিত্যের প্রতি অক্ষ নেশা তাকে আরও বেশি করে দেখতে শিখিয়েছে, মানবসৃষ্ট বাস্তবের আড়ালে যে সার-বাস্তব, সামাজিক মানুষের আড়ালে যে কৃপ-মানব, পর্দাৰ ওপাশে যে জগৎ, সেখানে উকি মারার একটা সুযোগ বই দিয়েছে তাকে; নিতান্তই অগোছাল মানুষ নন্তু, নিতান্তই অসংযোগী। সবিকছুই এলোমেলো তার ঘরে, ওপু শর্খের বইগুলো বুকশেলফে সংযোগে সাজানো, প্রতিদিন ঘরে ফিলে তার প্রথম কাজ হচ্ছে, বইগুলো ঝাড়মোছ করা, তারপর হাতমুখ ধূতে যাওয়া; এই বুকশেলফে বইগুলো সুরক্ষিত নয়, স্টিলের প্ররন্তো শেলফ, চারদিক খোলা, ধূলো-ময়লা ঢেকে, ঢেকে তেলাপোকা; অর্থাৎবে একটা ভাল শেলফ বানাতে পারছে না, যে বেতন পায়, পাকসুলী আর বাড়িওয়ালার চাহিদা মেটাতেই তার অধিকাংশ খরচ হয়ে যায়।

নন্তুর ধারণা, প্রতিদিনই অ্যারোসল কিনতে ভুলে যাবার পেছনে তার অবচেতন মনের কোনও হাত আছে। অবচেতন মনের কোথাও হয়তো তেলাপোকা আগামির প্রতি এক ধরনের মতমা আছে তার। ডাইনোসরের সমসাময়িক প্রাণীগুলোকে এই আগামিকে

হত্যা করতে তাকে বাধা দিচ্ছে তার অবচেতন মন। এ হলো তার যৌক্তিক মনের বিচেচনা। কিন্তু ঘূর আসার ঠিক আগ মুহূর্তে, যখন বৰ্ক চোখের পর্দায় নিয়ন্ত্রণহীন কিছু টুকরো ছবি ভাসে, তখন হঠাৎ হঠাৎ নন্তু মানুষ আর তেলাপোকা পাশাপাশি দেখে, দেখে তেলাপোকারা ঘরের কোণে কোণে মানুষ মারা বিষ দিয়ে রাখছে, তারপর একসময় তেলাপোকা আর মানুষের বিভেদেরেখার শেষ বিন্দুটুকু মুছে যায়, আর সেই মুহূর্তে নন্তু অবিকল নিজেকে দেখে। কিন্তু এই বাধা মাননে চলবে না, নন্তু জানে। প্রাণৈতিহাসিক কাল থেকে অনেক কিছুই চলে আসছে সমাজে, তার সবকিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই, কোনও এক সকালে উঠে নন্তু সিন্ধার্জ নেয়, সারাদিন যেখানেই থাকুক, একটু পরপর নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হবে আ্যারোসলের কথা। আর আসার সময় আজিজে একটু ঘূরে আসতে হবে। মিলান কুণ্ডের লাইফ ইয় এলসওয়্যার-এর একটা লো প্রাইস এডিশন এসেছে। দেশে মানুষ বেড়ে যাচ্ছে জ্ঞানিতিক হারে, হাজার হাজার মানুষ ঢাকার রাস্তায়, নন্তুর ভালই লাগে মানুষের ডিডি, মানুষই যদি না থাকবে তবে আর থাকবে কী? তার আশপাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া প্রতিটি মানুষের মুখ সে দেখে নিতে চেষ্টা করে, মনে হয় প্রত্যেকটি চেহারায় একটি করে গল্প লেখা আছে; আহ! এরা প্রত্যেকে যদি তার পাশে বসে নিজের জীবনের গল্পটা শনিয়ে যেত! নন্তু তার সারাটা জীবন খরচ করতে রাজি আছে, শুধু মানুষের জীবনটা বোঝার জন্য; চারিদিকে এত মানুষ। সবার চোখে একটা তীক্ষ্ণ অনুসরকিংসা, কী খোঁজে মানুষ? একটা অ্যারোসল কিনতে হবে... লাইফ ইয় এলসওয়্যার। জীবন অন্য কোথাও।

হঠাৎ প্রায় একশ' আশি ডিয়ি ঘূরে যায় নন্তু। ঘূরে যাবার হেতু একটা ধাক্কা। একজন মাবৰয়সী মানুষ তার কাঁধে একটা ভোঁতা ব্যাথার অনুভূতি দিয়ে চলে গেছে। দেখে দিনমজ্জুর মনে হয়। সোকটা আসছিল উটোদিক থেকে। নন্তু ব্যাবতই তার কাঁধটা একটু পেছনে হেলিয়ে দিয়েছিল, যাতে ধাক্কাটা না লাগে। সোকটাও যদি তার কাঁধটা একটু

পেছনে নিত, ধাক্কাটা লাগত না। সে তা করেনি। সোজা হনহন করে হেঁটে এসেছে গভীর চিন্মায় অবস্থায়। নন্তুর এই অভিজ্ঞতা নন্তুন নয়। মাঝেমধ্যেই এই ধাক্কা খায় সে। গতকালও একজন চাকরিজীবীর দেয়া আঘাত পেয়েছে। ধাক্কা খেয়ে-বেয়ে তার অভ্যন্তর হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। হয়নি। প্রতিবার একই মাত্রার বিশ্বয় নিয়ে সে ধাক্কা দিয়ে যাওয়া মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে আর চিন্তা করে, কী এত ভাবে মানুষ? একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে এভাবে ধাক্কা দিয়ে চলে যেতে পারে! কাঁধ কখনও এগিয়ে তো দেয়নি সে, পিছিয়েই দিয়েছে বরাবর আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। তবু কেন এই ধাক্কা! সে মধ্যবিত্ত বলেই কি শ্রমিক তাকে ধাক্কা দিয়ে গেল? লাইফ ইয় এলস্সুওয়্যার কিনতে হবে... এক বোতল অ্যারোসল।

বাস স্টপেজে এসে থমকে যায় নন্তু, ঘাপটি মেরে থাকা অজগরের মতই কৃষ্ণী পাকানো একটি মানব-সারি এঁকেবেঁকে স্থির হয়ে আছে বাসের অপেক্ষায়, একটি টিকেট কিনে নন্তুও দাঁড়ায় লাইনের পেছনে, দেখতে দেখতে তার পেছনেও মানুষ জমতে থাকে, লম্বা হতে থাকে বৰ্বসুখাপেক্ষী যাত্রীর সারি, লাইনের পেছন থেকে নন্তু বাতারাতি চলে আসে মাঝাখানে, মগজ গলিয়ে দেয়া দাবদাহ পরিবাহী বোন্দে দ্রুমবধ্যান জনতাৰ সারিৰ মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে খোঁচা খোঁচা দাঁড়িতে ছাওয়া চোয়াল ডলতে ডলতে নন্তুৰ হাত্তাঁই মনে হয়, মানুষ মাঝই পৰমুখাপেক্ষী— তীব্র গরমে বৃষ্টিৰ মুখাপেক্ষী, যাতায়াতে নিজ সৃষ্টি যানবাহনেৰ মুখাপেক্ষী, নিকৃপায় অবস্থায় অদৃশ্যেৰ মুখাপেক্ষী; মানুষই কি নিজেকে মুখাপেক্ষী করেছে, নাকি অদৃশ্য নিজেৰ শ্রেষ্ঠত্ব প্ৰমাণেৰ জন্য মানুষকে মুখাপেক্ষী করে রেখেছে?

বাস আসা মাঝই একটা তীব্র হঢ়েছড়ি শুক হয়ে যায়। মানুমেৰ অস্ত্ৰিতা দেখে মনে হয় বাস নয়, কোনও দেবতাৰ আৰ্বিতাৰ হয়েছে। অলোকিক কোনও উপায়ে নন্তুৰ পেছনে থাকা মানুষভলো চলে আসে তাৰ সামনে। নন্তুৰ আগে তাৰাই ছান কৰে নেয় বাসদেবতাৰ আৱশ্যে। জনতা এগিয়ে যায়

প্ৰোত্ৰে মত অবিৱাম, আৱ প্ৰবাহিত বৰ্নাৰ মাঝাখানে একটি পাথৰখণ্ডেৰ মতই স্থিৰ হয়ে থাকে হতবিহুল নন্তু। মিলান কুণ্ডো এবং এক বোতল অ্যারোসল ঘুৰতে থাকে তাৰ মাথায়। জনাকীৰ্ণ বাস আৱ আৰু ভীড়াক্রান্ত হয়ে ওঠে। যাত্ৰীদেৰ হঢ়েছড়ি আৱ কঢ়াষ্টৱেৰ বিশ্বিউড়ে অসুস্থ, নিৰীহ আৱ তুচ্ছ বাসটি কেবল গোঙায় আৱ কালো ধোঁয়া ছেড়ে প্ৰতিবাদ কৰতে চেষ্টা কৰে। একেবাৰে অস্তিম মুহূৰ্তে একটি লাফ দেয় নন্তু, ধৰেও ফেলে অবেশপথেৰ পান্না। একটি পায়ে দখল কৰে পাদানীৰ এক বিহৎ জায়গা। শুয়োৱেৰ মত ঘোৰ-ঘোৰ আওয়াজ তুলে এগোয় বাসটি। বাসেৰ গতিৰ ওঠানামাৰ সাথে সাথে ওঠানামা কৰে নন্তুৰ অনিয়ন্ত্ৰিত শ্ৰীৱীৰ। সে অনুভব কৰে, তাৰ কোনও ইচ্ছা কিংবা হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাৰ নিজেৰ শ্ৰীৱীৰটা একবাৰ উঠছে, একবাৰ নামছে, একবাৰ ডাইনে হেলছে, একবাৰ বামে। মনেৰ ইচ্ছা ছাড়াই শ্ৰীৱীৰেৰ এই ষেছাচৰিতা মেনে নিতে পাবে না সে। হঠাৎ বগলে নৰম রাবাবেৰ বলেৰ মত একটা চাপ অনুভব কৰে নন্তু। ডানদিকে তাকিয়ে দেখে, তেইশ-চাৰিশ বছৰেৰ একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গামেষ্টসেৰ মেয়ে হবে হয়তো। তিল ঠাঁই বিহীন বাসে মেয়েটিৰ শ্ৰীৱীৰ নন্তুৰ শ্ৰীৱীৰে প্ৰায় লেন্টে আছে। ইতোমধ্যে দুগঞ্জ ছড়াতে শুক কৰা ঘৰ্যাক বগলে মেয়েটিৰ উষ্ণ এবং পুৰুষ্ট স্তনেৰ উজেজক চাপ এবং শক্ত হাঁটুৰ বাটিতে মেয়েটিৰ উৱৰ কোমল প্ৰশস্ততা অনুভূত হয়, মেয়েটি নিৰিকাৰ ভান কৰে জানালাৰ বাহিৰে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তাৰ চোখে মাকড়সাৰ জালে ফেঁসে যাওয়া নিৰুপায় যাছিৰ অসহায় দৃষ্টি চোখ এড়ায় না নন্তুৰ; ওই অসহায়তাকে উপেক্ষা কৰতে বড় ইচ্ছে হয় তাৰ, সাধ জাগে এই অগ্ৰীভিকৰ যজ্ঞগানায়ক অনিচ্ছিত যাত্রাৰ পুৱোটা সময় ওই খেটে খাওয়া সুগাঁচিত শ্যামল শ্ৰীৱীৰে সবচৰু উত্তাপ নিজেৰ শ্ৰীৱীৰ আৱ হৃষিপথে ওষে নেয়; কিন্তু শ্ৰীৱীৰেৰ ভেতৱে যে আৱেকটি শ্ৰীৱীৰ থাকে, সে বাধা দেয়, আৰ্জনাদ কৰে ওঠে হৃষিপথেৰ ভেতৱেৰ হৃষিপথ; এক বিহৎ খেটে ইধি তিনেক জায়গা ছেড়ে দেয় নন্তু, মেয়েটিৰ বিশিষ্ট চোখেৰ তাৰা তাৰ দিকে একবাৰ ঘুৰেই

আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় বহির্বিশে।

ভিড় ঠেলে বাসে ওঠা নন্তুর নিজতনৈমিত্তিক কাজ। তবু আজও সে এই প্রতিযোগিতায় অভ্যন্ত হতে পারে না। প্রতিদিন সকলে তাকে পেছনে ফেলে যায়, এগিয়ে যায় ধাবমান মহাকাল। মহাকাল এগোয়, নাকি সে-ই অবিরাম পেছনে ছুটে নিউটনের ত্তীয় সূত্রের সত্যতা প্রমাণ করে, বুঝতে পারে না নন্তু। মহাকাল চলে একশ' সিসি মোটরসাইকেলে আর তার আছে একটি বাইসাইকেল, ঘণ্টায় বেশি হলে দশ কিলোমিটার। ধাবমান মহাকালের ভূল করে পেছনে ফেলে যাওয়া বিশ্যাগুলোই শুধু ধরা দেয় তার বোধ জগতে। বৃক্ষ পথিবীকে প্রতিদিনই নতুন মনে হয় তার। একত্রিশ বছর এই পথিবীকে প্রতিদিন দেখেও নিজেকে তার আগস্তক মনে হয়।

পথিবী যেন এক প্রীৰী মুৰক।

দুই

রাজনীতির রাজধানী ঢাকার রাজপথ বেয়ে ধুকে ধুকে বাস চলে।

অফিস টাইম শুরু হয়েছে কেবল। মতিবিলের খুব কাছের এই রাস্তায় তাই হিজিবিজি নকশায় গাড়ি ও রিকশা আটকে আছে যানজটে। পঁতালিঙ্গ মিনিট পেরিয়ে গেছে। এই বাইপাস সড়কটি যে বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, সেটি থা-ৰ্বা করছে যতদূর দৃষ্টি চলে। চারদিক থেকে চারটি বাইপাস সড়ক এসে মিশেছে এই বড় রাস্তাটিতে। প্রত্যেকটিতে অসংখ্য গাড়ি ও রিকশা অপেক্ষামান, এদের পেছন ফেরার সুযোগ নেই, পথ যেমনই হোক, সময়মত পৌছেতে হবে অর্ধেন্তিক গন্তব্যে। ডজনখানেক ট্রাফিক পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে রাস্তাটিতে। গলিপথে যারা অসহ গরমে ছটফট করছে, তাদের সেখানে প্রবেশাধিকার আপাতত নির্বিদ্ধ। কোনও লাভ নেই জেনেও গাড়িগুলো ইতস্তত হৰ্ন বাজাচ্ছে। রিকশার বেল বাজছে অর্থহীন কান্নার মত। কোথেকে যেন একটি অবোধ শিশুর কান্না শোনা যাচ্ছে। দু'চারজন ঝালমুড়ি, বাদামওয়ালা মৌসুমী ব্যবসার পায়তারা করছে।

নন্তু দেখে, একটি ফেরার কুকুর লেজ

খাড়া করে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। তার চোখে শুগপৎ উৎকণ্ঠা এবং অবসাদ। কুকুরের চোখেও কি ভাসা থাকে? জীবন অন্য কোথাও... এক বোতল অ্যারোসল। কয়েকজন সুযোগ সঙ্গনী পথচারী যানবাহনের স্থিবরতার সুযোগ নিয়ে রাস্তা পেরোবার ফাঁক-ফেকের খুজছে। নিরাহ ভিক্ষুকেরা ঘানঘেনিয়ে জনতার বিরক্তিতে ইঙ্গিন যোগাচ্ছে। মধ্যবয়স্ক এক অদ্রলোক এক নুলো ভিক্ষুককে অশ্বীল গাল দিয়ে বসল। ট্রাফিক পুলিশগুলো নির্বিকার। রাজপথ থা-থা করছে। জনগণ গলিতে পচে মরছে। কুকুরটি কৌতুহলী এখনও, এক অসুস্থ বুদ্ধা গা গোলানো শব্দে কেশে উঠল, গরগর করে উঠল গলায় জমে থাকা পুরনো কফ; একটু আগের ক্রন্দনরত শিশুটি ক্লান্ত হয়ে নেতৃত্বে পড়েছে মায়ের কোলে, বুঝে গেছে সবকিছু থেকে চোখ সরিয়ে ঘৃণিয়ে পড়াই ভাল, নন্তুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অদ্রলোক তার পা মাড়িয়ে দিল।

নন্তু একবার পথের দিকে, একবার কুকুরটির দিকে তাকায়। আর তার মাথায় ক্রমশ পাক থায় এক বোতল অ্যারোসল আর লাইফ ইয় এলসওয়্যার। পায়ের পেশীগুলো মন্তিক্ষে ঝালভিজনিত বিশ্বামৈর দরবার্খান্ত দাখিল করছে একের পর এক, ছুটি মঙ্গুরকারী হিমগঞ্জ, একই সাথে সে শক্তি, সে আদেন করবে কার কাছে! তাকে কে দেবে বিশ্বামৈর অনুমতি?

চাপা কৌতুহল। বিরক্তি। গাড়িগুলো মাঝে-মাঝে হৰ্ন দিচ্ছে। রিকশার বেল বাজছে টুনটুন করে। জনগণ নানা ঘন্টব্য করছে থেকে-থেকে।

'রাস্তা বক্ষ কেন, ভাই?' ট্রাফিক পুলিশকে উদ্দেশ্য করে বলল এক প্রৌঢ়।

'বোম-টোম ফাটছে নাকি?' ছাত্র-ছাত্র চেহারার একটি ছেলে বলে উঠল রিকশার উপর দাঁড়িয়ে। রিকশাওয়ালা গামছা টেনে কপালের ঘাম মুছল। অনেক কিছু মুছতে না পারার দৃঢ়বেই বোধহয়। ট্রাফিক পুলিশ এখনও নির্বিকার। কুকুরটি কৌতুহলী এখনও। নন্তুর মাথায় জীবন অন্য কোথাও আর অ্যারোসল।

গাড়ির শব্দ। মোটরসাইকেলের ভাটভট।

পরপর কয়েকটি রাজকীয় গাড়ি চলে গেল শৌ-শৌ করে রাজপথ বেয়ে। হাঁ করে দেখছে গলির মানুষগুলো। নির্বাচন শেষ হয়েছে দিনকয়েক হলো। এসেছে গণতন্ত্র। বিশাল রাজপথে গোটাকয়েক মাত্র গাড়ি। ক্ষুধার্ত পেট আর বিনোদন-অভিযোগী মনে সকল ক্ষমতার উৎস দাঢ়িয়ে আছে গলিতে।

বিশাল রাজপথ জুড়ে একজন নেতা। পেছনে পুলিশ, ট্রাকভর্�্টি অনুসারীবৃন্দ। উচ্চস্থের সেই যুগে যুগে শুনে আসা শোগান: ‘...ভাই এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে... ভাইয়ের কিছু হলে, জুলবে আগুন ঘরে ঘরে।’

নির্বাচনের পর নেতা প্রথম চলেছেন সংসদে, তাই এই দলীয় সম্ভাষণ। গাড়ির জানালা দৈর্ঘ খুলে হাসি হাসি মুখে কচছেপের মত উঁকি দিলেন নেতা। ঘরে ঘরে আগুন জুললে তিনি খুশি হবেন মনে হলো। হাত নাড়লেন হতবিস্তুল হয়ে গলিতে দাঢ়িয়ে থাকা গিনিপিগগুলোর দিকে তাকিয়ে। পরক্ষেই আবার মুখখন ঢুকিয়ে দিলেন তেতরে। কালো কাচ নেতাকে আড়াল করে দিল যানুষের দৃষ্টি থেকে। কাচের আড়ালে গিয়ে নেতার হাসি হাসি মুখখনা, কেমন হলো তা অবশ্য বোধ গেল না। নেতার হাস্যমুখখনাই ভাসতে লাগল জনতার চেখের সামনে। দেয়ালে একটি পোস্টার। উপরোক্তবিত্ত নেতার একটি হাস্যমুখী ছবি দেখানে। হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন জনতাকে। ব্যারিকেড তুলে নিয়েছে পুলিশ। সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ প্রাণপনে ছুটছে রাজপথের দিকে। হাড়োছড়ি। ধাক্কাধাকি। গালাগাল। বিস্তিরেউড়। প্রতেকেরই পেটের তাড়া, মগজের তাড়া, অর্থের তাড়া, জবাবদিহিতার তাড়া। সম্ভোজনকভাবে পৌছাচ্ছে না কেউই। জনতার জন্য গলি ঘুপচি, রাজপথে পৌছানো অত সহজ নয়। হাড়ে হাড়ে টের পাছে জনতা।

জননেতা চলেছেন সংসদে। সেখানে মানুষের অধিকারের কথা বলবেন তিনি। জনগণের দুঃখ দুর্দশা কী করে যোচানো যায়, কী করে তাদের যানবাধিকার সংরক্ষণ করা যায়, সে ব্যাপারে পেশ করবেন কিছু প্রস্তাব।

প্রস্তাব পাশও হয়ে যাবে হয়তো বা।

ফেরালি কুকুরটিকে হঠাত নড়ে উঠতে দেখে ননতু।

এক পা উঁচিয়ে নেতার পোস্টারে রেচেনক্রিয়া সম্পাদন করে লেজ নাড়তে নাড়তে নির্বিকার মুখে পেরিয়ে গেল রাজপথ।

তিনি

জবজবে ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে বাস থেকে নামল ননতু। এমনিতেই ফর্মাল পোশাকে মোটেই আরাম বোধ করে না। তার উপর ঘামে ভেজা ফুলহাতা শার্ট, প্যান্ট আর ও নিতান্ত অসহ্য বোধ হতে থাকে তার। দাঢ়ি কামানো হয়নি মনে করে তবু কিছু শান্তি মেলে। আর আশপাশে তাকিয়ে সুপরিচিত ক্যাম্পাসটাকে দেখে একটু স্বষ্টি বোধ করে সে। মহুয়া তলায় বসে একটা সিগারেট ধরায়। দুই বছর আগে মাস্টার্স পাশ করেছে এখান থেকেই। তবু কত আপন মনে হয় এই ক্যাম্পাস। এই মহুয়া গাছ, ওই জলাশয়, কত সৃষ্টি!

ডিপার্টমেন্ট লেকচারার নেয়া হবে। রেজাস্ট বিশেষ ভাল না হওয়া সত্ত্বেও ননতু আবেদন করেছে। ইন্টারভিউও ভাল হয়েছে। আর ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানও ভরসা দিয়েছেন। আগামী পরিষ চূড়ান্ত ব্যবর পাওয়া যাবে। তার আগেই আরেকবার চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করে সম্ভাবনাটাকে আরেকটু পোক করা। পারিলিক ইউনিভার্সিটিতে চাকরিটা হলে বড় উপকার হয় তার। সকাল সকাল খাটকে হয় না। একটা নির্দিষ্ট সময় পর সে নিজেকে নিজের মত করে পাবে। বহুদিন হয়, নিজের প্রকৃত চেহারাটা দেখে না। কোথায় যেন একবেয়ে সুরে গির্জার ঘণ্টা বাজছে চ-চ-চ-চ। কেউ মারা গেলে এভাবেই বৈচিত্র্যহীন সুরে বাজে গির্জার ঘণ্টা; শুনলে মনে পড়ে যায়, কেউ মারা যাওয়াটা নতুন কিছু নয়—পুনরাবৃত্তি মাত্র। নতুন না হলেও মৃত্যুকে কখনও কখনও বেশ আকর্ষণীয়ই মনে হয় ননতুর, কিছুটা স্মিথও। কিন্তু গির্জার বেরসিক ঘণ্টা এখানে বাজবে কোথাও গির্জা আছে বলে জানা ছিল না তার। ভলভাবে লক করে সে আবিকার করে, ঘণ্টা নয়, সেলফোনের শ্রতিমধুর রিংটেন তাকে মনে

করিয়ে দিচ্ছে, এখনও বেঁচে আছে সে। ‘
‘হ্যালো।’

‘হ্যালো, ফখরভল ইসলাম বলছেন?’
‘হ্যা।’

‘আমি ইউটিলিটারিয়ান কলেজ থেকে
সিনিয়র রেজিস্ট্রার আমানুগ্রাহ বলছি।’

আলতো করে চোখ বুজে নিভাঙ্গ ক্ষ নিয়ে
নন্তু বলল, ‘বলুন।’

‘আপনার তো সকাল দশটায় একটা ক্লাস
ছিল। এলেন না যে।’

‘আমি তো একদিনের ক্যাজুয়াল লিড
নিয়েছি। গতকাল অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে
এসেছি।’

‘শুধু অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে গেলে তো হবে
না, সেটা গ্রান্টেড হয়েছে কি না দেখতে
হবে তো। হলে তবেই না আপনি ছুটি
পাবেন।’

‘গ্রান্টেড হয়েছে কি না সেটা জেনে
আসার মত সময় আমার হাতে ছিল না। তা
ছাড়া আমি তো সার্বিসটিউট দিয়ে এসেছি।
সাইদুর রহমান সর আমার ক্লাসটা নিয়ে
নেবেন।’

‘এভাবে তো চলবে না, ফখরভল সাহেব।
টাইমলি ক্লাস নেবেন না, কোনও
রেসপন্সিভিলিটি শো করবেন না, কীভাবে হবে
বলেন? এই যে আপনি একদিন পারমিশন ছাড়া
ছুটি কাটলেন, আপনার একদিনের বেতন
কেটে রাখা হতে পারে, জানেন?’

নন্তু কোনও কথা না বলে লাইন কেটে
দিল। ‘শ্রীরাটা ঢিভিড় করছে। মুখের চামড়া
কাঁপছে তিরিতির করে। দৈনিক কর্মক্ষে
আটফষ্টা অফিস আওয়ার পার করতে হয়
সেখানে। এর ‘কম হলে চুলচেরা হিসেব করে
বেতন কাটা হয়। অথচ অনেক সময় আট
ফষ্টাৰ অনেক বেশি সময় সেখানে কাটাতে হয়,
তাতে কোনও ইনক্রিমেন্ট নেই। কী করলাম,
এটা বিবেচ্য না কৰ্তৃপক্ষের কাছে, কী করলাম
না, সেটাই ধৰ্তব্য। কৰ্তৃপক্ষকে নিতান্তই কসাই
মনে হয় নন্তুর, যারা মানুষের মেধা এবং
প্রতিভাকে ত্রুণ জবাই করে চলেছে এবং
নিলামে তুলছে। ‘জীবন অন্য কোথাও... এক
বোতল অ্যারোসল।’ লক্ষণ ভাল, আপনা
থেকেই একটু পর পর এই দুটি শব্দ জিকিরের

মত তার পাঁজরে বেজে উঠছে। আজ আর ভুল
হবে না। ডিপার্টমেন্টে একবার খবর নিয়ে জানা
গেল, চেয়ারম্যান এখনও আসেননি। আবার
মহয়া তলায় বসে আনমনেই কাগজ কলম বের
করে কোনও সময় না নিয়েই নন্তু লিখতে
আরম্ভ করল:

রোগীর নাম: নন্তু

রোগের নাম: আদিম অবসাদ

উৎস: মানব অস্তিত্ব

উৎসকাল: প্রাকাদিম যুগ, বৈজ্ঞানিক
হিসেবে মহাবিক্ষেপণের মূহূর্তে

বৈশিষ্ট্য: শুণ ঘাতক, আশীর্বাদ রূপী
অভিশাপ, অভিশাপ রূপী আশীর্বাদ, মগজে
ঘুঁপোকার অস্তিত্ব অনুভূত হওয়া, মগজ ক্ষয়ে
যাবার যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি হওয়া, কোনও
দৃশ্যমান ওষুধ নেই।

কারণ: জানতে, বুঝতে এবং ব্যাখ্যা
করার প্রবণতা, নির্ধারিত পথে না গিয়ে যুক্তি
থেকে বিশ্বাসের দিকে ধাবিত হওয়া এবং
বিশ্বাসের মাপকাঠি হিসেবে সন্দেহকে নির্ধারণ
করা।

উপসর্গ: মারাত্মক মরণাসঙ্গি, তীব্র
জীবনমুগ্ধিতা, ‘কেন’ নামক প্রশ্নে জর্জরিত
হওয়া বা করা, অসামাজিকতা, ব্যর্থ অভিনয়,
আবরণ দেখলেই ওপাশে উকি যাবার অভ্যাস,
কার্পেট দেখলেই তীক্ষ্ণ কিছু দিয়ে যৌচানোর প্রবণতা
(অবশ্য এরা যেখানে আবরণ, কার্পেট এবং
প্রলেপ দেখে অন্যরা সচরাচর সেখানে কিছুই
দেখতে পায় না।)

প্রতিরোধ: মন্তিকের সচেতন কোষে তালা
ঠেটে দেয়া (শৈশব থেকেই সত্ত্বারের প্রতি
অভিভাবক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এই
দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে।

প্রতিষেধক: ব্রন্দাচিত মৃত্যু কিংবা
স্বনিয়ন্ত্রিত পুনর্জন্ম।

‘স্যার, আসব?’

দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান ড.
জালালউদ্দিন শিয়ত হাসলেন, ‘এসো, কেমন
আছ নন্তু, ভাল?’

‘ভাল, স্যার, আপনি?’

‘শ্রীরাটা বেশি ভাল না। তোমার খবর

বল। শিক্ষকতা কেমন নাগচ্ছে?’

‘স্যর, আমার কোনও ব্যবর আছে?’

চশমা খুলে পকেট থেকে ক্রমাল বের করে মুছলেন জালালউদ্দিন। অন্য পকেট থেকে আরেকটা ক্রমাল বের করে মুখ মুছলেন। চশমাটা আবার যথাস্থানে রেখে বললেন, ‘নন্তু, তোমার বোধহয় এখানে হচ্ছে না। আমি অবশ্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম...’

‘কিন্তু, স্যর, আপনি বলেছিলেন আমার ইন্টারভিউ ভাল হয়েছে। চারজন লেকচারার মেয়া হবে। এর মধ্যে আমার কি জায়গা হবে না?’

‘দেখো নন্তু, পাইপ লাইনে তোমার অবস্থান অনেক নীচে ছিল। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া অনেকে অ্যাপ্লাই করেছে, তারা অবশ্যই অঞ্চারিকার পাবে। আর এদের অনেকেরই উচ্চ পর্যায়ের রেফারেন্স আছে। ভিসি স্যরের কোটা ও আছে কিছু।’

‘তা হলে, স্যর, ইন্টারভিউ নিয়ে প্রাপ্ত করার দরকারটা কী ছিল? ডিপার্টমেন্টে পাঁচজন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, এর মধ্যে চারজনকে নিয়ে নিলেই পারতেন। একহাতে মার্কশীট নেবেন, অন্যহাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেবেন। আর আপনিও যদূর জানি ফার্স্ট ক্লাস পাননি। আপনি কীভাবে চাকরি পেয়েছিলেন, স্যর? নাকি আপনারও লবিং ছিল?’ নন্তুর কষ্টে যেন কথা বলে উঠল অন্য মানুষ। না, একদিনের ফল নয় এ, বহুযুগ ধরে জমে জমে আজ বৃহুদ বাস্প হয়ে বেরিয়েছে।

জালালউদ্দিন এই অপমান গায়ে মাথালেন না। অপমান গায়ে মাথালে তাঁর পক্ষে সুরী হওয়া সম্ভব হত না, ‘দেখো, নন্তু, এটা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত। এখন আর কিছুই করার নেই।’

আয় সাড়ে তিন হাত চওড়া টেবিলটা এক

লাফে পেরিয়ে এল নন্তু চেয়ারম্যানকে মাটিতে পেড়ে ফেলে তার বুকে ঢেপে বসল। তার হাতে একটা ক্ষুর। এই ক্ষুর কোথাকে এল সে প্রশ্ন অবশ্য নন্তুর মাথায় খেলল না। সে হাঁটু দিয়ে ব্যাটার গলা পিষে ধরল। জিভ বেরিয়ে এল চেয়ারম্যানের। ক্ষুরের এক পেঁচে সেই দণ্ডগে ঘায়ে ভো আর পুঁজ মাথা কল্পিত জিভের অর্ধেকটা কেটে নিল সে। সেই জিভ হাতের ঝুঠোয় নিয়ে নারকীয় উঁচুসে মনোবিকারারভঙ্গের মত হা-হা করে হেসে উঠল।

‘কী ব্যাপার নন্তু, হাসছ কেন? মন খুব খারাপ হয়েছে তো? তুমি পরেবার চেষ্টা করো, হয়ে যাবে।’

কোনও কথা না বলে ভাবলেশহীন মুখে চেয়ারম্যানের চেহারা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে নন্তু।

‘চা খাবে?’

প্রশ্নের উত্তর বা সালাম, কোনওটাই না দিয়ে সে বেরিয়ে এল। উদ্দেশহীন হাঁটতে হাঁটতে মাথার চুল খামচে ধরল। হঠাৎ বাসায় ফেরার জল্য এক ধরনের আকুলতা অনুভব করল নন্তু। মনে হয়, বইগুলো চারদিক খোলা বুকশোলফে অরক্ষিত অবস্থায় আছে, ধূলো জমেছে অনেক, বইয়ের পাতাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তেলাপোকাগুলো কুকুর করে ক্রমশ খেয়ে ফেলছে তার উটোপিয়া। এক বোতল আয়োসল... লাইফ ইয়ে এলসওয়্যার। হঠাৎ তার বিশাস করতে ইচ্ছে করে, তেলাপোকা নিরোধক বিষাক্ত তরল আর এই বহুল আড়িত উপন্যাসের নামের মধ্যে কোথায় যেন একটা হৌলিক অবধারিত আদিম সম্পর্ক বিদ্যমান, স্টিলগু থেকে অনন্তকাল।

‘এই, নন্তু, এই।’

নির্বিকার মুখে তাকিয়ে নন্তু দেখল,

যশোরে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের যে কোন বইয়ের জন্য এখানে আসুন।

মেসার্স আনোয়ার আলম ব্রাদার্স

প্রো: এস এম খুরশীদ আনোয়ার

৭ নং মুজিব সড়ক, যশোর।

ফোন নং ০৪২১-৬৩৬৩৯।

মোবাইল ০১৭১৫ ০৬৭০১৬

কটাক মাথা হাসি নিয়ে শফিক দাঁড়িয়ে আছে। চাকরিটা শফিকেরই হয়েছে, জানে সে। হবে না কেন? হঠাত করেই সবকিছু স্বাভাবিক মনে হতে থাকে তার, মনে হয় সে আসলেই অপরাধী, চাকরি তার হবার কথা তো নয়! তার ঘরে তেলাপোকা বাসা বাঁধবে না তো কোথায় বাঁধবে? বই পড়ে পেটে ভরানোর কথা ভাবছে সে! 'সত্য কেবল বাঁচা' কেবল বাঁচা, সত্য কেবল পশুর মত বাঁচা।' লোকে তাকে ধাক্কা দিয়ে যায়, ঠিকই করে, তাকে দেখলেই তো ধাক্কা দিতে ইচ্ছে করে; যে অন্যকে ধাক্কা দিতে পারে না, সে তো ধাক্কা খাবেই; শফিক ফাস্ট ক্লাস পাওয়া ছাত্র। চেয়ারম্যানের সাথেও তার দহরয় মহরমের কথা কারও অজানা নয়। জালালউদ্দিনের লেখা পাঠ্যবইয়ের উপর সে একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রবন্ধ লিখে নিজ খবরে মালয়েশিয়া থেকে প্রকাশ করেছে। শুধু পড়াশোনা নয়, বর্তমান মুগে ফাস্ট ক্লাসের পেছনে আরও অনেক কিছুই অবদান রাখে। নন্তু এই অনেক কিছুর আশীর্বাদ থেকে বিশ্বিত হয়েছে, সে ব্যর্থতা তো তার নিজেরই। নন্তু শফিকের দিকে এগোয় না, আরার অবজ্ঞা করে ঢলেও যায় না। ঝন্নুর মত দাঁড়িয়ে চোয়াল ডলতে থাকে। শফিকই এগিয়ে আসে অবশ্যে।

'কীরে, খবর কী?'

অ্যারোসল স্প্রে করলে যেমন বিষধর সাপের ফোস করে ঘোঁষার মত আওয়াজ হয়, সেভাবেই নন্তুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'অভিনন্দন।'

বিনীত অহংকারের হাসিতে ভরে যায় শফিকের মুখ, 'ভাল আছিস?'

'ভাল, তুই?

'ভাল। তুইও তো আপ্লাই করেছিলি? হয়নি না?'

'ইবার তো কোনও কারণ নেই। তুই ফাস্ট ক্লাস পাওয়া ছাত্র, আমি সাধারণ সেকেও ক্লাস।'

'তোর রেজাস্ট এত খারাপ হলো কেন বল তো?'

নন্তু কোনও কথা না বলে আবারও চোয়াল ডলে, শফিকের সাথে একই হলে থাকত সে, পাশাপাশি ঘরে; বহুদিন ক্লাসে

যাবার সময় হলের গেটে এসে থমকে গেছে নন্তু, মহান ছাত্রনেতারা হলের গেট বক করে রেখেছে, কারণ মিছিল হবে, আর সাধারণ ছাত্রদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়ে সেই মিছিলে যোগ দিতে বাধ্য করা হবে তাদের, নহলে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলটির মিছিল ভারী হচ্ছে না; বিপক্ষ দলের কাউকে কাউকে পেটানো হয় পূর্বপরিকল্পনা করে, দু'বার নন্তুর সামনেই ঘটেছে এমন ঘটনা, লোহার রড দিয়ে এত জোর বাড়ি দেয়া হয়েছে, আঘাতকারীর রড এবং আঘাতপ্রাণের মেরুদণ্ড, দুই-ই বেঁকে গেছে পর্যাতালিঙ্গ ডিগ্রি; কোনও কোনও নিশ্চিত রাতে শোনা যেত কারও আর্টিংক্রার আর সেই সাথে চপাচপ আওয়াজ, পেটানো হচ্ছে কাউকে, পুরো হল নিষ্পূণ; এদিকে আর্টের হাহাকার বিশাল হোস্টেলের আনাচে-কানাচে ঠোকর খেয়ে ফিরেছে; নন্তুর মনোজগতে ভূত্বাবহ এক বিকার নিয়ে এসেছিল তার হল জীবন, অগ্রাচ এসব ঘটনায় সামাজিকভাবে বিচলিত হতে দেখেনি কাউকে, নির্বিকারভাবে এসব অবজ্ঞা করে পড়াশোনা করে গেছে শফিকের মত প্রথম শ্রেণীর ছাত্রারা; সবাই অত্যন্ত হয়ে গেছে, শুধু নন্তুই প্রতিদিন একধাপ করে অনভ্যুত্তর দিকে এগিয়েছে। এমনি এক রাতের শেষে নন্তু যখন পরীক্ষার হলে গেল, রাতের সেই আর্টিংক্রার সুরাহীন ঘূর্ণত মানুষকে ক্রমাগত বিমুক্ত করতে থাকা পিনপিনে মশার মতই তার কানে বাজতে লাগল, পরীক্ষার খাতায় লিখতে থাকা প্রতিটি নীতিবিধাক তার কাছে চরম প্রহসন মনে হলো, পরীক্ষার হলকে তার মনে হতে লাগল প্রতিবন্ধীদের পাঠশালা; অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে উন্নাদের মত পরীক্ষার খাতার পৃষ্ঠা ভরতে থাকা প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে তার ঘৃণা করতে ইচ্ছে হলো, এদের মত না হবার প্রতিজ্ঞা যেন তার মেরুদণ্ডের মজ্জা থেকে উপরে উঠে সরাসরি মন্তিঙ্গে বিক্রিয়া করল। তাকে ঘিরে থাকা মানুষগুলোর মত কুষ্টরোগে আক্রান্ত এই সমাজের পুঁজ চেটে খেতে শিখে নিতে পারেনি সে, এই পুঁজকে পৰিত্ব জল জ্বান করে ভক্তি ভরে চেটে নিয়ে ভাবলেশহীন মুখে পরীক্ষার খাতায় কাটের নীতিশাস্ত্র লিখে আসা ছাত্রাই আজ মানুষ। আর নন্তু! আজ

সকালেও তার বাবা তাকে প্রশ্ন করেছে, সহিত্যের বইগুলো আপনে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে না কেন? যে বই পড়লে চাকরি হয় না, সেই বইয়ের দরকারটা কী?

শরীরের পাঁচটি ইন্দ্রিয় বক্ষ করে দিতে পারলে বৃক্ষ শান্তি পাওয়া যেত; নাহু, ইন্দ্রিয় বক্ষ করে কী হবে? মগজটা সিলগালা করে দিতে পারলে কাজ হত! সমাজ-সংজ্ঞায়িত স্বর্ণমন্দিরে যে কোনও মূল্যে পৌছানোকে যেখানে অলিখিতভাবে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে নন্তু কে?

শরীরকেন্দ্রিক মনসর্বস্ব মানবের ভিড়ে মনকেন্দ্রিক শরীর নিয়ে নন্তু যেন এক বিচ্ছিন্ন বাহীপের মত বায়ুহীন শূন্যে স্থির ভাসমান। 'হ্যা, তুই ফাস্ট ক্লাস শফিক!' মনে মনে বলে নন্তু, 'তোরা ফাস্ট ক্লাস বটে।'

চার

হাইওয়ে ধরে হ-হ করে চলেছে বাস। অফ পিক আওয়ার হওয়াতে বাস মোটামুটি ফাঁকা। সবগুলো সিটই ভর্তি, তবে দাঁড়িয়ে নেই কেউ। পথের দু'পাশের মাঠ-প্রান্তে, গাছপালা অপস্থায়মান। অপস্থায়মান আরও অনেক কিছু। কিন্তু অপসৃত সবকিছুই সবার চোখে পড়ে না। কারও কারও পড়ে।

নন্তু সিট পেয়েছে পেছনের সারিতে। পাশেই জানালা ঘেঁষে বসেছে এক তরী তরুণী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীই হবে হয়তো। টান চোখ দুটো কাজলের টানে যথাসম্ভব টানটান করা, মুখ কেন যেন চকচক করছে, যত্ন দিয়ে নিভাজ করা চুল বাতাসে উড়ছে আর সেই ওড়া বেশ উপভোগ করছে তরুণী। হয়তো শুভেন্দু প্রেমে পড়েছে, ভবিষ্যতের সুব্রহ্মণ্য দ্রবিড়ত, কিংবা হতে পারে নারী-ইন্দ্রিয় দিয়ে সে বিপরীত লিঙ্গধারী সহ্যাত্মীর আড়দৃষ্টি লক্ষ করে পুলকিত, অথবা বিয়ে ঠিক হয়েছে, এই মেয়েটি পেয়েছে তার সহচর; সহ্যাত্মীর মনে তীব্র কৌতুহল জাগে, কে সেই যোগ্য সহচর যে এই জনপ্রতীকে জীবনে জড়ানোর যোগ্যতা রাখে! কী সেই যোগ্যতা! কেখায় সে পায় শান্তি! এত 'শ্বপ্ন' তরুণী লক্ষ করলে দেখত, অস্তুত এক উন্নাদনা সহ্যাত্মীর চোখে, বাসের মধ্যে কোনও মানুষ দেখতে পায় না নন্তু, তার

শরীরটা শিরশির করে ওঠে, এক বাস ভর্তি তেলাপোকা দেখলে যে কারও গা গুলিয়ে উঠবে, প্রাণী খাদ্যের অন্তিম পরিপতিও যেন পথ উল্টে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইবে; যাত্রীদের কালো মাথাগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি অতিকার কিলবিলে তেলাপোকা হয়ে তার চোখে ধরা দেয়, টাক মাথাগুলো যেন গা গোলানো দানবীয় সাদা তেলাপোকা; বাস ব্রেক করছে, সবগুলো তেলাপোকা একসাথে সামনে হেলে পড়ছে, বাস আবার সামনে টান দিচ্ছে, সবগুলো তেলাপোকা পেছনে হেলছে; সব তেলাপোকার একই প্রত্বি, একই গন্তব্য; বাসের একেবারে সামনের সিটে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে আরেকটি তেলাপোকা, সে সব তেলাপোকাকে নিয়ে যাচ্ছে তাদের কল্পিত গন্তব্যে; কিন্তু নিজেকে তেলাপোকা মনে হচ্ছে না কেন নন্তুর? নিজের মাথাটা দেখতে পাচ্ছে না বলেই কি? চোখ সরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় সে, কিন্তু দৃষ্টি চলে যায় তরুণীর সুটচ, ভরাট, সুভোল শনে; খোলা জানালা দিয়ে ফ্রান্সের বাতাস আসছে, তরুণীর বুকের ওডনা চলে এসেছে গলায়, তার জামার গলাটা বেশ বড়, সাদা তেলাপোকার মত ফর্সা বুকে কালো সরু সিঁথিটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উজ্জাসিত হয় নন্তুর চোখে; তরুণী সুন্দরী, কিন্তু এই মুহূর্তে কোনও সুন্দর উপমা আসে না নন্তুর মাথায়; তার তীব্র ইচ্ছা জাগে ও দুটোকে দু'হাতে পিট করে সর্বশক্তিতে; দু'হাতকে বুলডোজার বানিয়ে পিষে, দুমড়ে, মুচড়ে, ছিড়ে, চ্যাপ্টা করে লোল চর্মগ্রস্ত বৃক্ষার মত করে দেয় ভরাট শনগুলোকে; এ কাষ নয়, এ অন্য কিছু।

বাস থেকে নেমে রিকশা খৌজে নন্তু। রাত আনুমানিক নটা। রাস্তায় পথচারী তেমন নেই। আগামীকাল সরকারি ছুটি। 'সব জানালাপী 'পার্বি' বোধহয় নীড়ে ফিরেছে। অন্দরে দুটো রিকশা চোখে পড়ে নন্তুর। রিকশা চালকদের একজন প্রায় নগ্নগত রক্ষ, অন্যজন জোয়ান, দাঁড়িয়ে আছে ডোরাকটা একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে। দু'জনকে দেখেই নন্তুর মনে হয়, সঙ্গের আদিকাল থেকে বোধহয় এরা এভাবেই এখানে দাঁড়িয়ে আছে। গতিহন এই দৃশ্য একধরনের অবসাদ জাপিয়ে

তোলে নন্তুর মনে। নন্তু এগিয়ে গিয়ে বৃক্ষকে জিজ্ঞেস করে, ‘টিকাটুলী যাবেন, চাচা?’

বৃক্ষ তেলাপোকাটি যেন শুঁড় নেড়ে নির্বিকার মুখে বলে, ‘না।’

না! না! না! দীর্ঘদিনের জমে ওঠা না-এর বারবে যেন অগ্নিসংযোগ করে এই রিকশাওয়ালা, ‘যাবি না তো এহানে দাঢ়ায়া রইছস ক্যা... পুত? ...ফালাইতে রিকশা লইয়া রাস্তায় নামছস?’ শৈশব-কৈশোরে বাবা-মা এবং পিতৃমাতৃত্বল্য শিক্ষকদের কাছ থেকে পাওয়া মনুম্বের সাথে সম্ভবহারের শিক্ষকে পদদলিত করে নন্তু হৃষ্ণুর দিয়ে ওঠে।

তেলাপোকা থমকে যায়, শুঁড় নাড়া বৃক্ষ হয়। নন্তুর দৈহিক দৈর্ঘ্য-প্রস্ত্রে একবার চোখ বুলিয়ে হতবিহুল কঢ়ে বলে, ‘মুখ খারাপ করেন ক্যা?’

‘...আবার কথা কয়! ...পো, তুই বাঢ়ায়া রইছস কোন্ত ভৱসায়া?’ রিকশার পেছনে প্রচণ্ড লাধি করায় নন্তু, ‘বাড়িত যা হাউয়ার পো, ...দ গিয়া যা। পয়সা আছে? না থাকলে লইয়া যা।’ লাধি খেয়ে ছবির রিকশা ধাবমান হয়, সেটাকে সাধলাতে ধাবমান হয় বুড়ো। এরপর ডোরাকাটা তেলাপোকার দিকে জ্বল্পন্ত চেঁকে তাকায় নন্তু, ‘তুই যাবি ...পো?’

অনিদিষ্ট গন্তব্যে ধাবমান হবার ভয়ে সঞ্চলন তাবে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে ডোরাকাটা। বিজয়ীর বেশে রিকশায় উঠে একটা সিগারেট ধরায় নন্তু। দেশলাইয়ের বালসে ওঠা আভন্দন নিভাস ম্লান মনে হয় তার চোখের সামনে। বাসার প্রতি তীব্র বিত্ক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে। গেলেই প্রথমে দেখা হবে কয়েকটি তেলাপোকার সাথে। ঘরে তুকে আলো জ্বালা মাঝে ফরফর করে গোটা দুয়েক তেলাপোকা উড়ে যাবে নাকের সামনে দিয়ে। বুকশেলফে কয়েকটিকে নির্বিকারভাবে বসে থাকত দেখা যাবে ধ্যানস্থ ঋষির মত, যেন কিছুই বোঝে না। পরে দেখা যাবে কোনও একটি অম্বুল বইয়ের কয়েকটি পাতা আধা ইঞ্জিটাক খেয়ে ফেলেছে। তেলাপোকার যদি অম্বুলের মূল্য বুকাত!

বাসার কাছে গলির মুখে এসে নামে রহস্যপত্রিকা

নন্তু, খপ করে ডোরাকাটার কলার চেপে ধরে বলে, ‘ভাড়া নিবে??’

ইষৎ থতমত খেয়ে ডোরাকাটা মিনমিনিয়ে বলে, ‘তা ভাড়া দিবেন না?’

‘ই দিমু,’ অপ্রকৃতহের দৃষ্টি নন্তুর কটাক্ষ মাথা মুখে, ‘তোর পাওনাও মিটায়া দিমু আমি। কারাও পাওনা বাকি রাখুম না। তেলাপোকারও না।’

নন্তু বাঁ দিক থেঁবে গলির দিকে এগোয়। একটি মাঝাবাসী লোককে উল্টো দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখে। পয়সাওয়ালা অঙ্গুলোকই মনে হয়। লোকটা আসছে নিজের ডানদিক ধরে। রং সাইড। তুর হাসি ফোটে নন্তুর নিকোটিন মাথা ঠোটে। কাঁধটা সামনে এগিয়ে দিয়ে শক্ত করে ফেলে সে। ধাক্কা থেঁবে লোকটা প্রায় একশ’ আশি ডিপ্পি ঘুরে যায়। হতবিহুল চোখে তাকায় নন্তুর দিকে। নন্তু পাতা দেয় না। নির্বিকার মুখে এগিয়ে যেতে যেতে ডানহাত মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলে। লোকটা কিছু বললেই তার মুখের মানচিত্র পালটে দিতে হবে। কুলুমিত মানচিত্র বদলে দেয়ার সময় এসে গেছে।

নন্তুদের গলিটা খানাখন্দে ভরা। তার উপরে নেই সরকারি আলো। রিকশায় যাওয়া মানে তিড়িং বিড়িং নাচতে যাওয়া। হেঁটে যাওয়াই উভম। কিন্তু হয় বছর এখানে বসবাস করেও এই গলির সাথে অভ্যন্ত হতে পারেনি নন্তু। প্রতি রাতেই ফেরার সময় বার দুয়েক হোচ্চট থায়। কিন্তু আজ ব্যতিক্রম হলো। মন্দ পায়ে অবলীলায় সে পেরিয়ে এল সোভিয়াম লাইটবিহীন বস্তুর পথ।

রাত সাড়ে এগারোটার দিকে জেগে গেলেন নন্তুর মা মাহমুদা খাতুন। নন্তুর ঘর থেকে ফোস্সস্ ফোস্সস্ করে প্রলিহিত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এবং এক ধরনের কটু গুৰু পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ছোটখাট অস্ত্রহাসির শব্দ।

মাহমুদা খাতুন যোটায়ুটি ভয় পেয়ে গেলেন। ছেলের মাথাটাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো? বেশ কয়েকদিন ধরেই নন্তুর হাবভাব ভাল ঠেকছিল না তার। সবসময় কেমন গঁট্টির হয়ে থাকে আজকাল। কিছু জিজ্ঞেস করলে

১৯/১০/১৪ তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে
মাসুদ রানা

মৃত্যুবীপ

কাজী আনোয়ার হোসেন

ফ্রাস সরকারের মৃত্যু-পরোয়ানা বুলছে
মাথার উপর, হেড অফিসের নির্দেশে তাই
লুকিয়ে আছে রানা আর্কটিক, গবেষণার
ছতোয়। আচমকা এল বিসিআই চিফের
নির্দেশ: 'রানা, এক্সুনি রওয়ানা হয়ে
যাও। রাশার পোলার অটুল্যাণ্ডে গিয়ে

ঠেকাতে হবে রাফিয়ান আর্মির
অ্যাট্যোসফেরিক হামলা। নইলে ভস্ম
হয়ে যাবে আক্রিক, আমেরিকা, এশিয়া ও
ইউরোপের বেশিরভাগ দেশ। পুড়ে ছাই
হয়ে যাবে বাংলাদেশও।' ক্যাপ্টেন
নিশাত, দুই মেরিন, রানা নিজে ও

তিনজন গবেষক-এই সাতজন চলল
শীতল মৃত্যুবীপে। বিপক্ষে দুইশো
বেপরোয়া, খুনি যোদ্ধা। আর ফ্রাস থেকে
আসা কমাত্তোরা। হামলা শুরু হতেই
দিশেহারা হয়ে পড়ল রানা। সফেদ
বরফের রাজ্যে কোথাও পালাবার রাস্তা
নেই, মৃত্যু নিশ্চিত। কিছুই পরোয়া না
করে পাল্টা আক্রমণে গেল রানা। কিন্তু
স্বপ্নেও ভাবেনি, এমন হঠাতে করে মৃত্যু

ঘটতে চলেছে ওর। কে আছে, যে
মরণের ওপার থেকে ফিরিয়ে আনতে
পারবে আমাদের প্রিয়, দেশপ্রেমিক,
নিঃস্বার্থ রানাকে?

সেবা প্রকাশনী

২৪/৮ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

পরিষ্কার করে জবাব দেয় না। আবার হঠাত
হঠাতে দেখা যায়, একাই মুচকি-মুচকি হাসছে।
তখনি তাঁর বোকা উচিত ছিল।

ভয়ে ভয়ে মাহমুদা খাতুন নন্তুর ঘরে
উকি দিলেন এবং দেখলেন, তাঁর ছেলে প্রবল
উৎসাহে স্মস্ত ঘরে অ্যারোসল ছিটাচ্ছে,
একবার এদিকে তাক করে অ্যারোসল স্প্রে
করছে, একবার ওদিকে এবং যত্নত; তার
পায়ের কাছে কয়েকটা তেলাপোকা ঠ্যাং
উর্ধমুরী দিয়ে চিংপটাং পড়ে আছে, ক্রমশ
এদের সংখ্যা বাড়ছে, নন্তু কিছুক্ষণ পর পর
সেগুলোকে পা দিয়ে পিষছে, তেলাপোকার
পেট ফাটার শব্দ হচ্ছে পটাশ পটাশ করে,
প্রত্যোকটি শব্দের সাথে সাথে বীভৎস উল্লাসে
উত্তোলিত হয়ে উঠছে তার মুখচোখ, হেসে
উঠছে হা-হা করে প্রলয়েল্লাসে। বৰ
জুড়ে অ্যারোসলের কুয়াশায় নন্তুর দীর্ঘ দেহটা
যেন প্রাগ্নিতিহসিক কোনও জলাশয় থেকে
কঁড়ি যেৱে উঠে আসা এক গ্রাকান্দিম
প্রাণী।

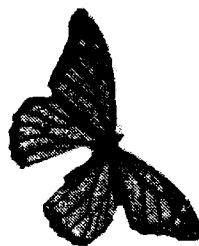
মাহমুদা খাতুনকে দেখে থামল নন্তু।
হাঁপাছে অল্প অল্প। মায়ের দিকে তাকিয়ে
অমায়িক ভঙ্গিতে হাসল। 'সব শেষ করে
ফেলছি, মা। এদের কাউকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে
না। চিন্তা করো, আবার ঘরের সবচেয়ে বিশুদ্ধ
জিনিস হচ্ছে বই, এরা কি না বিশুদ্ধতাকে
কেটে ফেলে! তৃষ্ণি ঘূমাও গিয়ে, সবাই ঘূমাছে,
তৃষ্ণি ঘূমাও, তোমরা সবাই ঘূমিয়ে থাকো,
ওটাই তোমাদের সাজে, যাও আমি একাই
সামলাতে পারব।'

আবার শুরু করে নন্তু, পলায়নেচুক
একটি উড়ন্ট তেলাপোকাকে লক্ষ্য করে
একগাদা অ্যারোসল স্প্রে করে। এক মুহূর্তের
একটা তির্যক রেখায় বাতাস চিরে হাতখানেক
গিয়েই চিং হয়ে পড়ে যায় তেলাপোকটা।
একলাকে সেটাকে পিষ্ট করে ফেলে নন্তু।
ছাদের দিকে মুখ করে মনেবিকারগান্তের মত
হেসে ওঠে হা-হা-হা-হা-হা-হা করে।
সেই হাসিতে ক্রোধ আর আতঙ্গানি মাথামাথি।
আজ আর অ্যারোসল কিনতে ভুল হয়নি
তার।

ভুলে গেছে লাইফ ইয় এলসওয়্যার
কিনতে। ■



পর্যবেক্ষণ
পর্যবেক্ষণ



সেবা প্রকাশনী

২৪/৮ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

১ গিগাবাইটের একটি ফিলু নামাতে সময় লাগবে মাত্র ০.২ মিলি সেকেণ্ড।

কাঁচপোকা থেকে শিক্ষা
নিয়ে তৈরি হবে
কম্পিউটারের উন্নত
মানের পর্দা!

কাঁচপোকার বৈজ্ঞানিক

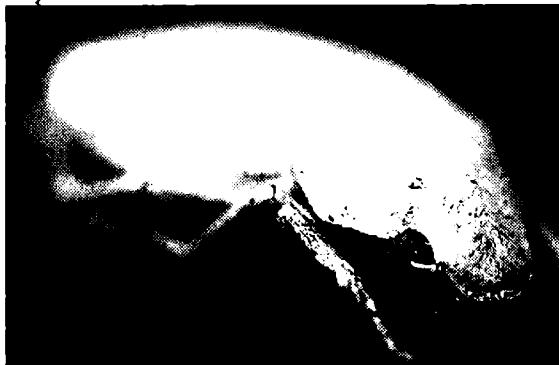
নামটি হলো
সাইফোটিলাস। কারও
কারও কাছে এটা বেশ
খিটমিটে ঠেকতেই পারে।
আকারে তেমন বড় নয়,
পূর্ণবয়সী মানুষের নখের
সমান হবে বড় জোর।
দক্ষিণ এশিয়ার অনেক
দেশেই একে দেখতে পাওয়া
যায়। কাঁচপোকার গায়ের রং
ধূবধবে সাদা। প্রকৃতিতে এ
রকম সাদা আর কিছুই
নেই। বা কৃত্য ভাবে এ
রকম সাদা কিছুও এখনও
বানাতে পারেনি মানুষ।
সাদার মত সব রঙের আলো
বিকিরণ করতে পারে এ
কাঁচপোকার ঝঁঁশ।
প্রাকৃতিক বা মানব নির্মিত

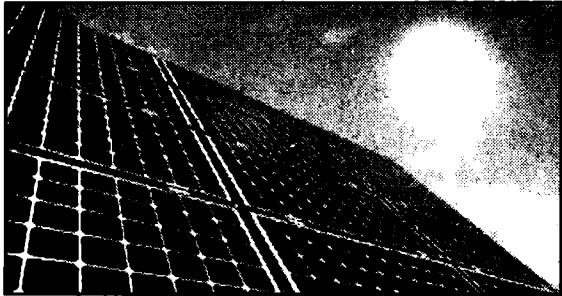
কোনও বস্তু অমনভাবে
কাজটি করতে পারে না।
আর আমরা জানি, যে বস্তু
ঠিকরে পড়া বা প্রতিফলিত
আলোকরশ্মির সবটাই
নিপৃণভাবে বিকিরণ করে তা
আমাদের চোখে সাদা হয়ে
ধরা দেয়। কাঁচপোকার
ঝঁঁশগুলো এ কাজ করে
অতি চমৎকার ভাবে, তাই
যে সাদা রং তৈরি হয়, তার
কোনও তুলনা নেই। এবারে
ক্যামেরিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের
একদল বিজ্ঞানী বলছেন,
কাঁচপোকার আঁশের
অনুকরণে তৈরি
কম্পিউটারের পর্দা অনেক
বেশি উজ্জ্বল হবে। বা একই
প্রক্রিয়ায় তৈরি রং হবে
সাদার চেয়ে অনেক বেশি
সাদা। এমনকী বাজারের
সবচেয়ে সাদা কাগজের
চেয়েও অনেক বেশি সাদা
কাগজ বা সাদা প্লাস্টিক

বানানো যাবে একই
প্রক্রিয়া। অবশ্য এ জাতীয়
পণ্য কবে বাজারে আসবে,
তা এখনও জানা যায়নি।

স্প্রে করলেই সৌর
কোষ!

সৌর কোষের পরিচয়
বোধহয় নতুন করে
দেয়ার প্রয়োজন নেই।
সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ
তৈরিতে সৌর কোষ ব্যবহার
হয়। সে কথা সবারই জানা
আছে। বর্তমানে বাজারে যে
সব সৌর কোষ পাওয়া যায়
তার ৮৫ শতাংশই তৈরি হয়
স্ফটিকায়িত সিলিকন থেকে।
এসব সৌর কোষ মোটেও
সস্তা নয়। এ ছাড়া, এ
জাতীয় সৌর কোষ গড়ে
মাত্র ২৫ শতাংশ সূর্যের
আলোককে বিদ্যুতে
রূপান্তরিত করতে পারে।
কিন্তু এবারে আশা করা
শোনাচ্ছেন শেফিল্ডের
একদল গবেষক। তাঁরা
স্প্রে করে কম খরচে সৌর
কোষের পথ বের
করেছেন। এভাবে সৌর
কোষের গণ উৎপাদন করা
যাবে। নতুন জাতের এ
সৌর কোষ বানানোর জন্য
যে উপাদান ব্যবহার করা
হবে, তার নাম
পেরোভসকাইট। রং করার
মতই সহজে এ স্প্রে





করা যায়। তা ছাড়া, খুব
কম টাকা-পয়সা ব্যয় করে
এ উপাদান তৈরি করা যায়।
সবচেয়ে বড় কথা, এটি
তৈরিতে খুবই কম বর্জ্য
উৎপাদিত হয়। এভাবে
তৈরি করা সৌর কোষ
সূর্যের আলোর ১৯ শতাংশকে
বিদ্যুতে রূপান্তরিত করতে
পারে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ
বিভাট্টের সোনার দেশে
সন্তান আর এর চেয়ে ভাল
কী হতে পারে! অবশ্য
এখানেও একটা কিন্তু রয়েই
যাচ্ছে, তা হলো এটি
বাজারে আসবে কবে তা
জানানো হয়নি। অতএব, এ
মেওয়া চাখার জন্য হয়তো
আরও কিছু দিন সবুর
করতে হবে আমাদের!

এক পলকেরও কম
সময়ে নামিয়ে নিন এক
গিগার ছবি!

ডেনমার্কের প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়ের
গবেষকরা নতুন ধরনের
অপটিক্যাল ফাইবার বা
আলোক তন্ত্র ব্যবহার
করেছেন। এ অপটিক্যাল
ফাইবার দিয়ে অতি সেকেণ্টে
৪৩ টেরা বিট তথ্য আদান-

প্রদান করা যায়। এর আগে
৩২ টেরা বিট পর্যন্ত তথ্য
আদান-প্রদান করা গেছে।
অর্থাৎ এবারে অতীতের
রেকর্ড ভঙ্গ করা হয়েছে।
পরবর্তী প্রজন্মের এ
নেটওয়ার্কের সাহায্যে ১
গিগাবাইটের একটি ফিল্ম
নামাতে সময় লাগবে মাত্র
০.২ মিলি সেকেণ্ট।
সাধারণভাবে আমাদের
চোখে পলক ০.৩ থেকে
০.৪ সেকেণ্ট স্থায়ী হয়।
প্রতি মিনিটে সাধারণভাবে
আমরা পাঁচবার পলক
ফেলি। সবচেয়ে অবাক
কাঞ্চি হলো প্রচলিত



অপটিক্যাল তন্ত্র প্রস্থ যা,
নতুনটির প্রস্থও তাই।
ইন্টারনেট থেকে নামিয়ে
যারা মুভি দেখেন বা
নিজেদেরকে যারা মুভিরের
দাবি করেন, তাঁদের জন্য
সুস্থকর ভবিষ্যৎ আসছে। সে
কথা জোর দিয়েই বলা যায়।■
আমিল বতুল

রহস্য উপন্যাস তিনটি বই একত্রে কাজী আনোয়ার হোসেন

বিশ্বাসঘাতক: দৈবের
যোগসাঙ্গে হাত্তি করেই
দেখা হয়ে গেল ইয়াহিয়ার
দালাল আবু দোহানীর সাথে
জেলখাটা এক বিহারী তরুণী
শাহীন বেগমের। পুর হলো
নাটক। ওদের সাথে এসে

জুটল তয়কর সাথে এসে
সাইকেপ্যাথ-আলম। ভালই
তো, ভিলেন ছাড়া নাটক
জমে? কিন্তু নিয়তির অদৃশ্য
অযোধ টানে কী ভ্যাবই?
পরিগণিত দিকে এগিয়ে
চলেছে ওরা কেউ কি জানে?
হলো না, রপ্তা! ছেটে একটা
অন্যায় করলেই হাতে এসে
যায় অনেক টাকা। বড়লোক
হয়ে যাবে মারফ। একবারই
তো-তারপর থেকে সাধু হয়ে
যাবে সে। কেউ কি জানে,
ভাগ্যদেবী কোথায় নিয়ে শিয়ে
ফেলেবে কাকে?

রহস্যঘরী: আমার কি দোষ,
বলুন? আমি কি জানতাম?
চলে যাচ্ছিলাম চৃষ্টিয়া
ছেড়ে-প্রারাজিত, কপৰ্দিকীন।

এমনি সময়ে অ্যাচিট
আবির্ভাব ঘটল অসম্ভব মেটা
এক লোকের। সামান্য একটা
কাজের জন্মে প্রচুর টাকা

দিতে চায়। নিলাম কাজটা।
এবং জড়িয়ে গেলায় আচর্য
এক রহস্যময়ীর জটিল
মায়াজালে। জানতাম না,
তাই নিচিপ্তে পা বাংলালাম

সর্বনাশের পথে।
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা,
ঢাকা ১০০০
mail:
aloconabibhag@gmail.com

শো-রূম
৩৬/১০ বাংলাবাজার,
ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার,
ঢাকা ১১০০

সাইকো

রিয়াজুল আলম শাওন

অরণী জানে

না

কালো

পোশাক

পরা

এক লোক

তাদের ড্রায়িং

রুমে বসে

আছে।

তার পকেটে

গুলি ভর্তি

বিভঙ্গার।

এক

নি

জাম সাহেব উঞ্চিগুথে তার মেয়ে অরণীর দিকে তাকালেন। এই মেয়েটি অনেক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বাবা হিসেবে তিনি এ সমস্যায় তেমন জোরাল ভূমিকা রাখতে পারছেন না। তাঁর স্ত্রী আনোয়ারা থাকলে হয়তো তাঁকে এত চিন্তা করতে হত না। কিন্তু অহন ছেট থাকতেই তিনি অন্য একজনকে বিয়ে করে বিদেশে পার্দি জমান। মেয়েটি বলতে গেলে একা একাই বড় হয়েছে। নিজাম সাহেব অনেকবার বিয়ের চিন্তার করেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পুরোপুরি সাহস করে উঠতে পারেননি।

নিজাম সাহেবের বর্তমান চিন্তার বিষয়: ব্যবসায়ের কাজে দু'দিন ঢাকার বাইরে যাওয়া নিয়ে। এ দু'দিন অরণী এবং কাজের মেয়ে ফুলি বাসায় একা থাকবে।

অরণীর দিকে তাকিয়ে নিজাম সাহেব বললেন, 'মা, একা থাকতে পারবি তো?'

'কেন পারব না, বাবা! ফুলি তো আছেই। আর আমি কি কঢ়ি খুকি নাকি যে ভয় পাব!'

'তুই তো আমার কাছে কঢ়ি খুকি ইই!' একটু খেমে নিজাম সাহেব আবার বললেন, 'মা, আমি খুবই চিন্তায় পড়ে গেছি, সুযোগ থাকলে তোকেও নিয়ে যেভাবে।'

'আহা! বাবা চিন্তা কোরো না। আমার কোনও সমস্যা হবে না। আর তুমি বাসায় কতক্ষণই বা থাকো? সকালে অফিস চলে যাও, আসো গভীর রাতে। আমি বলতে গেলে একাই থাকি।'



নিজাম সাহেবের মুখ আরও গঁথীর হলো।
অরণী ঠিকই বলেছে। মেয়েটিকে তিনি অনেক
কম সময় দিয়েছেন। অপরাধীর মত মুখ করে
বললেন, 'মা, আই অ্যাম সরি। তোর যত্ন
ঠিকভাবে করতে পারিনি।'

'বাবা, ডোক্ট বি ফর্মাল। আমি অনেক
ভাগ্যবর্তী বলেই তোমার মত বাবা পেয়েছি।
তুমি ছেটবেলো থেকেই ভালবাসা দিয়ে আমার
জীবন পূর্ণ করেছ। তুমি প্রথিবীর শ্রেষ্ঠ
বাবা।'

'হয়েছে, হয়েছে, আর বলতে হবে না।
তোর জন্য কিছু আনতে হবে?'

'না, বাবা।'

'একটা কিছু বল।'

'আচ্ছা, এক টিন চকলেট এনো।'

'আর কিছু?'

'আর কিছু লাগবে না।'

ঘর থেকে বেরোনোর সময় নিজাম সাহেব
অরণীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন,
'মা, তুই সাবধানে থাকিস। সমস্যা হলে ফোন
করিস।'

'আচ্ছা, বাবা, তুমি ও সাবধানে থেকো।
ওমুখ খেতে ভুলো না।'

নিজাম সাহেব ঘর থেকে বের হলেন।

দুই

লোকটার মধ্যে ধৈর্য খুব কম। কলিংবেল
বাজিয়েই চলেছে। ফুলি দরজা স্থুলে দিল।
অচেনা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে কালো
জামা, প্যান্ট এবং জ্যাকেট, মাথায় কালো
হাট। পায়ে কালো শু। দেখে কেমন যেন ভয়
লাগছে ফুলির।

লোকটি বলল, 'মিস অরণী বাসায়
আছেন?'

ফুলি ভৌত গলায় বলল, 'জী আছেন।'

'মিস অরণীকে বলো আমি তার সাথে
দেখা করতে চাই।'

'আপনার পরিচয়?'

'আমি শাহেদ চৌধুরী।' লোকটি এর
বেশিকিছু বলতে আগ্রহী নয়।

ফুলি দ্রুত সরে পড়ল।

অরণী মন দিয়ে পত্রিকা পড়াচিল। যদিও
পত্রিকায় ভাল কোনও খবর নেই। শুধু খুন,
ধর্ষণ আর রাজনৈতিক সিহিংসতার খবর।
এসবের মধ্যে কিছু আবার ধারাবাহিকভাবে
ছাপা ও হচ্ছে।

গতমাস থেকে এক খুনিকে নিয়ে নিয়মিত
খবর আসছে পত্রিকার পাতায়। পুলিশ হন্তে
হয়ে সেই খুনিকে খুঁজেছে। যদিও পুলিশের
কাছে তার কোনও ছবি নেই। গত এক মাসে
সেই খুনি পাঁচটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।
প্রতিটি হত্যাকাণ্ডই হয়েছে ফ্ল্যাটবাড়িতে।
পুলিশ ফ্ল্যাটগুলোর দারোয়ান, কেয়ারটেকার
এবং অন্যান্য সুত্র থেকে জানতে পেরেছে, খুনি
প্রতিটি বাড়িতেই গেছে কালো পোশাক পরে।
পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো পোশাক। এই
পোশাকের সাদৃশ্য এবং শারীরিক গড়নের
বর্ণনা শুনে পুলিশ বুঝতে পেরেছে, এই পাঁচটি
হত্যাকাণ্ডের খুনি একজনই। এই ভয়ঙ্কর
সিরিয়াল কিলারকে পুলিশ এবং মিডিয়া 'কালো
খনি' বলে অভিহিত করছে। এই কালো খুনি
প্রথম তিনিটি হত্যাকাণ্ড করেছে ধারাল অস্ত্ৰ
দিয়ে এবং শেষ দুটি করেছে খাসরোধ করে।
পুলিশ শহরবাসীকে সাবধানে থাকতে বলেছে
এবং কালো পোশাক পরা বা সদেহভাজন
কোনও ব্যক্তিকে দেখলে তাদের খবর দিতে
অনুরোধ জানিয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ
স্থানগুলোতে পুলিশ চেকিং বাড়িয়েছে। পুলিশ
সদেহভাজন বেশ কয়েকজনকে প্রেক্ষিতার
করলেও প্রকৃত খুনি ধরা পড়েনি।

পত্রিকায় ভয়ঙ্কর খবরটা পড়ে বেশ চমকে
উঠল অরণী। ওরাও তো একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে
থাকে। তার উপর বাবা বাড়িতে নেই। দরজা
বন্ধ করা কি না চেক করতে হবে। গেটে যদিও
দারোয়ান আছে। তবুও সতর্ক থাকা ভাল।
অরণী জানে না কালো পোশাক পরা এক লোক
তাদের ভ্রাইঞ্জেম বসে আছে। তার পকেটে
গুলি ভত্তি রিভলভার।

তিনি

অরণী শাওয়ার নিতে বাথরুমে ঢুকেছে।
দীর্ঘদিন ধরে ও ইউনিভার্সিটির যাচ্ছে না। ওর
জীবনের উপর দিয়ে প্রবল বাড় বয়ে যাচ্ছে।

চরম এক দুঃসময় ওর জীবনকে ঘিরে ধরেছে। এই দুঃসময়ের সূচনা বঙ্গ আবিদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। ওর সবচেয়ে কাছের বঙ্গ ছিল আবিদ। হঠাতই আবিদের নীলা নামের একটা ঘেয়ের সাথে সম্পর্ক হয়। আবিদের এই হট করে সম্পর্কে জড়ানোর বিষয়টায় বেশ মন খারাপ হয়েছিল অরণী। কারণ এখন আবিদ ধীরে ধীরে দূরে সরে যাবে। এটাই তো শাভাবিক। আবিদ কিছুটা দূরে সরে গেল ঠিকই, তবে অরণীর সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করল। সম্পর্কের কয়েক মাস পরেই আবিদ নীলার সম্পর্কে ফাটল ধরল। আবিদের এই দুঃসময়ে অরণী ওর পাশে দাঁড়াল। ওকে বেশি সময় দেয়া শুরু করল। দু'জনের একসাথে ঘোরাঘুরি, রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ, নৌকা ভ্রমণ সবকিছুই চলতে থাকল। ওদের বঙ্গতু পেল নতুন মাত্রা। অরণীর সাথে মেলামেশার সূত্র ধরে আবিদ আর নীলার সম্পর্কের আরও অবনতি হয়েছিল। এভাবেই চলছিল দিনগুলো।

কয়েক মাস আগে অরণী আর আবিদ গাড়ি নিয়ে লং ড্রাইভে গিয়েছিল। শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে গেল ওরা। হঠাতে আবিদ বলল, ‘চলো রেললাইনে ইঁটি’।

অরণী রাজি হলো।

জায়গাটা নির্জন।

আশপাশে লোকবসতি নেই।

গাড়ীটা পার্ক করে নেমে পড়ল ওরা। রেললাইন ধরে কিছুক্ষণ পর ইঁটবার পর হঠাতে আবিদ বলল, ‘অরণী, তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই।’

‘বলো।’

‘আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। তোমাকে বিয়ে করতে চাই।’

কথগুলো শুনে অবাক বিশ্ময়ে তাকিয়ে রইল অরণী।

পাগলের মত এসব কী বলছে আবিদ?

আবিদকে কখনোই বঙ্গুর চেয়ে বেশিকিছু তাবেনি অরণী। আবিদকে বোঝানোর চেষ্টা করল।

কিন্তু আবিদ ছিল নাছোড়বাদা। চিন্কার করে বলল, ‘নীলার সাথে সম্পর্কে জড়ানো ছিল

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। আমি সত্ত্বিকার অর্থে তোমাকেই ভালবাসি। তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি না হলে আমি ওই চলন্ত ট্রেনের নীচে ঘোপ দেব।’

অরণী তাকিয়ে দেখল দ্রুতগতিতে আসছে একটা ট্রেন। ৩-ও চিন্কার করে ভয়ার্ট গলায় বলল, ‘আবিদ, পিংজ এমন কোরো না। আমাকে কিছুদিন ভাবার সময় দাও।’
‘না। তোমাকে এখনই তোমার সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।’

অরণীর চিন্তাশক্তি লোপ পেল। মাথার ভিতর সবকিছু কেমন যেন ওলট-পালট হতে লাগল। এর্দিকে ট্রেনটাও কাছে চলে এসেছে।

আবিদ রেললাইনের উপরে শুয়ে পড়ল। মাথাটা রেললাইনের বাইরে, আর পুরো শরীর রেললাইনের উপর।

অরণী আকুল হয়ে আবিদকে ডাকল। কিন্তু আবিদ কথার উভয় দিল না। তার চোখ বঙ্গ, ট্রেনটা পিষ্ট করল আবিদকে। পুরো শরীর ছিলভিন্ন হয়ে গেল। তবে মাথা এবং পায়ের নীচের কিছু অংশ অক্ষত থাকল।

আবিদের লাশের পাশে বসে চিন্কার করে কাঁদতে লাগল অরণী, একসময় বাবাকে ফোন করল। তিনি পুলিশে খবর দিলেন।

এই ঘটনার পর অরণী দীর্ঘদিন রাতে ঘুমাতে পারেনি। কড়া ঘুমের ওষুধ খেলে রাতে একটু তদ্বামত আসে, কিন্তু বাবাবার বিকট স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙে। তার ইউনিভার্সিটিতে যাওয়াও বক্ষ হলো। জীবন আরও দুর্বিসহ হয়ে উঠল, যখন পুলিশ তাকে বিভিন্নভাবে জেরা করতে থাকল।

পুলিশ এমনভাবে প্রশ্ন করত, যেন অরণীই আবিদকে মেরেছে। পুলিশ তার ফিঙ্গার প্রিণ্ট এবং ডিএনএ নমুনাও সংগ্রহ করেছে। তাদের তদন্তকাজ অব্যাহত রেখেছে।

এখনও মাঝে মাঝে পুলিশের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে অরণীকে। তবে ওকে প্রেক্ষণাত্মক করার মত কোনও প্রমাণ তারা এখনও পায়নি।

অরণী শাওয়ার শেষে বেরোল। তাকে লাগছে শুভ পর্যায় মত। নিজেকে আয়নায়

দেখতে ভালই লাগছে। ইচ্ছা করছে সাজতে। এমন চিন্তা যখন মাথায় ঘোরাঘুরি করছে, ফুলি এসে খবর দিল শাহেদ চৌধুরী নামে একজন তার সাথে দেখা করতে এসেছে।

অরণী বিরক্ত হয়ে বলল, ‘শাহেদ চৌধুরী কে?’

‘আমি তো জানি না, আফা।’

‘তুমি অচেনা মানুষকে ঘরে ঢুকিয়েছ কেন?’

‘অচেনা না তো। আপনারে চেনে।’

অরণী শাহেদ চৌধুরী নামে কাউকে চেনে বলে মনে করতে পারল না। কে জানে, লোকটি হয়তো পুলিশের কোনও কর্মকর্তা। আবার হয়তো তাকে উট্টা-পাট্টা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। তবে ও জানে, কোনও গ্রাউণ্ডেই পুলিশ ওকে আটকাতে পারবে না।

অরণী দ্রুতিক্রমে ঢুকল।

শাহেদ চৌধুরী নামের লোকটি উঠে দাঁড়াল। তার দিকে তাকিয়ে অরণীর মুখ রক্ষণ্য হয়ে গেল। হাত পা জমে যেন কাঠ হয়ে গেছে।

লোকটির আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা।

এই লোকটিই কি সেই বিকারগত খুনি, যাকে পুলিশ হনো হয়ে খুঁজছে?

আজ কি তার পালা?

ফুলি কোথায় গেল?

ফুলিকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

অরণীর বমি বমি লাগছে। টেনশনে মাথা ঘূরছে। সে খুব চেষ্টা করছে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার। কিন্তু ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন। তার হাতও অল্পবিস্তর কঁপছে।

গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে অরণী বলল, ‘বে আপনি?’

‘আমি শাহেদ চৌধুরী।’

‘আমার কাছে কী প্রয়োজন?’

শাহেদ চৌধুরী সানগ্লাস এবং হ্যাটটি খুললেন। পকেট থেকে মোবাইল বের করে সামনের টেবিলে রাখলেন। এরপর বললেন, ‘একটু রিলাক্স হয়ে বসে ধীরে সুস্থি কথা বলি। আমার কোনও তাড়া নেই।’ শাহেদ চৌধুরীর

গলার শব্দ শুক, খসখসে।

অরণীর খুব ইচ্ছা করছে দৌড়ে পালিয়ে যেতে। তবু মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করে বলল, ‘এসব কী ধরনের কথা?’

‘আপনার বাবা কোথায়?’

‘বাবা, একটু বাইরে গেছে। এক্সুনি চলে আসবে।’

‘কেন মিথ্যা বলছেন, অরণী। আপনার বাবা দুদিনের জন্য ঢাকার বাইরে গেছেন। আমি সব জেনে শেনেই এসেছি।’

অরণীর শিরদাঁড়া দিয়ে ‘শীতল স্ন্যাত বয়ে গেল। ‘পিল্জ, আপনার প্রয়োজনটা বলন।’

শাহেদ চৌধুরী হেসে বলল, ‘প্রয়োজন আপনাকে।’

‘আমাকে মানে?’

‘আপনি সুন্দর।’

‘কী!!’

‘বাইরে থেকে আপনার শরীরটা বেশ সুন্দর লাগছে। তিতরটাও কি একইরকম সুন্দর?’ বিনা সংকোচে কথাঞ্জলি বলল শাহেদ চৌধুরী।

অরণী উঠে দাঁড়াল।

এসময় শাহেদ তার প্রিয় রিভালভারটি বের করল। ইঙ্গিত করল অরণীকে বসতে।

অরণী উদ্ব্লাঙ্গের মত বসে পড়ল, বিড়বিড় করে বলল, ‘আমাকে মারবেন না... আমাকে মারবেন না, পিল্জ।’

‘আমি কি একবারও বলেছি আপনাকে মারব।’

‘আমি আপনাকে চিনেছি। আপনি সেই ত্বরক্ষর কালো খুনি।’

জোরে হেসে উঠল শাহেদ চৌধুরী, ‘কালো খুনি! ভালই বলেছেন। তারে আপনাকে মারার কথা এখনও চিন্তা করিন। প্রথমে আপনাকে ভাল করে দেখব। আদর করব, তেষ্টা মেটাব। এরপর সিন্ধান্ত নেব আপনাকে বাঁচিয়ে রাখব না মেরে ফেলব।’

অরণীর খুব কান্না পাছে। চিন্তার করে ডাকতে ইচ্ছা হচ্ছে বাবাকে।

লোকটি কি মাতাল হয়ে এসেছে?

এখন কী করবে?

ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে?

ওকে লিঃশ্কুনের মত খুবলে খুবলে
খেয়ে শেষে হত্যা করবে?

কিন্তু লোকটির সাথে তো ওর কোনও
শক্তি নেই!

লোকটি কি ওকে আগে থেকেই চিনত?

নানা অশু অরণীর মাথায় ঘূরপাক থাইছে।

অরণী হঠাতে চিন্দকার করে উঠল, 'ফুলি...
ফুলি!'

শাহেদ চৌধুরী বললেন, 'ফুলিকে আমি
বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আগামী কয়েক দিনের
মধ্যে ও আসবে না। আপনার আর চিন্দকার
করা উচিত হবে না। আমার হাতের টিপ খুব
ভাল। অনেকদূর থেকেও সুন্দর গুলি করতে
পারি।' শাহেদ চৌধুরী বিকট শব্দে হাই
তুলল।

অরণী বলল, 'আমি যদি আপনাকে টাকা
দিই, তবে কি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন?'
'কত টাকা?'

'ঘরে পাঁচ লাখ টাকা ক্ষাণ
আছে। ব্যাংকেও আমার নামে কিছু টাকা
আছে।'

শাহেদ চৌধুরী রিভালভার টেবিলের উপর
রাখল।

অরণী একটা ব্যক্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

টেবিলটা শাহেদ চৌধুরীর থেকে একটু
দূরে।

অন্তত এখনই ওকে মেরে ফেলছে না সে।

টাকার কথা শনে লোকটা মনে হয় একটু
নরম হয়েছে। অরণী ভাবছে, দ্রুত কিছু করতে
হবে। ওকে বাঁচতেই হবে।

শাহেদ চৌধুরী বলল, 'চাওয়া-পাওয়া
নিয়ে পরে কথা বলব। আগে এক কাপ চা
খেতে চাই। চাওয়াতে পারবেন?'

অরণী সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল।

শাহেদ চৌধুরী আবার বলল, 'না, এক
কাপ না, দু'কাপ চা আনবেন। আমরা দু'জনে
চা খেতে খেতে কথা বলব। তবে একটা কথা...
কোনও চালাকি করার চেষ্টা করবেন না।
রান্নাঘরটা তো পাশেই। আর রিভালভারটাও
গুলি ভর্তি। বোকার মত চিন্দকার চেমেচি
করবেন না।'

অরণী আবারও মাথা নাড়ল।

চার

অরণী বেশ বাভাবিক ভঙ্গিতেই চা বানাচ্ছে।

শাহেদ চৌধুরী ড্রয়িংরুমে গান গাইছে:
'ঞ্জপের ওই প্রদীপ জ্বলে কী হবে তোমার...'

অরণী রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাইরে
দেখার চেষ্টা করছে। যদি একবার কাউকে
বলতে পারত তিতরে কী ঘটছে।

শাহেদ চৌধুরী এমনসময় ড্রয়িংরুম থেকে
বলল, 'মিস অরণী, চা বানাতে এত সময়
লাগছে কেন? বোকার মত কিছু করবেন না
আশা করি।'

অরণী দ্রুত চা নিয়ে ড্রয়িংরুমে তুলল।
কাপা হাতে শাহেদ চৌধুরীকে কাপটা এগিয়ে
দিল।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে শাহেদ চৌধুরী
বলল, 'মেলি, মেলি থ্যাংক্স। আর আপনি দূরে
বসছেন কেন? আমার পাশের সোফাটা
বসুন।'

অরণী শাহেদ চৌধুরীর পাশের সোফায়
বসল। সে এখন শাহেদ চৌধুরীর চেয়ে দ্রুত
রিভালভার তুলতে পারবে। ও বেশ
আত্মিকাশী।

শাহেদ চৌধুরী চায়ে চুম্বক দিতে দিতে
বলল, 'চা, বেশ ভাল হয়েছে। থ্যাংক্স।
আপনার চা চাওয়া শেষ হলে সময় নষ্ট না করে
গায়ের পোশাক খুলে ফেলবেন। আপনার
সৌন্দর্যের একটা পরীক্ষা নেব। আমি দেখতে
চাই পোশাক পরলে আপনাকে বেশি সুন্দর
লাগে, নাকি পোশাক ছাড়া।'

অরণীর কান ঝোঝো করতে থাকল। লাল
হাতে শুরু করে মুখ।

লাক্ষিয়ে উঠে দ্রুত রিভালভারটি তুলে
নিল। বেশ খানিকটা দূরে চলে গেল শাহেদ
চৌধুরী থেকে।

দৃশ্যটি দেখে শাহেদ চৌধুরী এতটুকু
বিচলিত হলো না। 'রিল্যাঙ্ক, অরণী, রিল্যাঙ্ক।'

'হারামজাদা, তোকে আমি খুন করে
ফেলব! তোকে টুকরো টুকরো করব!'

'অরণী উত্তেজিত হবেন না। উই ক্যান
টক।'

‘তোর সাথে আর কীসের কথা বলব! তুই
আমাকে এখনও চিনিসনি! তোকে ড্যানক
যন্ত্রণা দিয়ে মারব! আমি বিষধর সাপ! আমার
শরীরের সবচূর্ক বিষ তোর শরীরে ঢেলে দেব!’

শাহেদ চৌধুরী হাসার চেষ্টা করল।

অরণী রিভালভারটি নামিয়ে বলল, ‘হেসে
নে, হেসে নে! রিভালভারের আর অয়েজন
নেই। কারণ তুই এখন আমার হাতের পুতুল।
তোর আর এতকুন নড়ার সার্থক্য নেই। কারণ
তোর চায়ে আমি অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ
মিশিয়ে দিয়েছি। এতক্ষণে ওষুধ তার কাজ
কর করেছে। তুই ইচ্ছা করলেও এক চুল
নড়তে পারবি না।’

শাহেদ চৌধুরীর হাত থেকে চায়ের কাপ
পড়ে গেল। কাপে খাবা চা-টুকু মেরেতে
ছড়িয়ে পড়ল। শাহেদ চৌধুরী জড় পদার্থের
মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। দেখে
মনে হচ্ছে কী ঘটেছে বুঝতে পারছে না।

অরণী আবারও বলল, ‘তুই অনেক
আত্মবিশ্বাসী, তাই রিভালভার মোবাইল সব
টেবিলের ওপর রেখেছিস। ভেবেছিস আমি
অবলা নারী। আমি তোর কিছু করতে পারব
না। কিন্তু আমি তোর মতই ভয়ঙ্কর। আমি এই
পর্যন্ত তিনটা খুন করেছি।’

শাহেদ চৌধুরী আস্তে-আস্তে বলল,
‘কাকে হত্যা করেছেন?’

‘প্রথমে একটা ছোট বাচ্চা শিহাবকে খুন
করেছি। এরপর আবিদকে এবং সর্বশেষ
আমার প্রিয় মবিন স্যারকে। আবিদকে খুন
করার পর অবশ্য একটু পুলিশি বামেলায়
পড়েছিলাম। অবশ্য এখন সামলে উঠেছি।
আমার বিকলে কোনও প্রমাণ নেই। আমি
সবাইকে বুঝিয়েছি আবিদ আত্মহত্যা করেছে।
আজ তোকে হত্যা করে দানে দানে চার দান
পূর্ণ করব। হাহ-হাহ-হাহ!’

পিশাচিনীর মত হেসে উঠল অরণী।

শাহেদ চৌধুরীর চোখ বক্ষ হয়ে গেছে।
সোফার উপর এলিয়ে পড়ে আছে দেহটি। মনে
হয় মারা গেছে।

অরণী ভাবল লাশটা নিয়ে কী করবে।

কেটে টুকরো করবে, নাকি বড় সুটকেসে
তরে কোথাও ফেলে দেবে?

অরণী সোফায় বসল।

আগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া যাক।

অনেকক্ষণ শরীরে নিকোটিন যায়নি।
সিগারেট খাওয়া দরকার। আরাম করে
সিগারেট খেতে খাক্ষ অরণী।

পাশে পড়া শাহেদ চৌধুরীর লাশ তাকে
এতকুন বিচলিত করছে না। অরণী পুরনো
দিনের কথা ভাবতে লাগল।

ছোটবেলা থেকেই অনেক মানসিক
সমস্যা নিয়ে বড় হয়েছে ও। বয়ঃসন্ধিকালে
লক্ষ করল, কোনও সুদর্শন ছেলের পাশে
নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে কল্পনা করতে পারে
না। সেই ছেলে যদি অন্য কোনও যেয়ের সাথে
মেলায়েগা করে বা অন্য কোনও যেয়েকে
প্রাধান্য দেয়, তবে অরণীর ইচ্ছা করে
দুজনকেই যেরে ফেলতে। ও যত বড় হতে
থাক্ষ, ওর ডিতরের পন্থটা তত জেনে উঠল।
কাউকে খুন করতে চাইলেই তো খুন করা যায়
না। তাই না পাওয়ার যন্ত্রণা এবং তীব্র আক্রোশ
মিলেমিশে একাকার হলো। অরণী প্রথম খুনটা
করল গত বছরের এপ্রিলে। ওর চাটাতো তাই
সোহাগ। যাকে ছোটবেলা থেকেই অরণীর খুব
পছন্দ। একসময় প্রীতি নামে একটা যেয়েকে
বিয়ে করে সোহাগ। অরণীর ক্রোধ, হিংসা
লাগাম ছাড়া হয়ে গেল এতে। তবুও দৈর্ঘ্য ধরে
অপেক্ষা করল সুযোগের জন্য।

প্রতিশোধ নিতে চাইছে অরণী।

চরম প্রতিশোধ।

ওকে অবজ্ঞা করার শাস্তি সোহাগকে
পেতেই হবে।

একসময় সোহাগ-প্রীতির ঘর আলো করে
এল ওদের প্রথম সন্তান শিহাব। গত বছর
এগ্রিলের দশ তারিখ শিহাবের বয়স তিন বছর
পূর্ণ হয়েছে। এ উপলক্ষে জন্মদিনের বিশাল
অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল সোহাগ-প্রীতি
দম্পত্তি। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে নিজাম সাহেব
এবং অরণীও যোগ দিয়েছিল। জন্মদিনের
অনুষ্ঠানটা হয় ছাদে। অরণী ভাল করে ছাদটা
লক্ষ করেছে। দেখতে গেল ছাদের পিছনের
অংশটায় রেলিং নেই এবং বৃষ্টির পানিতে
জয়গাটা বেশ পিছিল। এ সুযোগটাই নিল
অরণী। জন্মদিনের পার্টি শেষে সবেমাত্র

লোকজন বিদায় নিতে শুরু করেছে। অরণী সবার চোখ এড়িয়ে ছাদের ওই রেলিংবিহীন অংশে কিছু চকলেট ছড়িয়ে রাখে। এমনভাবে যে, একদম ছাদের কিনারে না গেলে চকলেট নেয়া সম্ভব নয়। শিহাবকে এলোমোভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখল অরণী। শিহাবের দিকে কারও নজর নেই। ও শিহাবের হাতে বেশকিছু চকলেট দিল। খুব খুশি হলো শিহাব। চকলেট তার খুব পছন্দ।

অরণী বলল, ‘শিহাব, বাবা, আরও চকলেট নেবে?’

শিহাব মাথা দোলাল।

অরণী আবারও বলল, ‘দেখো ছাদের ওপাশে কত চকলেট পড়ে আছে। যাও, নিয়ে এসো।’

শিহাব দৌড়ে গেল। পিছিল জায়গাতে পৌঁছে গেছে। হাঁটছে আর একটা পর একটা চকলেট তুলছে।

অরণী শাস বক করে অপেক্ষা করল।

ঠিক এসময়ই একটা আর্টিচকার হলো। সবাই ছেটাছুটি শুরু করল। মুহূর্তেই জনাদিনের আনন্দ ঝুপ নিল গভীর বিষাড়।

শিহাব মারা যাওয়ার পর পুলিশ এল। কিন্তু কোনও মালা হলো না। কারণ সবার চেয়েই ওটি একটি দৃঢ়টান।

সোহাগ-গ্রীতির সুরের সংসারে নামল কালো ছায়া।

গ্রীতি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।

সোহাগও চাকরি ছেড়ে দিনরাত বাসায় বসে থাকল।

ওদের কষ্ট দেখে বড় ভাল লাগত অরণীর।

শিহাবকে হত্যার পর বেশ সাবধানে চলতে হয়েছে অরণীকে।

সে আর কাউকে হত্যা করতে চায়নি। কিন্তু তার মনের পশ্টা আবার জেগে উঠলে কয়েক মাস আগে সে আবিদকে হত্যা করেছে।

আবিদ অরণীর অনেক কাছের বস্তু ছিল।

কিন্তু আবিদ-নীলার সম্পর্কের কথা শুনে বেশ বড়সড় ধাকা খেয়েছিল অরণী। প্রথমদিকে অবশ্য আবিদকে মারার ইচ্ছা ছিল

না। যুল লঙ্ঘ্য ছিল নীলার সাথে আবিদের সম্পর্কটা ভেঙে দেয়ার। কিন্তু নানা চেষ্টা করেও সফলতা এল না। এক সময় অরণী আবিদের বক্ষস্থ নিয়ে নীলার মনে প্রশ্ন জাগল। অরণীকে নিয়ে আবিদ ও নীলার মধ্যে মনোমালিন্য হলো। ওই সময় অরণী আবিদকে বেশি সময় দিচ্ছিল। একদিন শহরের বাইরে ঘুরতে গিয়ে রেললাইন ধরে হাঁটছিল আবিদ এবং অরণী। অরণী তখন আবিদকে তার মনের কথা খুলে বলেছিল। আবিদকে ও নিজের করে পেতে চায়।

আবিদ কথাগুলো শুনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল।

অরণী তৎক্ষণাত নিল আবিদকে সরিয়ে দিতে হবে। ও দেখল দ্রুতগতিতে আসছে একটা ট্রেন। এমনসময় আবিদকে বলল, ‘আবিদ, আমার মোবাইলটা রেললাইনে পড়ে গেছে।’

আবিদ ট্রেনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ট্রেন আসছে তো।’

‘ট্রেন আসতে এখনও অনেক দেরি। তুমি দ্রুত দেখো তো মোবাইলটা পাও কি না।’

আবিদ উন্ন হয়ে রেললাইনে মোবাইল বেঞ্জল। বারবার দৃঢ় চলে যাচ্ছে ট্রেনের দিকে। ঠিক এমন সময় অরণী পাশে পড়ে থাকা একটা বড় লাঠি তুলে নিল। সজোরে আঘাত করল আবিদের মাথার পিছনে। রেললাইনের উপর পড়ে গেল আবিদ। অরণী তখন ওর মাথায় আবারও আঘাত করল। উঠে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলল আবিদ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবিদকে পিষ্ট করল ট্রেন।

আবিদকে হত্যার পর অরণী ত্তীয় ঝুনটি করল গত মাসে। এরার ওর শিকার হলো ওর ইউনিভার্সিটির শিক্ষক মবিন আহমেদ। মবিন আহমেদকেও অরণী নিজের করে পেতে চেয়েছিল। মবিন আহমেদও ইতিবাচক স্থানে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। এটা অরণীর জানা ছিল না। অনেক ছাত্রীকেই মবিন আহমেদ তাঁর ফাঁকা ঝ্যাটে নিয়ে গেছেন। অরণীও বেশ কয়েকবার তাঁর ঝ্যাটে গেছে। পরে বুরাল, মবিন আহমেদ কখনই ওকে বিয়ে করবেন না।

তাঁর সমস্ত লোভ অরণীর শরীরের দিকে। এরপর সুযোগ বুঝে একদিন মবিন আহমেদের ঝ্যাটে গেল অরণী। কোকের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল একগাদা ঘুমের ওষুধ। বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করল লোকটাকে। জানত দুপুর দেড়টা থেকে আজাইটা পর্যন্ত গেটে দারোয়ান থাকে না। ঠিক ওই সময়তেই অরণী তার কাজ সমাধা শেষে বেরিয়ে এল।

পাঁচ

মবিন আহমেদকে হত্যার পর অরণী নিয়মিত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সুফিয়া খাতুনের কাছে গেছে। সে আর খুন করতে চায় না। সন্তুষ্ট হলে স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে। কিন্তু আজ আবারও তার খুনি সস্তা জেগে উঠল। যদিও কাজটা অরণী করছে নিজেকে বাঁচাবার জন্য।

রান্নাঘর থেকে বটিটা নিয়ে এল অরণী। শাহেদ চৌধুরীর লাশটা টুকরো টুকরো করতে হবে। কাজটা বেশ কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। তবে সে কাজটা ভালভাবেই করতে পারবে। ফুল চলে ঢেলে অবশ্য বিপদ হবে।

অরণী শাহেদ চৌধুরীর কাছে গিয়ে বলল, ‘ঘূমাও, কালো খুনি, ঘূমাও।’

এমনসময় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল শাহেদ চৌধুরী। বলল, ‘না, এখন আর ঘূমাব না। তোমার সাথে অনেক হিসাব-নিকাশ আছে।’

অরণী ভূত দেখবার মত চমকে উঠল।

শাহেদ চৌধুরী পকেট থেকে অন্য একটি রিভলভার বের করল। ‘অরণী, বটিটা ফেলে দিয়ে ওই সোফাটায় বসুন। আমি আপনাকে আবারও বলছি, ওই সোফাটায় বসুন।’

অরণী বটি ফেলে সোফায় বসে পড়ল।

শাহেদ চৌধুরী আবার বলে উঠল: ‘আগের রিভলভারটা খেলনা ছাড়া কিছুই নয়। ওটা আপনার কাজে আসবে না। তবে আমার হাতেরটা আসল।’

শাহেদ চৌধুরী আবারও বলল, ‘মিস অরণী, আমি কালো খুনি নই, আমি ডিবি পুলিশ অফিসার শাহেদ চৌধুরী। কালো খুনির বেশ ধরে আপনার কাছে এসেছি। কালো খুনি আজমল শিকদারকে পুলিশ আজ সকালেই গ্রেফতার করেছে। যদিও সংবাদ-মাধ্যমের

কাছে বিষয়টা গোপন রাখা হয়েছে। আপনি একজন খুনি এটা পুলিশের তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। আপনি একজন সাইকো, এ-ও জেনেছি আমরা। তাই পরিকল্পনা করা হয়, আপনার খুনি সত্তা জাগানোর জন্য অন্য এক খুনির মূখ্যমূর্তি করতে হবে আপনাকে। আমাদের পরিকল্পনা কাজে সেগোছে। আপনি তিনিটি খুনের কথা স্বীকার করেছেন। আমার মোবাইলটা টেবিলে রেখেই কল করেছি পুলিশ কঠ্টেল রুমে। ওখানে বসে পুলিশের অনেক কর্মকর্তাই প্রথম থেকেই আমাদের কথোপকথন শুনেছেন। এ বাড়ির আশপাশেও সাদা পোশাকে অসংখ্য পুলিশ অপেক্ষা করছে। আবিদ সাহেবের মৃত্যুর পর থেকেই আমরা আপনার উপর নজর রাখছি। আপনি মবিন আহমেদকে হত্যার পর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সুফিয়া খাতুনের কাছে গিয়েছেন। সেখানে আপনি আপনার কৃতকর্মের কথা স্বীকার করেছেন। সুফিয়া খাতুনের অফিস থেকে আমরা গোপনে আপনার কেস হিস্ট্রির ফাইলটি সরিয়ে নিই। তিনি অবশ্য আমাদের কোনও তথ্য দেননি। ফাইলের তথ্য পড়েই আমরা জানতে পারি, আপনি একজন সাইকো।’

একটু থেমে শাহেদ চৌধুরী আবার বললেন, ‘আমি আপনাকে বাগিয়ে দেয়ার জন্য কিছু অঁশীল কথা বলেছি। সেজন্য আমি দুঃখিত। এ-ও আমাদের পরিকল্পনার অংশ ছিল। আপনি হয়তো অবাক হচ্ছেন কড়া ঘুমের ওষুধ মেশানো চা থেয়ে কীভাবে বেঁচে আছি। আসলে আপনি যেন চায়ে ঘুমের ওষুধ বা বিষ মেশাতে পারেন, সে সুযোগ আমিই তৈরি করে দিয়েছি। হয়তো লক্ষ করেননি, আমি চায়ে চুমুক দেয়ার ভাব করেছি। তবে এক ফেঁটা চাও খাইনি। সোফার পাশের গাছসহ টবের বালিতে গেছে পুরো চা। আপনি বললেন চায়ে ঘুমের ওষুধ আছে, আমি বুরলায় সঠিক খুনি কাজে নেমেছে।

‘মিস অরণী, আপনি খুনি, ধূরঙ্গার এটা ও ঠিক, তবে অতি ধূরঙ্গার নন। শেষ দুটি খুন করার সময় অনেক শ্রাম রেখে গেছেন। শিহাব যখন ছাদ থেকে পড়ে মারা যায়, তখন পুলিশের এটা রহস্যজনক মনে হয়েছিল, কিন্তু

কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শিহাবের মাদ্বাবাও কোনও মামলা করেননি। কিন্তু আবিদ সাহেবের মৃত্যুর পর আপনাকে প্রথমেই সন্দেহ করেছি আমরা। আপনি আবিদকে পেছন থেকে আঘাত করেন। এর পর তিনি রেললাইনে পড়ে যান। আবিদের মাথা মোটামুটি অক্ষত থাকার কারণে আমদের প্রমাণ পেতে সুবিধা হয়েছে।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট: আবিদের মাথায় লাঠি জাতীয় কোনও কিছুর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আর রেললাইনের পাশ থেকে সেই লাঠিটিও উদ্ধার করা হয়েছে। আপনার ফিঙার প্রিন্ট এবং ডিএনএর নমুনা আমরা আগেই সংগ্রহ করেছি। লাঠির উপর থাকা ফিঙার প্রিন্টের সাথে আপনার ফিঙার প্রিন্ট পুরোপুরি মিলে গেছে।

‘মরিন আহমেদকে খুনের বিষয়ে আমরা প্রথমে আপনাকে সন্দেহ করিনি। তবে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি, আপনি প্রায়ই ওই ফ্ল্যাটে যেতেন। আপনি যখন মরিন আহমেদকে ঘুমের ওধূধ খাইয়ে বালিশ ঢাপা দিয়ে হত্যা করেন, তখন আপনার কয়েকটি চুল ছিঁড়ে পড়ে বিছানায়। সেসব চুল আমরা ডিএনএ পরীক্ষায় পাঠাই এবং আপনার ডিএনএ নমুনার সাথে তার মিল পাই। এমনকী ঘটানাক্তলে আপনি চুলের কঁটাও ফেলে গেছেন। যেটা আমদের কাজে লেগেছে। আসলে, মিস অরণী, প্রথম খুনটার মত এত সুনিপুণ খুন আপনি আর করতে পারেননি। আই আজাম সো সরি। শিহাব, আবিদ এবং মরিন আহমেদকে হত্যার দায়ে আপনাকে প্রেক্ষিত করছি।’

অরণী হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। কাঁদছে। প্রচণ্ডভাবে দুলছে ওর পুরো শরীর।

শাহেদ চৌধুরী নির্বিকার।

অরণী কাঁদতে কাঁদতেই বলল, ‘আপনার

বিভালভারটা একটু দেবেন? কথা দিচ্ছি আপনার ক্ষতি করব না। আমি নিজেই নিজেকে শেষ করব।’

‘না, অরণী, আমি তা করব না। আপনাকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে। আইনের শাস্তি আপনার প্রাপ্তা।’ শাহেদ চৌধুরী টেবিলের উপর বাঁধা মোবাইলটি তুলে নিল। পুলিশ কস্ট্রুলরমে ফোন করল।

হঃ

অরণীকে পুলিশ-ভ্যানে তোলা হচ্ছে। ফ্লি ভীত চোখে চেয়ে আছে।

অরণী শাহেদ চৌধুরীকে ডাকল। শাহেদ চৌধুরী এগিয়ে গেলেন।

অরণী মৃদু হেসে বলল, ‘শাহেদ সাহেব, আপনিও কিন্তু বাঁচতে পারবেন না।’

বাঁকা হাসি দিয়ে শাহেদ চৌধুরী বললেন, ‘তাই নাকি?’

‘হ্যা, এটা আমার চ্যালেঞ্জ। আমি আপনাকে খুন করব।’

‘জেল থেকে বেরোলে তবেই না খুন করবেন।’

‘আমি জেল থেকে বের হব, শাহেদ সাহেব। আমার একটা মাস্টারপ্ল্যান আছে।’

‘আপনার পায়ে শিকল পরানো থাকবে।’

‘তবু আমি জেল থেকে বেরোব। আপনাকে খুন না করা পর্যন্ত মরব না।’ অরণী হেসে উঠল পিশাচিনীর মত। গাড়িতে বসল।

শাহেদ চৌধুরী বেশিক্ষণ অরণীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। তাঁর মনে হচ্ছে, সত্ত্ব বলছে অরণী। বুকের ভিতরটা বারবার কাঁপতে লাগল শাহেদ চৌধুরীর। তিনি জানেন না অরণী পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে একটা ছুরি। সুযোগ পেলেই ছুরিটা বসিয়ে দেবে শাহেদ চৌধুরীর বুকে। ■

বুক ভিলা

এখানে সেবা প্রকাশনীর সমস্ত বই ও রহস্যপত্রিকা বিক্রি করা হয়।

১৯, সদর রোড (হোটেল গুলবাগ এবং সিটি ব্যাংকের নিচে)

বারিশাল।

ফোন: ০৪৩১-৬৩৭৭১০



তারেক অগু

মধ্যযুগের এক বিকেলে

বিশাল এলাকা মেরা হয়েছে বেড়া দিয়ে, টিকেট কেটে প্রবেশ করলেই আপনি
চলে যাবেন হাজার বছর আগের এক মেলায়।

শিকলের বনবন, ধাতব বর্মের সাথে
সৃষ্টীকূল তলোয়ারের আলতো স্পর্শে
উৎসরিত ধৰনি, ঘোড়ার ত্রেষা- স্ব
অলীক শব্দ একইসাথে প্রবেশ করল কর্ণকূহরে,
সেই সাথে চোখ জুড়ান্ত চকচকে শিরস্তাণে
প্রতিফলিত রোদ্ধূর, কামারের আগুম, সারি-
সারি তাঁবু, আর এক আজব তীরন্দাজকে
দেখে।

সবুজ পোশাকের লোকটা রবিনহড়ের মত
পোশাক পরলেও তীর ছুঁড়তে এখনও যোজন-
যোজন পেছনে আছে, তবুও তাকে ঘিরে
উৎসাহী জনতার ভিড়, আর পাশেই এক গাছে
লাঠকানো দাঢ়ী আসামির ছবি।

ঘোড়ার পিঠে চাপানো জমকালো জিনে
সওয়ার হয়ে এলেন চার অশ্বারোহী, ক্রসডের
সময়কার চারজন চার আলাদা-আলাদা জড়িত
প্রতিনিধিত্ব করছেন, পোশাকও পরেছেন সেই

হিসেবেই, আরব মুসলিম, ব্রিটিশ নাইট,
ক্যাথলিক স্প্যানিশ, আর এক ব্যাটা নাম না
জানা ভবঘূরে, যুক্তে যাচ্ছে খাওয়া-পরার
নিষয়তায়, পবিত্র ভূমি উদ্ধারের টানে নয়।
লেগে গেল যুদ্ধ, ঘোড়ার খুরের আঘাতে
প্রকল্পিত বালুময় যুদ্ধক্ষেত্র, তলোয়ারে
তলোয়ারে ঠোকাঠুকি লেগে ছুটল আগুনে
ফুলবুরি- দেখা যাক কে জেতে এবারের
কুসেডে!

সবটাই সাজানো খেলা যদিও। এসেছি
ফিল্যাটের হামেনলিনা শহরে, সেখানে অতল
নীল হুদের পাড়ে প্রতি শ্রীমন্ত কয়েক দিনের
জন্য বসে এই মধ্যযুগীয় মেলা। সারা ইউরোপ
থেকে আসে যোগদানকারীরা। কেউ কামার,
কেউ কুমোর, কেউ ঘোড়া, কেউ যদের
যোগানদার!

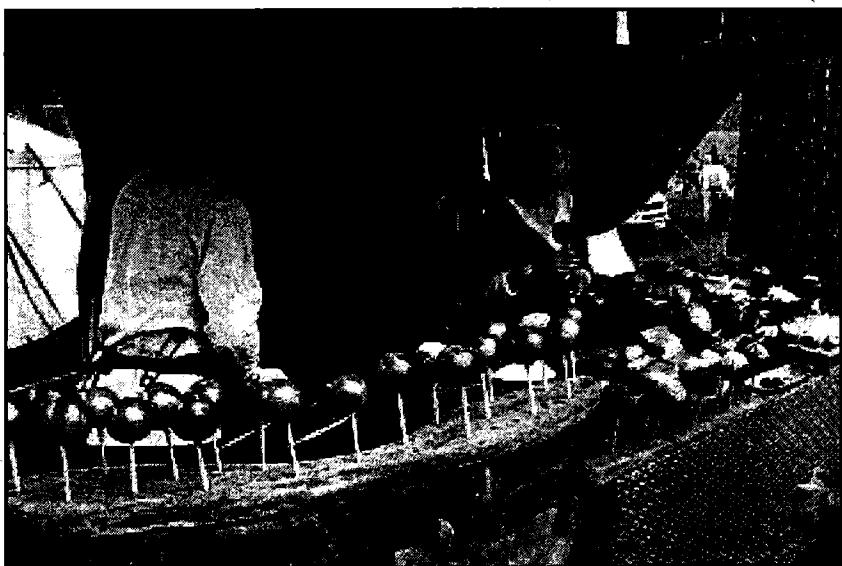
নিজেদের মাঝে প্রতিযোগিতাও চলে



বছরের সেরা অভিনেতা হওয়ার জন্য!

বিশাল এলাকা ঘেরা হয়েছে বেড়া দিয়ে,
টিকেট কেটে প্রবেশ করলেই আপনি চলে

যাবেন হাজার বছর আগের এক মেলায়। সে
আমলের কাপড়-চোপড় গায়ে, বাতাসে
আলখেল্লা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আবাল-বৃক্ষ-





বণিতা। আর আছে বেগুমার খাবারের দোকান, সেই সময়ের ঘোড়ার স্ট্যু থেকে শুরু করে উৎকৃষ্ট সমস্জ, গরম ভাজা মাংস, চিনি লাগানো

আপেল- কী নেই!

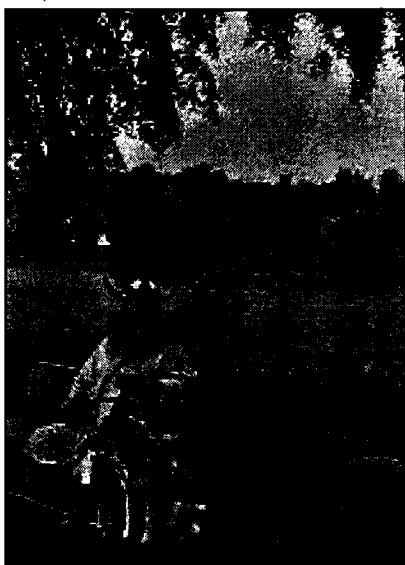
এখানেই দেখা মিলল ফ্রায়ার টাকের সাথে!

মনে আছে তো বিবিহুদের সেই যুদ্ধবাজ যত্প্রাণ সন্ধ্যাসী ফাদার টাকের কথা?

যার বাইবেলের জ্ঞান, তলোয়ারের দক্ষতা, খাবার নেশা পরিণত হয়েছিল তার জীবন্দশাতেই কিংবদন্তীতে। সেই ব্যাটা দেখি চামড়ার পোশাকে ঘেঁষে নেয়ে উঠেছে আস্ত এক শুয়োর অল্প আঁচে ছিল করতে করতে।

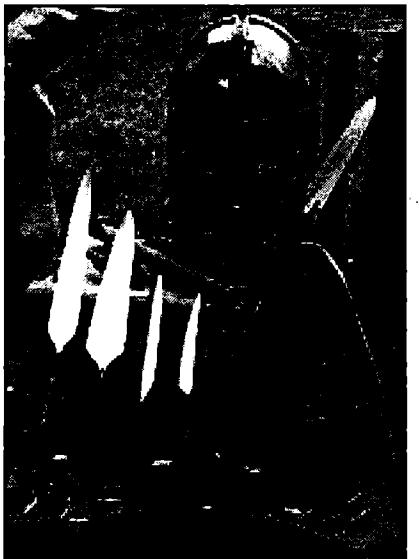
পাশেই গরমে তিতিবিক্রি হয়ে ত্রুদের ধারে কফি পান করছেন কোনও ভাইকিং দেবতা, পায়ের কাছে একান্ত অনুগতের মত ঘূরঘূর করছে নেকড়ে সদৃশ এক ভীম হাস্কি।

যদিও ভাইকিংরা কথনোই এই শিংওয়ালা হেলমেট ব্যবহার করত বলে প্রামাণ মেলেনি, মানুষ কল্পনা থেকে ধার নিয়েছে এই সুদৃশ্য শিরস্ত্রাণের ধারণা। হাতে কফির কাপটা না থাকলে, আর এক চোখে পটি থাকলে, পুরোই অডিন লাগত ভাইকিং চাঢ়ুকে, কিন্তু কে বলবে তাকে সেই কথা! কার ঘাড়ে কটা মাথা!





কামারের দোকানগুলো আলাদাভাবে
নজর কাড়ল, বিশাল এক ধাতব পাঁচা ঘোষণা
করছে তাদের অস্তিত্ব। পাঁচাটির দাম জিজেস



করে ভেবড়ে শিয়ে স্লেফ চারপাশ উপভোগ
করার সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত মনে হলো। কী করে
নানান ছুরি, বগামের ফলা, বর্ম, মূখোশ, ঢাল
সেই আমলে তৈরি করা হত, তা দেখানো হচ্ছে
হাতে কলমে।

দারুণ এক হাতের বর্ম দেখে মনে হলো,
লড় অত দ্য রিংসের সেই ডার্ক লর্ডের কাটাপড়া
হাত!



মেলা দেখতে আগত শিখদের দেখে
সবচেয়ে ভাল লাগল, দু' চোখ ভর্তি নির্খাদ
বিশ্বয় নিয়ে গিলছে মধ্যযুগীয় বিশ্ব।

নাইটের ঘোড়া, কুমারের চাকা,



তীরন্দাজের মাথার পালক সব কিছুতেই সমান
আঘাত শিতমনের। তাদের অনেকেই আবার
প্রাচীন বেশভূষা জড়িয়ে হয়ে গেছে মেলারই
অংশ।

দুই নাইটের সাথে কথা হলো। একজন
এসেছে বেলজিয়াম থেকে, অন্যজন ফরাসী।
বললাম, ইতিহাসবিদরা বলেন নাইটরা ছিল
স্বেক ভাড়াটে সৈন্য, তাদের কোনও ন্যায়-
অন্যায় বোধ বা নীতি ছিল না। যে পয়সা দিত
তার পক্ষেই যুদ্ধ করত, কিন্তু সাহিত্য আর
চলচ্চিত্রে তারা হয়ে গেছে দুষ্টের দমনকারী,
নারীনির্বাতন বিরোধী, সমাজের ফুলের মত
চরিত্রের প্রতিভূত, এই ব্যাপারটা তোমরা কীভাবে
দেখ?’

ঘাড় নেড়ে স্বেক শ্রাগ করে বলল, ‘জানি

না, এইটাই আমার জীবিকা, এই করেই তো
চলছে, আমি তো অন্যায় করে কারও মাথায়
বাড়ি দিয়ে টাকা কামাচ্ছি না!’

আকাশে কালো মেঘের দঙ্গল ভিড় করে
এসেছে পড়ান্ত বিকেলে, বৃক্ষদেবতা একবার
তার আশ্রয়ে এই জবড়জং পোশাকধারীদের
নিলে কী যে অকথ্য দুরবস্থা হবে, তাই ভাবতে
ভাবতেই সবাই চললাম নিরাপদ আশ্রয়ে।

অনেক অনেক দিন মনে থাকবে
মধ্যযুগের মেলাটির কথা, শৈশবে রবিনহৃত,
আইভানহো, কালো তীর ইত্যাদি প্রিয় বই
পড়ার সময় যে পরিবেশে হারিয়ে যেতে মন
চাইত, তেমন কিছুতেই আবিষ্ট ছিলাম কয়েক
মুহূর্তের জন্য হলেও, এক ঝলমলে স্পন্দালোকে,
আমারই মনের গহনে যার বসবাস। ■

আলহাজ্র মোঃ ইসহাক চট্টগ্রাম

এখানে মাসিক রহস্যপত্রিকা বিক্রি করা হয়
মোবাইল: ০১৮২৩২২৭২৫৬, ০১৭১৯২২৮৮১০
ফোন: ২৫৫৪৭৭

???

মাসুমা

বাংলাদেশ

বনে

এটা

সম্ভব!

অন্য

কেনও

মুসলিম

কান্তি

হলে

এতক্ষণ কী

হত,

কে

জানে!

এক

চো

খটা আপনা হতেই নিউ হয়ে গেল লতিফা বেগমের। পারলেন না মেয়ের চোখে চোখ
রেখে মিথ্যে বলতে, এমনকী পারলেন না সতিটাও মৃথ ফুটে বলতে। মায়ের চোখে
নীরবে ঝরে পড়া জল দেখে যা বোঝার বুরো নিয়েছে মেয়ে।

মেয়েকে বুকে চেপে ধরে মনে মনে বললেন লতিফা, 'মা রে, তুই তো ভাবছিস তোর
সন্তানের কথা; কিন্তু শার্থপরের মত হলেও আমাকেও যে ভাবতে হবে আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ।
এ ছাড়া আমার যে কোনও উপায় ছিল না।'

লতিফা বেগম জানেন তাঁর মেয়ের কষ্টটা। এ-ও বুঝতে পারলেন তাঁকে ভুল বুঝেছে মেয়ে।
তা বুঝুক।

আজ আবেগের জোয়ারে ভেসে গেছে ওর বাস্তববোধ, কিন্তু যেদিন কুঢ় বাস্তবতার
আঘাতে ওর আবেগ ভেঙে পড়বে— সেদিন? সেদিন ও বুঝতে পারবে, ওর মা কোনও ভুল
করেনি।

মেয়ে নীরার বয়স সবে পঁচিশ। চট করে ভাল পাত্র পাওয়ায় বেশ আশে-ভাগেই বিয়েটা
দিয়েছিলেন। সুবে ছিল আদরের ধন।

এই তো গত সন্তানে মেয়ের মুখে জানলেন নানী হতে চলেছেন তিনি।

কী খুশিটাই না হয়েছিলেন!

কে জানত, তাঁর সেই খুশিটা হবে তোরের শিলিরের মত। প্রেন ক্র্যাশে জামাইয়ের মৃত্যু-



সংবাদ সে খুশিকে শুষে নিল মুহূর্তেই।

শামীর মৃত্যুর সংবাদ শনে মৰ্ণা গিয়েছিল নীরা। সবাই হাসপাতালে ধৰাধৰি করে নিয়ে গেল। তখন পাথাগে বুক বেঁধে ডাঙাকরে দিয়ে কঠিন কাজটি করিয়ে নেন তিনি এক প্রকার গোপনৈ।

বুকের পাজর যেন একে একে খুলে নিয়েছেন নিজ হাতেই। তার মনের কথা বোধযোগ্য অঙ্গৰ্যামী ছাড়া কেউই বুঝবে না।

এই বয়সে বিবিধা, এখন বাচ্চাটা পৃথিবীর মুখ দেখলে তাঁর নিজ সন্তানের ভবিষ্যতের পথ রক্ষ করে দেবে চিরতরে।

বাচ্চাসহ মেয়েকে তিনি ভাল কোথাও পাত্রস্ত করতে পারবেন না।

কী হবে তখন?

সুখ-দুঃখগুলো ছোট ছোট, কিন্তু জীবন যে অনেক বড়!

কী করে একাকী পাড়ি দেবে নীরা এতটা পথ?

মা হয়ে এ কষ্ট যে তিনি প্রাণ থাকতে সহজ করতে পারবেন না!

তিনি জানেন, আঘাত পেয়েছে নীরা।

আঘাত পেয়েছে ওর শুশ্রবাঢ়ির সবাই।

জীবন-সাগর তীরে বালির বুকে লেগে যাওয়া বেদনার আঁচড় সে তো মিলিয়ে যাবে সময়ের হ্রাতে।

বিনিয়োগ সুরক্ষিত হবে তাঁর সন্তানের ভবিষ্যৎ।

মা হিসাবে সন্তানের জন্য তিনি এর চেয়ে ভাল কিছুই ভাবতে পারছেন না।

তাই তিনি সবাইকে জানিয়েছিলেন, পড়ে গিয়ে চোট লেগে নষ্ট হয়ে গিয়েছে বাচ্চাটা।

সবাই বিশ্বাসও করেছে।

কিন্তু কীভাবে যেন বুকে ফেলেছে নীরা।

তাই তো ভুল বুঝল ওর মাকে।

কিন্তু আসলেই কী তিনি ভুল করেছেন?

‘যা করছ বুঝে শনে করছ তো, লাইলীর মা?...নাকি মেয়ে বিয়ে দেবার খুশিতে পেটের কথাও ভুলে গেছ? ছেলেরা তোমাদের খোজ রাখে না। জমিজমা যা ছিল নদীতে... পেটে

দুটো ভাত জটিল এই মেয়ের রোজগারে।
...তাকে যে বিয়ে দিতে চাইছ, তোমাদের নিজেদের কী হবে?’

‘কী আর অইবো, খালাম্বা। আল্লায় একরহম চালাইয়া নিব। তা ছাড়া আমরা বুড়ো-বুড়ির চিঞ্চা কী, খাইয়া না খাইয়া দিন পর হইয়া যাইবো। তাই বইল্যা নিজে গো প্যাডের চিঞ্চায় মাইয়ার ভবিষ্যৎ দেহম না?’

‘তোমার মেয়ের ভবিষ্যৎ দেখবে না তা তো বলিনি, লাইলীর মা। শামী মরেছে, দুটো বাচ্চা তো আছে। মাসে মাসে ভাল বেতন পাচ্ছে... বাচ্চাগুলোকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পারলে তারাই তো তোমার মেয়ের ভবিষ্যৎ হবে... বল তো বেতন একটু বাড়িয়ে দিতে পারি।’

‘না, খালাম্বা, বেতনের লাইগা না। বাজা একখান পোলা পাইছি... হ্যার বউ ছাইড়া গ্যাছে... আমার মাইয়াডারে হ্যায় পোলাপাইনসহই নিতে চায়... ট্যাহা পয়সা তেমন নাই... তয় পোলাখান ভারি ভালা... মাইয়া আমার সুহেই থাকব বইলা মনে কয়।’

‘কেন তোমার মেয়েকে কি আমরা কষ্টে রেখেছি?’

‘না, খালাম্বা, তা কই নাই। তবু... তবু...’

এই ‘তবু’ ‘তবু’ কথার মানে বুঝতে বেগে পেতে হয় না লতিফা বেগমের।

এরা হাজিসার হয়ে ঢাকা শহরে এসেছিল পেটের দায়ে। দুটো ভাল মন্দ খেয়ে শরীরের চেকনাই বেড়েছে কি না! পেটের খাই মিটতেই চাপিয়ে উঠেছে শরীরের খাই। পুরুষ না জোটালে ঢলবে কেন?

যতসব ছেটলোকী কারবার!

জামাইয়ের মৃত্যুর দুঃঘর পার হয়েছে। নীরাও অনেকটা খাভাবিক। ভাল পাবের সঙ্গানে রাতে চোবের পাতা এক করতে পারছেন না। এর মাবে এই ঝামেলা।

রাগে ফুঁসতে থাকেন লতিফা বেগম।

সেটা কি নতুন কাজের লোক খোঁজার ঝামেলায়, নাকি টাকা-পয়সা দিয়ে গরিবের মৌলিক চাগওয়া আজও কিনতে না পাবার ব্যর্থতায়?

দুই

বাপরে, কী গরমটাই না পড়েছে এবার। শ্রাবণ
মাস অথচ আকাশে যেদের দেখা নেই একটুও।
তার উপর জুলাই মাসে পড়েছে রোজা। সবার
যেন জান বের হবার দশা।

যোহরের নামাজ আদায় করে এসির
তাপমাত্রা ২০ ডিপ্রিতে নামাল কুবাইয়া।
কলিংবেল টিপে বাবুর্চিকে ডেকে ইফতারির
মেনুটা ভালভাবে বুঝিয়ে দিল।

সিঙ্গারা, আলুর চপ, ছেলাভাজা, দই
বড়া, পেয়াজু, বেগুনী, হালিম, একটু পায়েশ
আর ভূনা খিচড়ি।

সাহেব বাসায় আসবার পথে দই নিয়ে
আসবে... একটু লাঞ্ছিও চাই।

সারাদিন রোজা শেষে থেতে ভাল লাগবে
সবার।

বাবুর্চি বিদ্যায় হবার পরে কোরআন
তেলোওয়াতে মন দিল কুবাইয়া, কিন্তু দু'পাতা
পড়তেই চেবের সামনে বাপসা হতে শুরু
করল অক্ষরগুলো। কোরআন শরীফটা তুলে
রেখে গায়ে পাতলা কাঁথা টেনে গভীর ঘুমে
তলিয়ে গেল ও।

'ওমা কখন এলে?' ঘরে স্বামী আবীরকে দেখে
জন্মতে চাইল কুবাইয়া।

'এই তো ঘট্টাখানেক হবে।'

'ডাকলে না কেন?'

'না, দেখলাম ঘুমুচ্ছ... শরীর কেমন',
বলতে বলতে শ্রীর কপালে হাত হোয়াল
আবীর। 'জুর-টৰ হয়নি তো?'

'না-না, জুর নয়। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে
পড়েছিলাম।'

'এমন হবারই কথা, পনেরো ঘন্টার
রোজা... তা উঠে যখন পড়েছে আসবের
নামাজটা পড়ে নাও। ইফতারের বেশি দেরি
নেই।'

ওজু করে হাত যোছার জন্য ব্যালকনিতে
তোয়ালে আনতে গিয়ে রাস্তার অপরপাশের
ছেট ক্যাস্টিয়ার চোখ গেল কুবাইয়ার।
ভাবল, বাংলাদেশ বলে এটা সত্ত্ব! অন্য
কেনও মুসলিম কান্তি হলে এতক্ষণ কী হত,
কে জানে! কী যানুষরে বাবা! পরকালের
একটুও তয় নেই রিক্সাওয়ালাদের? দোকান

থেকে সিঙ্গারা নিয়ে কীভাবে গিলছে! মরে
গেলে দোয়াখের আগুনে পুড়লে বুবাবে যে যাত্রী
টামবার কষ্টটুকু কতটা কম ছিল ওই ভয়কর
শাস্তির তুলনায়!

তিনি

কুলিগুলোর যত্নপায় বাজারে আসতে ইচ্ছে করে
না। হারামজাদাগুলো কঁঠালের আঠার মত
পেছনে লাগে। 'আসুম, স্যুর, লাগবো, সার,
আমারে নিবেন, স্যুর!'

তাও দু-একজন নয়, পাঁচ-ছয়জন মিলে
যখন ঘ্যান-ঘ্যানানি শুরু করে, মেজাজটাই চড়ে
যায় রমিজ সাহেবের। আরে ব্যাটা, আমার
লাগলে আমিই তো তোদের ডাকব। অত
ডাকাডাকির কী আছে?

আবার তাদের ভেতর থেকে বেছে
একজনকে নিলেও বাকি!

মুখে বলবে, 'যা খুশি দিবেন, স্যুর, তাই
নিম্ন।'

আর নেবার বেলায়, 'এই দিলেন, স্যুর,
আরও কিছু দ্যান।'

তাই এসব বাকি সামলাতে এখন থেকে
বাজারে আসবার সময় দোকানের ছেলেটাকে
সঙ্গে নিয়ে আসেন রমিজ সাহেব।

কুলি ব'রচটা বাঁচে, বাঁচেন ঝামেলা
থেকেও। তা ছাড়া ছেলেটাকে একটু গায়ে
গতরে খাটিয়ে নিতে পারলে একটু ব্রহ্মিও
পান। মনে হয় ওকে দেয়া বেতনের টাকাটা
উসুল হলো।

সারাদিন ওর তেমন খাটিনি দেয়ার কাজই
নেই।

শুধু দোকানের সামনে টুল পেতে বসে,
'আসেন ম্যাডায়, আসেন স্যুর, এইখানে
দ্যাখেন! কী লাগবে, ম্যাডায়।'

শুধুমাত্র এই কাজের জন্য মাসে অতগুলো
টাক দিয়ে রাখা।

অবশ্য না রেখে উপায়ও নেই।'

শপিংয়ে আসা ফুটো পয়সার
ক্রেতাগুলোর যা দেমাগ!

একটু আধটু ডাকাডাকি না করলে
দোকানে ঢুকতে চায় না।

ক্রেতা যে!

চার

'সাব, একটা ব্যাপার অবাক লাগছে।'

ইলার কথা শুনে কর্তৃপক্ষরাজ্য চোখে
পশুবোধক চিহ্ন তুলে তার দিকে তাকিয়ে
রাইলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ওবায়েদ
হক।

'প্রায় একই শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে এ
স্কুলে জয়েন করেছে সবাই। ...কিন্তু নারীদের
ওপরে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নিচু ক্লাসের আর
পুরুষ শিক্ষকদের ওপরে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে
উচু ক্লাসের।'

নারীবাদী ও প্রতিবাদী দুর্নামের প্রকাশ
ঘটিয়ে জানতে চাইল ইলা।

অবাক হয়েছেন প্রধান শিক্ষক, বললেন,
'আপনি দেখি কোনও স্কুলের খৌজ-খবরই
রাখেন না। সব স্কুলের এটাই নিয়ম।'

'কিন্তু কেন, সব? এমন তো নয় যে নারী
শিক্ষিকারা কম পড়াশোনা করে এসেছে, আর
তাই উচু ক্লাসে পড়াতে পারবে না।'

এসব আলোচনার ফাঁকে প্রধান শিক্ষকের
রুমে প্রবেশ করলেন এই স্কুলেরই অন্য শিক্ষক
জামান।

তার সঙ্গেও একবার ইলা এ ব্যাপারটা
আলোচনা করেছিল, সেদিন কোনও মন্তব্য না
করলেও আজ বললেন, 'ম্যাডাম ইলা, ক্লাস
করিয়েও আপনি বুঝতে পারছেন না ছেট
বাচাণুলো কত দুষ্টুমি করে, পুরুষদের জন্য
তাদের সামলে রাখা দায়, মেয়েদের ওগুলো
অভ্যাস আছে। এই আরকী...'

নারীদের বাড়তি এই যোগ্যতার জন্য
তাঁকে সম্মান জানান হলো, না অপমান করা
হলো, সেদিন জামান সাহেবের কথায় স্পষ্ট না
হলেও স্পষ্ট হলো অন্যদিনের কথায়।

জামান সাহেব ক্লাস টেনের এক ছেলেকে
অংক না পারায় কান ধরে করিউরে দাঁড় করিয়ে
রাখায় অভিভাবকের তোপের মুখে পড়লেন।
কিছু শিক্ষক পক্ষ নিলেন অভিভাবকদের।
তাদের মাঝে বেশিরভাগ ছিলেন নারী
শিক্ষিকা। অত বড় ছেলের আত্মসম্মানে
আঘাত করাটা তাঁদের পছন্দ হয়নি।

এ কথায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন জামান
সাহেব। 'আপনারা মেয়েরা বুঝবেন কী? নেন

তো বাচ্চাদের ক্লাস! সারাদিন আ, আ, ক
পড়িয়ে থালাস। নিয়ে দেখতেন উপরের ক্লাস।
একটা জটিল অংক তিনবার বোঝানোর পরেও
ছাত্র না পারলে মেজাজ কতক্ষণ ঠিক থাকে?'
ইত্যাদি... ইত্যাদি।

বুকে যেন চাবুকের বাড়ি পড়ল ইলার।

ঘরে-বাইরে একই দৃশ্য।

তার মনে পড়ল মা-বাবার কথা।

একই ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে
বেরিয়েছিলেন মা-বাবা দু'জনেই। চাকরিও
করতেন সময়ানের। কিন্তু ঘরদোর, বাচ্চা
সামলানোর জন্য বাবার অনুরোধে চাকরি
ছেড়েছেন মা-ই।

মা তো কখনোই বলেননি উনি চাকরি
করতে পারবেন না, কিন্তু বাবা ধরে নিয়েছেন
ঘরদোর সামলানো পুরুষের কাজ নয়। আর
তাই তিনি সারাজীবন সংসারের কঠা-ব্যক্তিটির
পদমর্যাদা আঁকড়ে ধরে অন্য সব পুরুষের মতই
ব্রলি আউড়েছেন, 'আমার রোজগারে সবাই
চলে।'

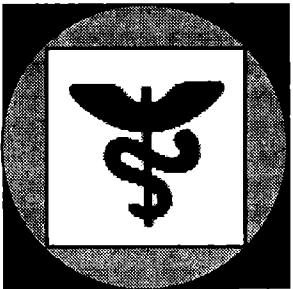
মা-ও মেনে নিয়েছিলেন সব নারীর
মতই। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গ খাঁটিনির পরে
রাতে গরম দুধের বাটি তুলে দিয়েছেন কর্তার
হাতে। নির্বিশেষ কেটে গেছে জীবন।

মায়ের উদারতাকে ধরে নেয়া হয়েছে
নারীর সহজাত দুর্বলতা হিসেবে, আর বাবা
সেটাকে ধরে নিয়েছেন পুরুষের প্রাপ্য বাড়তি
সম্মান ও খাতির। একবারও ভেবে দেখেননি
বাবা এসবের মাঝে লুকিয়ে ছিল তাঁর কতটা
জ্ঞা ও অমানবিকত।

পুরুষ যে কাজ পারে না, সে-কাজ
'পুরুষের মানায় না' এই অহংকারে প্রথমেই
ঢেকে নেয় তার দুর্বলতাকে। বেছে নেয় তার
জন্য সহজতর দায়িত্ব, তারপর করে ক্ষমতার
আক্ষলন।

ভুলে যায় ওই কাজটি নারীও করে
দেখাতে পারে। নারী তার ময়তা ভরা বুকে
যেসব কাজ করেও অবমূল্যায়িত হচ্ছে দিনের
পর দিন— পুরুষ কি পারে সেসব করে
দেখাতে?

প্রতিনিয়ত পুরুষ অক্ষমতা ঢাকছে
পৌরুষত্বের দাস্তিকাতায়— এই তো! ■



কোমর ব্যথা

কোমর ব্যথা খুব সাধারণ একটি স্বাস্থ্য সমস্যা।

আপনার স্বাস্থ্য

ডা. মিজানুর রহমান কল্পেন
E-mail:parijat2006@yahoo.com

কোমর ব্যথা ঘটে সেইসব
লোকের, যারা পারিবারিক দায়িত্ব
পালনের বোৰা কাঁধে তুলে
নেন-ফলে ভোগেন মানসিক
চাপে।

কোমর ব্যথার কারণ

কোমর ব্যথার সবচেয়ে বড় কারণ হলো মাংসপেশি কিংবা টেনডনে মচকানি। হঠাৎ ভারী জিনিস তুললে এটা হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কোমর ব্যথার প্রধান কারণ স্রেফ তুলভাবে অবস্থান করা, অর্থাৎ আপনি যদি বসা, ইটা কিংবা দাঁড়ানোর সময় সঠিকভাবে অবস্থান না করেন, তা হলে কোমরে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। এটি কোমর ব্যথার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। দৈনিক রিকশায় ঘোরা, বাসে বা লোকাল ট্রেইনে চড়া কিংবা হঠাৎ স্বরে যাওয়া কিংবা বাঁকা হওয়া আপনার কোমর ব্যথার কারণ হতে পারে। এমনকী ইচ্ছি, কাশি বা ভুল অবস্থানে ঘুমানোর জন্য আপনার কোমরের পেশিগুলো সংকুচিত হয়ে মারাত্মক ব্যথা ঘটাতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে কোমর ব্যথার প্রাথমিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে হাইহিলের জুতো বা স্যাওল পরা, অস্টিওপরোসিস বা হাড়ের ভঙ্গরতা রোগ এবং গর্ভাবস্থা। গর্ভবতী নারীদের মত যেসব পুরুষ পেটকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে লাট সাহেবের মত ইঁটেন, তাঁরাও কোমর ব্যথায় আক্রান্ত হন। পেছনের দিকে এভাবে অতিরিক্ত বাঁকানোটা যেরুদণ্ডের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

কোমর ব্যাথার ঘিতীয় সর্বোচ্চ কারণ হলো পি.এল.আই.ডি বা প্রোল্যান্ড লাম্বর ইন্টারভার্ট্রাল ডিস্ক। এক্ষেত্রে কোমরের মেরুদণ্ডের দুই হাড়ের মাঝখানে ডিস্ক নামে যে তরঙ্গস্থি থাকে সেটি পেছনে বা পাশের দিকে বেরিয়ে এসে স্পাইনাল কর্ড বা মেরুমজ্জ্বাল বা এর খেকে বেরিয়ে এসে নার্ভের গোড়ায় চাপ দিয়ে ব্যথা ও আবাবিক দুর্বলতা ঘটায়।

পেশাগত কারণে যাঁদেরকে কোমর বাঁকা করে কাজ করতে হয়, তাঁদের কোমর ব্যথা হয়, যেমন-বাড়িদার, আবর্জনা সংগ্রহকারী, কুলি ইত্যাদি। যাঁরা কম্পমান মেশিনের সাথে দীর্ঘদিন কাজ করেন, তাঁদেরও কোমর ব্যথা বেশি হতে পারে।

মেদবহুল লোকদের কোমর ব্যথা বেশি হয়। অতিরিক্ত ওজন কোমরে চাপ সৃষ্টি করে।

শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে কোমর ব্যথা হয় মাংসপেশির টার্নটান অবস্থার কারণে। এক্ষেত্রে কাজ-কর্ম, খেলাধূলা, আবাত ইত্যাদি কারণে মাংসপেশিতে টান পড়ে।

কোমর ব্যথার আরও উল্লেখযোগ্য কারণের মধ্যে রয়েছে: মেরুদণ্ডের হাড়ের ক্ষয়, মেরুদণ্ডের বাত, অস্টিওপ্রোসিস, অস্টিওম্যালাসিয়া, ইনফেকশন যেমন-ফটিওমাইলাইটিস, টিউবারকুলোসিস, ব্রহ্মসোলিসিস ইত্যাদি। জনুগত কারণ, যেমন-ক্লিওপিস, স্পনডাইলোলিসথেসিস, স্পাইনা বাইফিডা, স্পনডাইলোলাইসিস ইত্যাদি। টিউমার, ক্যাস্টার, ক্ষয়জনিত সমস্যা, যেমন-অস্টিওআর্থাইটিস, লাম্বার স্পনডাইলোসিস ইত্যাদি এবং মেরুদণ্ড ছাড়া অন্যান্য কারণ, যেমন-বিভিন্ন ধরনের স্ত্রী-রোগ, জননাস ও মৃত্যুত্ত্ব সংক্রান্ত রোগ এবং

পাক-আক্রিক অবস্থা ইত্যাদি।

কোমর ব্যথার উপসর্গ

একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোমর ব্যথা কোনও নির্দিষ্ট রোগ নয়, এটি রোগের উপসর্গ মাত্র। কারণ ভেদে উপসর্গের তারতম্য হতে পারে।

প্রথমদিকে এ ব্যথা কর থাকে এবং ধীরে-ধীরে বাঢ়তে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিত হয়ে তাঁর থাকলে ব্যথা কিছুটা কম হয়। কোমরে সামান্য নড়াচড়া হলেই ব্যথা বেড়ে যায়।

ব্যথা অনেক সময় পায়ের দিকে নামে, পা ভার হয়ে আসে, অবশ তাব বা বিনাখিন অনুভূতিও হতে পারে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হয়।

কোমরের মাংসপেশি কামড়ানো ও শক্তভাব হয়ে যাওয়ার মত উপসর্গও দেখা দিতে পারে। দৈনন্দিন কাজ যেমন পানি তোলা, হাঁটাইটি করা ইত্যাদিতে কোমরের ব্যথা বেড়ে যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা

রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগীর ইতিহাস, রোগের উপসর্গ, কোমরের সাধারণ এক্স-রে ও সাধারণ রুটিন রক্ত পরীক্ষাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যথেষ্ট। তবে পাচ শতাংশ ক্ষেত্রে এক বা একাধিক পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে রয়েছে মাইলোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান ও এম আর আই।

চিকিৎসা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে কোমর ব্যথা তাল হয়ে যায়। কিছু ক্ষেত্রে

চেত্যামে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের মে কোনও বইস্কেলে জন্য আধুনিক লাইব্রেরীতে আসন্ন-
আধুনিক লাইব্রেরী এণ্ড গিফ্ট হাউস

১৯/বি, জামাল খান রোড, চেত্যাম। খাতুগৌর ক্লুলের উভয় পাশে।

দৈনিক কর্মসূলী সংলগ্ন, আইডিয়াল ক্লুলের সামানে। মহসিন কলেজের দক্ষিণ গেইটের দক্ষিণ পাশে।

এখানে সেবা প্রকাশনীর আউট অব প্রিণ্ট বই পাওয়া যায়।

মোব: ০১১-৯৫-১১১১৪০, ০১৮২২-৮৩৭৪৩০, ০১৭৪৪-০২১২৯৬

ব্যথানাশক ওষুধ দিয়ে রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে আবশ্যিক ব্যথা চলে যায় এবং পরে ব্যায়াম বা ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন। ব্যথা থাকা অবস্থায় ব্যথানাশক ওষুধের সাথে মাংসপেশি শিল্পিকরণ ওষুধ দেয়া যেতে পারে। অনেক সময় ট্রাকশনের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া ব্রেট ও করসেট ব্যবহার করা যেতে পারে।

কোমরের ব্যথা ব্যায়াম দেয়া হয়। এসব ব্যায়াম রোগীর অবস্থা অনুযায়ী ধাপে-ধাপে দেয়া হয়।

রোগীর ব্যথা না কমলে বা অবস্থার অবনতি হতে থাকলে বা প্যারালাইসিসের প্রবণতা দেখা দিলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন হয়।

কোমর ব্যথা প্রতিরোধ করতে সঠিক অবস্থানে ইটা, চলা, দোড়ানো ও বসার অভ্যাস অনুশীলন করলে, কোমরের ব্যায়াম করলে এবং কিছু পরামর্শ মেনে চললে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পরামর্শ

কোমর ব্যথা রোগীর জন্য পরামর্শগুলো হলো—

- ব্যথা নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ বিশ্রামে থাকবেন।
- শক্ত ও সমান বিছানায় ঘুমাবেন (এক্ষেত্রে প্রাইড বা হার্ডবোর্ডের ওপর পাতলা তোশক বিছানে যেতে পারে)। সর্বদা মেরুদণ্ড সোজা রেখে টানটান হয়ে ঘুমাবেন। কাত হয়ে ঘুমালে ইটু ও শরীর সামান্য ভাজ করতে পারেন। অতিরিক্ত নরম কিংবা অতিরিক্ত শক্ত বিছানা পরিহার করলেন। কখনও উপুড় হয়ে ঘুমাবেন না।

- কখনও ফোমের বিছানায় ঘুমাবেন না এবং ফোমের সোফায় দীর্ঘসময় বসবেন না। নিচু আসনে বসা যাবে না।

- বিছানা থেকে ওঠার সময় একদিকে কাত হয়ে উঠবেন।

- ভারী কোনও জিনিস তুলবেন না বা বহন করবেন না।

- ঝুঁকে বা মেরুদণ্ড বাঁকা করে কোনও কাজ

করবেন না।

- কোনও জিনিস তোলার সময় সোজা হয়ে ইটু ভাঁজ করে বসে তারপর তুলবেন।

- ইটোর সময় মাথা উচু করে, বুক সোজা রেখে এবং পায়ের আঙুল সামনের দিকে রেখে ইটুবেন। এ সময় আরামদায়ক জুতা বা স্যান্ডেল পরবেন। হাইহিল জুতা বা স্যান্ডেল ব্যবহার পরিহার করবেন।

- চেয়ারে বসার সময় ঘাড় ও পিঠ সোজা রেখে বসবেন। পিঠ চেয়ারের সাথে লাগিয়ে সোজা হয়ে বসবেন। ইটু কোমরের চেয়ে সামান্য উচুতে রাখবেন। সামনে ঝুকে বসবেন না এবং যথাসম্ভব টেবিলের কাছাকাছি থাকবেন। দীর্ঘ সময় বসে থাকবেন না, মাঝে মাঝে সামান্য ইটুবেন। পিড়িতে বসে কোনও কাজ করবেন না।

- একই স্থানে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকবেন না। দাঁড়ানোর সময় এক পা সামনে ভাঁজ করে ও সামান্য উচুতে রেখে দাঁড়াবেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলে মাঝে মাঝে অবস্থান পরিবর্তন করবেন।

- বেশি ঝাঁকুনি লাগে এরকম ভ্রমণ করবেন না। যে কোনও ভ্রমণের সময় বিশেষ ধরনের বেল্ট ব্যবহার করুন। যানবাহনে ঢাকাৰ সময় সামনের আসনে বসবেন, কৰনও দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

- টিউবওয়েল চেপে পানি তুলবেন না। কোমরে আঘাত লাগতে পারে এমন কাজ থেকে বিরত থাকবেন।

- গোসল করার সময় ঝরনায় অথবা সোজা হয়ে বসে তোলা পানি দিয়ে গোসল করবেন।

- সিডি দিয়ে ওঠা-নামার সময় মেরুদণ্ড সোজা রেখে ধীরে-ধীরে উঠবেন ও নামবেন।

- শরীরের ওজন কমাতে হবে।

লেখক: আবাসিক সার্জন, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

চেতাব: পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিঃ, ২ ইংলিশ রোড, ঢাকা। ল্যাব সাইস ডায়াগনস্টিক লিঃ, ১৫৩/১ ফিন রোড (পাহুপথের কাছে), ঢাকা। মোবাইল: ০১৫৫২৩৪৫৭৫৪

চিঠিপত্রের জবাব



সমস্যা: আমার বয়স ২২ বছর। প্রায় তিনি বছর
ধরে আমি ভুক্তের সংক্রমণে ভুগছি। চিকিৎসক
দেখিয়েছি। তিনি বলেছেন, এটা অঁচিল। আমি
তাঁর চেহারে কটারাইজেশন করিয়েছি। প্রথমে
ইনজেকশন দিয়ে, পরে অঁচিলটা পুড়িয়ে ফেলা
হয়। যদূর মনে পড়ে, এটার নাম তিনি
ইলেক্ট্রোলাইসিস বলেছিলেন। এ ধরনের
চিকিৎসার আগে আমার মাঝে একটি অঁচিল
ছিল, কিন্তু ইলেক্ট্রোলাইসিসের পরে অঁচিলের
পরিমাণ বাড়তে থাকে। এ পর্যন্ত আমার
হয়বার ইলেক্ট্রোলাইসিস করা হয়েছে। আমি
একটি লোশনও ব্যবহার করছি। কিন্তু সমস্যা
থেকেই যাচ্ছে। বর্তমানে আমার চোয়ালের
ডানদিকে চারটা ও বামদিকে তিনটা এবং
মাথায় একটা অঁচিল রয়েছে। আমি একটি
হোটেলে ঢাকির করি। প্রত্যেকদিন আমাকে
শেভ করতে হয়। কিন্তু অঁচিলের জন্য খুব
সমস্যা হয়। কটারাইজেশনে আমার মুখে দাগ
থেকে যায়। দয়া করে আমার পরিদ্রাশের উপায়
বলবেন কি?



শিহুব

কর্মবাজার।

সমাধান: দাড়ির জায়গায় অঁচিলের চিকিৎসার
জন্য কটারাইজেশন হচ্ছে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। বছ
কারণে বছবার আপনাকে এই পদ্ধতির মধ্য
দিয়ে যেতে হতে পারে। কিন্তু অঁচিল চিকিৎসায়
ভাল হয় না। চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রতিরোধ ক্ষমতা
সম্পন্ন হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অঁচিলগুলো
যত্নত্ব হয়। কখনও কখনও দাড়ির ভেতরেও
হয়। শেভ করার সময় ছেটাখাট আঘাত লাগে।
কটারাইজেশনে নতুন কোনও অঁচিলের সৃষ্টি
হয় না, বরং কটারাইজেশন অঁচিলকে ধ্বংস
করে। নতুন যে অঁচিলগুলো আপনি দেখছেন,
সেগুলো কটারাইজেশনের ফলে তৈরি হয়নি,
সেগুলো আগে থেকেই পড়ে উঠছিল যা
আপনার নজর এড়িয়ে গেছে।

১২/১০/১৪ তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে

হাঙ্গামা গোলাম মাওলা নঙ্গী/ মুস্তাসির রহমান অর্ণব

গৃহযুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরে এল কার্ল শেকেড।
দেখল ততদিনে পরপারে চলে গেছে মা-
বাবা। ভিটে ও জমি-জমা দখল হয়ে গেছে।
ফিরে পেতে হলে নিচিত সংঘর্ষে জড়াতে
হবে নিকটাঞ্চায়ের সঙ্গে। মন চাইল না
কার্লের। বাস, এখানে আর থাকা কেন? চলো
পাঠিয়ে। ওয়াইওয়িং এসে গড়ে তুলল একটা
র্যাঙ্ক। চোখে সোনালি ভবিষ্যতের ঝপ্প।
হঠাতে ঘোড়া ছুটিয়ে দলবল নিয়ে হাজির হলো
জস ফিলবি। কার্লকে বলল র্যাঙ্ক তুলে
নিতে, কারণ জায়গাটা নাকি তার।

কেন এ কথা মানবে কার্ল? মগের মূল্যক
পেয়েছে? বাধল সংস্কার। ফিলবির ষণ্ঠিরা
পুড়িয়ে দিল কার্লের কেবিন। অঞ্জের জন্মে
ঢাণে বেঁচে গেল ও। যার সহায়তায় সুস্থ
হলো, সুযোগ পেয়ে সেই রহস্যময়ী তেবি
সীমস র্যাঙ্কের অর্ধেক মালিকানা দাবি করে
বসল। উপায়ান্তর না-দেবে রাজি হলো কার্ল,
তবে মনে মনে কঠোর শপথ নিল: দেখে
ছাড়বে মেয়েটাকে! কিন্তু সবার আগে জস
ফিলবির থাবা থেকে রক্ষা পেতে হবে; এবং
একইসঙ্গে র্যাঙ্কও বাঁচাতে হবে। সফল হতে
হলে এক অসম লড়াইয়ে জিতে হবে

ওকে—একা!

দাম ■ একশ' পঁয়ত্রিশ টাকা



সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-কুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ଶବ୍ଦ-ଫଳୀଦ ୧୧

ରାବିନ୍ଦ୍ର

୧	୨	୩	୪	୫	୬		
୭				୮			୯
୧୦			୧୧			୧୨	
୧୩		୧୪			୧୫		
			୧୬		୧୭		୧୮
			୧୯		୨୦		
୨୧	୨୨				୨୩	୨୪	
୨୫				୨୬			

ସମାଧାନରେ ସୂତ୍ରାବଳୀ

ପାଶାପାଣି

- ଅନାଦିକାଳ, ଚିରକାଳ ।
- ରାଇୟତ, ପ୍ରାଚୀ ।
- ମନ ବା ମତେର ମିଳ ହୋଯା ।
- ଲମ୍ବା ଟୁକରା, ଫାଲି,
ଛେଡ଼ା ।
- ଦୁଃଖର ବିଲାପ, ଶୋକ
ପ୍ରକାଶ ।
- ଅନ୍ୟାଯୀ, ହୋତ ବା
ନୌକାର ଗତିର
ଭାବପଥକଶ ।
- ଛଡ଼ିଯେ ବା ଛିଟିଯେ
ଦେଓଯା ।
- ଅବହୁନ କରାନୋ, ଥାମାନୋ ।
- ଅନେକ, କୀ ପରିଯାପ ।
- ଉତ୍କର୍ଷ, ସମ୍ମାନ, ବରକତ ।
- ଦାନପ୍ରୟକ୍ଷ, ବିଚକ୍ଷଣ ।
- ବ୍ରତତୀର୍ତ୍ତ, ବଞ୍ଚି, ସୀର୍ବନ୍ଦ
ଶ୍ରେଣୀର ଉଡ଼ିଦି ।
- ବଡ଼ ଶହର, ବହୁ ଲୋକେର
ଆବାସ ଓ ଶିଳ୍ପ-ବାଣିଜ୍ୟେର
ହୁନ ।

- ଅବକାଶ, କର୍ମ ବା ଚାକରି
ଥେକେ ବିଦ୍ୟାୟ ।

ଉପର-ନୀଚ

- ମଙ୍କା ଥେକେ ବାରୋ ମାଇଲ
ପରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଖ୍ୟାତ ମାଠ ।
- ସିନ୍ଦ୍ର କରାର ପାତ୍ର, ପାନି
ଫୁଟିଯେ ବାଞ୍ଚି ତୈରିର
ସ୍ତର ।
- ନିହିତ, ନଷ୍ଟ, ଲୁଣ୍ଡ ।
- ଜନନୀ ।
- ୯ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରକ ।
- ଚୋଖ ବେଧେ ଅନ୍ଧ ସେଜେ
ବେଳାବିଶେଷ ।
- ଏଇ ପ୍ରକାର, ଠିକ ଏରକମ ।
- ଅନ୍ପିତ ।
- ଦୂରି, ଡାଙ୍ଗ ।
- ଗୋମତୀ, ତରଫେର
ମାଲିକ ।
- ଅଲାମୀ, ତିଲା ।
- ହାଜିର ହୋଯାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ,

ଆହୁନ, ବେତନ ।

୨୨. ସାପ, ହାତି ।

୨୪. ଖୋଲାର ଜଳ ଚତୁର୍କୋଣ
ଚିତ୍ରିତ କାଗଜଖଣ୍ଡ ।

ସମାଧାନ ପାଠୀବାର ଠିକାନା:
ଶବ୍ଦ-ଫଳୀଦ ୧୧, ରହସ୍ୟପତ୍ରିକା,
୨୪/୪ କାଙ୍ଗୀ ମୋହାରାର ହେଲେନ
ସ୍କ୍ରିପ୍, ସେନ୍ଟବାଗିଲ୍ଟା, ଢାକା
୧୦୦୦ । ସାର୍ଦରେ ସମାଧାନ ନିର୍ମଳ
ବିବେଚିତ ହେବ, ତାଦେର ତିତର
ଥେକେ ଲଟାରିର ମାଧ୍ୟମେ ତିନଙ୍ଗଜକେ
ନିର୍ବାଚନ କରେ ପୂର୍ବକାର ହିସେବେ
ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେର ଠିକାନାଯି
ଭାକ୍ୟୋଗେ ପାଠିଯେ ଦେଯା ହବେ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନ ସଂଖ୍ୟା ରହସ୍ୟପତ୍ରିକା ।
ସମାଧାନ ଆୟମେର ଦୃଷ୍ଟରେ ଏସେ
ପୌଛୁବାର ସର୍ବଶେଷ ତାରିଖ:
୯ ଅକ୍ଟୋବର, '୧୪ ।

ସମାଧାନ ଶବ୍ଦ-ଫଳୀଦ ୧୬

ମ	ନ	ହ	ନି	କ	ର	କୁ
ନା	ଗ	ରା	ବ	ହ	ମା	ନ
ନ	ର	ମ	ଗ	ର	ମ	ଜ
ସ			ରି		ତ	ସର
ଇ	ନ	କି	ଲା	ବ		ର
କ	ଶ		କ୍ର	ମା	ଗ	ତ
ମ	ଶା	ଲ	ଚି	ଗ	ର	ବ
ମ	ଲ	ଯ	କା	ନ	ମ	ଲା

ଶବ୍ଦ-ଫଳୀଦ ୧୬-ତେ

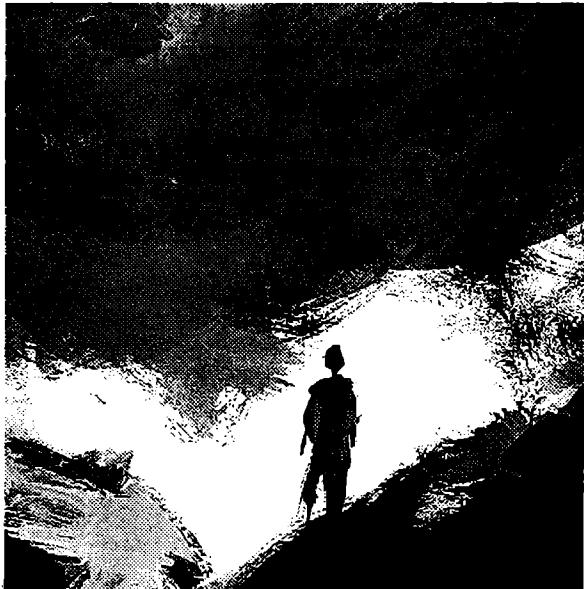
ଯାରା ପୂର୍ବକାରେର ଜଳ୍ୟ
ନିର୍ବାଚିତ ହେଯେଛେ

- ଜୋବାଯାଦା ଶୁଳ୍କାନାରା
ଆହୁଲ ଗଣ ରୋଡ, ଢାକା ।
- ଶକ୍ତିକ ହାସାନ
ଆଜିଜ ସୁପାର ମାକେଟ,
ଶାହବାଗ, ଢାକା ।
- ଶହିଦୁଲ୍ଲାହ ଆକଲ
ଚକ୍ରବର୍ଦ୍ଦାଇ ଗ୍ରାମ, ନାଟୋର ।

গঞ্জর

শাফিন মাশফিকুল আলম

‘এক জাতের
বাধন শয়তান।
এরা বহুদিন
পর পর
আসে।
কিন্তু যখন
আসে,
সমস্ত গ্রাম
শেষ করে
দিয়ে যায়।’



‘আপনি কি গঙ্করের নাম শনেছেন?’ জানালা বক করতে-করতে জিজ্ঞেস করলেন নুরুল আলম সাহেব। বাইরে গৌড়িমত ঝড় শুরু হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে দেখছি কালৈশাখীর তীব্রতা। সো-সো করে বাড়ছে বাতাসের গতিবেগ। গাছপালা সব নুয়ে-নুয়ে পড়ছে। বেতের সোফটায় বসতে-বসতে নুরুল আলম সাহেবের আরেকবার চাইলেন আমার দিকে। মোটা ফেরের চশমার ভিতর দিয়ে খুব অগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন তিনি। আমি মাথা নড়লাম। আগে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই, আমি সুনীল রায়। নুরুল আলম সাহেবের বাড়ির কয়েকটা বাড়ি পরেই থাকি। সান্ধ্যব্রহ্মণের পর এসে বসেছিলাম আজ্ঞা দিতে। সে কী গল্প রে বাবা! এত সময় চলে যাবে ভাবিনি। তা ছাড়া আজ হামজা মিয়া খিচুড়িটাও রেখেছিল বেশ। খেতে গিয়ে এ বাড়ির আচারের স্টকে টান ফেলে দিয়েছি! নুরুল আলম সাহেব একজন আলোকচিত্রী। ছবি তোলার জন্য পুরো দুনিয়া চষে বেড়ান। এটি তার পেশা নয়, মেশা। তবে নিজেকে অভিযান্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিতে ভালবাসেন।

দেশের একটি বনামধন্য পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন তিনি, এখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই পাগলামি বেছে নিয়েছেন। বিশাল এক বাড়ির নীচতলায় বহু পুরানো কাজের লোক হামজাকে নিয়ে থাকেন। বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ পোরিয়ে গেছে। বিয়ে-টিয়ে করেননি।

‘বেশ, তা হলে না হয় সেটার ঘটনাটাই শুনুন। আমার বিশ্বাস ভূতের কাহিনির চেয়ে এটা কম চমকপ্রদ নয়!’ তিনি বললেন। আমি সোফাতে জমিয়ে বসলাম।

‘এটা বেশ ক’বছর আগের কথা,’ তিনি বলতে শুরু করলেন। ‘আমি তখন সম্পাদনার সাথে যুক্ত। বাস্তরবানে বেড়াতে গিয়ে এক বস্তুর বাড়িতে উঠেছি। বহু সেখানে রিসোর্ট চালায়। বহু পুরাণে এবং ছিমছাম রিসোর্ট। সে তার পরিবার নিয়ে পাশেই থাকে। তো আমাকে পেয়ে বহু ভীষণ খুশি। ক্লুবজীবনের দেন্ত বলে কথা, খাতিরের অন্ত নেই। জয়গাটা ছিল সদর থেকে প্রায় ৮০-৯০ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে। পাশেই পাহাড়িদের আম। তো আমি সেখানে যাওয়ার তিন দিন পর থেকে গ্রামে গঙ্করের উৎপাত শুরু হয়।’

‘গঙ্করটা কী?’ আমি জানতে চাইলাম।

‘এক জাতের বাঘন শয়তান। এরা বহুদিন পর পর আসে। কিন্তু যখন আসে, সমস্ত গ্রাম শেষ করে দিয়ে যায়।’

বিকট শব্দে বাজ পড়ার শব্দ হলো। বাইরে যেন বৃষ্টির তেজ আরও বেড়েছে। হামজা মিয়া কফি নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকল। নুরুল আলম সাহেব কফিতে চুম্বক দিয়ে আবার শুরু করলেন, ‘আকারে দু’খেকে আড়াই ফিটের মতন লম্বা হয় এরা। গায়ের রঙ হলদেটে এবং হাতগুলো বেশ সুরু। দেহের তুলনায় বড় পুরুষাঙ্গ থাকে এদের। মুখটা খুবই কদাকার, দেহে মোমের মত শক্তি। অঙ্ককারে মানুষ বলে ভুল হলেও আসলে এরা মানুষ নয়। মানুষের মত কথাও বলে এরা, তবে অন্তু ফ্যাসফ্যান্সে নাকি সুরে। তো যেদিনের কথা বলছি, রাতের বেলা এক গঞ্জের বামন জানালা দিয়ে গ্রাম-প্রধানের বাড়িতে ঢুকে তার মেয়েকে বশ করার চেষ্টা করে। এদের সুন্দর মেয়েমানুষের প্রতি যৌনাকর্ষণ থাকে, বিয়ে করতে চায়। বাধা দিলে মেয়ের গায়ে খুশু ফেলে। এই খুশু যার গায়ে লাগে তার মৃত্যু হয়।’

‘বলেন কী!’ কফির কাপটা নিতে-নিতে বললাম। ধামছি।

‘গ্রাম-প্রধানের মেয়েটাও পরদিন মারা যায়,’ তিনি বললেন, ‘ঘটনাটা সে সময় পুরো গ্রামে ভীষণ সাড়া ফেলেছিল। যখন প্রথম শুনি তখন বিশ্বাস করিনি, আবার অবিশ্বাসও করিনি। কারণ জানি দুনিয়ার যত বহস্য, তার সামান্য পরিমাণই আমাদের জানা।

‘তো খুব ভোরবেলা খবরটা সারা শামে চাউর হয়ে যায়। আমার বন্ধু আকফানের... অর্থাৎ যার ওখানে উঠেছি তার কথা বলছি... একটা পুরাণে আমলের গাদা বন্দুক ছিল। জঙ্গলে এলাকায় থাকে, বন্দুক লাগেই। সেটা নিয়ে দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ি। গ্রামের কিছু শক্ত-সমর্থ জওয়ান নিয়ে আশপাশের পাহাড়ি এলাকা প্রায় পুরোটাই টুকু দিই। এমনিতেই কুসংস্কারের কারণে ওদিকটা অচল, তার মধ্যে শয়তানের ঝৌঁজে গিয়ে এক-একজন ভয়ে আধমরা। কোন কিছুই ঝৌঁজে পেলাম না। এর মাঝে কয়েকদিন কেটে যায়। প্রায় রাতেই দেখা যেত কারও ক্ষেত্রের ফসল নষ্ট হয়ে আছে তো কারও গরু আধ-খাওয়া হয়ে পড়ে আছে। রাতের বেলা আতঙ্কে কারও ঘুম হত না। কমবয়সী এক মেয়ের ধর্ষণ, পুরুষের ধর্ষণের পর গ্রামে পাহারা বসানো হয়।’

নুরুল আলম সাহেব থামলেন। বাতাসের কারণে বাসার কোন এক কোনায় বেশ শব্দ করে দরজা বাড়ি খেল। বাড়ের কারণে কুমের ভিতরেও শীতল অবস্থা মনে শিহরন জাগাচ্ছে।

‘থামলেন কেন, বলুন! আমি তাগাদা দিলাম।

নুরুল আলম সাহেব খানিকটা কেশে নিলেন। তাঁর চোখ দুটো চকচক করছে। ‘দিনগুলো কাটছিল চরম আতঙ্কে,’ বললেন তিনি, ‘গঞ্জের ব্যাপারটির তো কোন সমাধান হলোই না, যেন আচমকা ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেল। এদিকে ঢাকায় আসার সময়ও হয়ে গেছে। ফিরে আসার আগের দিন সকালে আমি ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রিসোর্টের পুর পাশটায় বেশ গভীন জঙ্গল আর ছোট ছোট পাহাড়-চিলার রাজ্য। তারও কয়েক কিলোমিটার দূরে তৎস্থানের গ্রাম। পাখি দেখার আশায়, সেই ঘন গাছপালার আড়ালে যুকে যাই। উল্লুবন পেরিয়ে পাখির কলতানের ভেতর দিয়ে চলতে থাকি। মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছিল তক্ষকের ডাক। একসময় ঢাকুয়া কড়াই আর নাগেশ্বর গাছের জঙ্গল পড়ে। কিছুদূর যাওয়ার পর বনের ভেতরই প্রাচীন এক উপাসনালয় নজরে আসে। মানুষের বিচরণ

এদিকটায় কথনও হয় না বলে শুনেছি। তাই এতে শত বছর আগে যে এটা পরিভ্রম্জ হয়েছে তা নথি মুশকিল। পুরো কাঠামোটাই শালু পাখে সবুজ হয়ে গেছে। তো উপসনালয়টির পাশ কাটাতে গিয়ে এর ভেতর থেকে আসা ১০৮ কচ শব্দে চমকে উঠ। নাকে আসছিল ভাষণ রকমের বেটকা গঙ্গ। কী আছে দেখাব জন্যে এর জানালাটার ভাঙা অংশ দিয়ে চোখ রাখতেই আজ্ঞা ঝাঁচ ছাড়া হয়ে যায়।'

'কী দেখলেন!' আমি নড়েচড়ে বসলাম।

'বৰ্দ্ধ অঙ্কুরার ঘরটায় যেরে থেকে প্রায় দশ-বারো ফিট উপরে,' নুরুল আলম সাহেবের হাত দিয়ে উচ্চতা দেখালেন, 'মাল-সামান রাখার তাকগুলোতে পনেরো থেকে বিশটা গঙ্গৰ পা বুলিয়ে বসে আছে। কোন কিছু কামড়ে ছিড়ে থেতে ব্যস্ত ওগুলো, শীচের মেঝেতে কোন ধানীর নাড়ি-ভুঁতির উচ্চিষ্ট পড়ে থাকতে দেখলাম। এরই উপর আরও কয়েকটা নেচে-কুন্দে আমোদ-ফুর্তি করছে। নাচটা অনেকটা স্যাটানিক রিচ্যুল সম্পাদনার মত। সাকাহ। সেই প্যাটার্নে চক্রকারে ঘুরিছিল পিশাচগুলো।'

নুরুল আলম সাহেব থামলেন। একবার তাকালেন জানালার বাইরে। বাড়ের প্রতাপ কমেছে। বিরি-বিরি বর্ষণ হচ্ছে এখন।

'তারপর কী হলো?' জানতে চাইলাম।

'তারপর আর তেমন কিছুই না। আমি আফসানকে কল করে বৌজি দিতেই সে লোকজন নিয়ে হাজিব হয়। মানুষগুলো যেমন ছিল আতঙ্কিত, তেমনি ক্রোধে উন্মত্ত। উপসনালয়টি প্রথমে ঘেরাও করে রাখা হয়। পরে আমার শত বাধা সঙ্গেও আঙুল ধরিয়ে দেওয়া হয়। মনে আছে, বামনগুলোর আহি-আহি চিক্কারে তখন আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠেছিল। বাস, ঘটনা এখানেই শেষ। এখনও

মাঝে মধ্যে ওদিকে গন্ধরের উৎপাতের কথা শোনা যায়।'

তো আমার গায়ের রোম সব খাড়া হয়ে গেছে। টেবিল থেকে পানির প্লাস তুলে ঢক-ঢক করে পুরোটা খেয়ে নিলাম।

'৫০০ ক্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রাচীন মিশরের নুবিয়া ভ্যালির প্রাচীন নিপিতে 'বিস' নামে এক বামন দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।' নুরুল আলম সাহেবের তাঁর মোটা ফ্রেমের চশমাট ঝুলে মুছে নিলেন। 'বিস ছিল ঘর-গহ্যস্থালির দেবতা। পুত্রসন্তান জন্মাদান এবং সুফলা নারীদের বক্ষাকর্তা হিসেবেও মিশরের কয়েকটা গোত্রে এর আরাধনা চলত। এই বামন দেবতা ছিল কাম্যক প্রকৃতির। কথিত আছে বিস দেবতার যে নারীকে পছন্দ হত না, তার উপর থুথু ছিটাত। পরে দেবতা 'রা' শাস্তি হিসেবে বিস-এর দেবতা ছিনিয়ে নেয়। সে হয়ে যায় অপদেবতা। এই বিস-এর সাথে গন্ধরের অস্তুত মিল পাওয়া যায়।' নুরুল আলম সাহেবের তাঁর ঘটনা শেষ করে হাসলেন। বাইরে থেকে তুমুল বাতাস এসে একবার আদোলিত করে গেল। লক্ষ করলাম মনে-মনে গন্ধরের একটা ছবি কল্পনা করে নিয়েছি আমি। নিজের অজ্ঞতেই গায়ে কঁটা দিয়ে উঠল।

'আজ তা হলে উঠি, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে,' খানিক পর বললাম। সত্যি বলতে কি এমন আভ্যন্তর হেড়ে উঠতে বিন্দু মাত্র ইচ্ছে হচ্ছে না! তা ছাড়া বাড়ের রাত। রাত্তায় মানুষজন তেমন নেই। ভয়-ভয় করছে।

নুরুল আলম সাহেব মুচকি হাসলেন, 'আজ থেকে যান বরং, কাল ছুটির দিন, সারাটা রাত জমিয়ে আভ্যন্তর দেয়া যাবে। অনেক গল্প এখনও বাকি। আর বিচুড়িটাও না হয় আরেকবার চেবে দেখবেন। কি বলেন, সুনীল বাবু?'

আমি আর না করতে পারলাম না!

মনির বুক স্টল ও সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র

প্রোপ্রাইটার: মনির হোসেন

এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন ও সমস্ত রিপ্রিন্ট বই পাওয়া যায়।

মুক্তবাংলা মার্কেট সংলগ্ন, মীরপুর-১

মোবাইল: ০১৯১২২২৫৫৮৩

দাঁত ও মুখের প্রাকৃতিক চিকিৎসা ও হার্বাল ওষুধ

ড. মোঃ ফারুক হোসেন

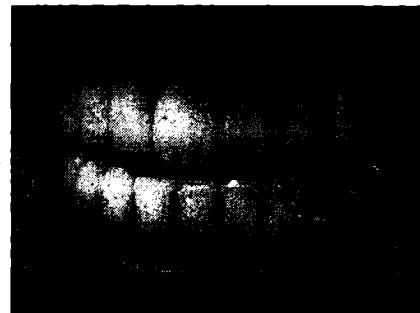
মুখ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ
আমাদের দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক মাটী রোগ বা জিনজিভাইটিসে ভুগে থাকেন।

দ

তের মাটীতে ক্ষত হলে এবং তা থেকে
রক্ত বের হলে তিনি ভাগ সরিবা এবং
এক ভাগ সঙ্কৰ লবণ একত্রে চূর্ণ করে
মিশিয়ে দাঁতের মাটীতে সূক্ষ্মভাবে যাসেজ
করলে দাঁতের মাটীর ক্ষত অনেকাংশে চলে
যায়। ধনেপাতা চূর্ণ করে এর রস দিয়ে দাঁত
মাজলে দাঁত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। তবে
দাঁতের ক্লেইং প্রয়োজন হলে তা করিয়ে নিতে
হবে। দাঁত ও মাটীতে ব্যথা হলে তুলসী পাতা
ও কালো মরিচ চূর্ণ করে পেস্ট আকারে দাঁতের
গোড়ায় প্রয়োগ করলে দাঁতের ব্যথা অনেকটা
নিরাময় হয়। তবে মাটীতে কোন আলসার
থাকলে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে না।
প্রাকৃতিক চিকিৎসার পর দাঁতের ব্যথার কারণ
অনুযায়ী ডেন্টাল সার্জনের কাছে হ্রাস্য চিকিৎসা
নিতে হবে। তাবের পানি অনেক দিন খেলে
জিতের সাধারণ আলসার ভাল হয়ে যায়। পাকা
পেঁপেও জিজের আলসার সারাতে সাহায্য করে
থাকে। বিশেষ করে পাকা পেঁপে আলসারের
ক্ষত হ্রাস করাতে সাহায্য করে থাকে।

বর্তমান বিশে হার্বাল ওষুধ বিভিন্ন রোগের
চিকিৎসায় এক বৈপ্লাবিক পরিবর্তন ঘটেছে।
বিশের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও
বর্তমানে হার্বাল ওষুধ প্রয়োগে করে বিভিন্ন
রোগের চিকিৎসা করা হচ্ছে। পার্শ্বপ্রতিরক্ষিয়া
নেই বলেই হার্বাল ওষুধ সবার মাঝে দিন
দিনই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। অন্যান্য রোগের মত
দাঁতের চিকিৎসায়ও হার্বাল ওষুধ ব্যবহার করা
যায়।

মাটী রোগ: দাঁতের রোগগুলোর মধ্যে আমাদের
দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক মাটী রোগ বা
জিনজিভাইটিসে ভুগে থাকেন। সাধারণত
জিনজিভাইটিসের চিকিৎসায় অ্যাস্টিবায়োটিকের
সাথে মেট্রোনিডাজল জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা
হয়। কিন্তু রোগীদের মাঝে থারা আলসকোহলে
আসক্ত তাদের মেট্রোনিডাজল দিলে



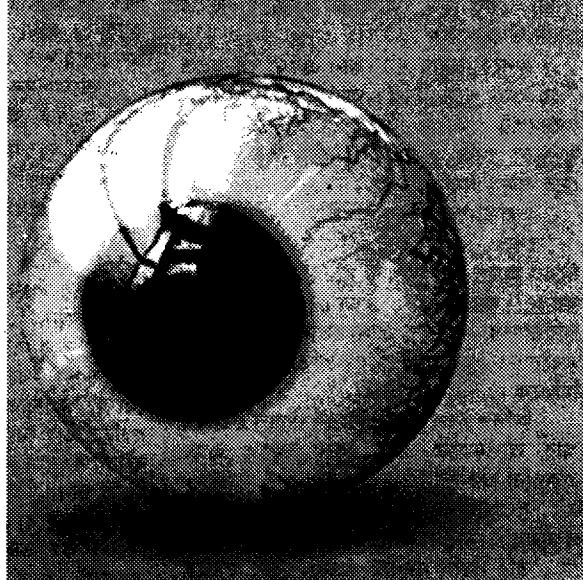
মেট্রোনিডাজল এবং অ্যালকোহল একসাথে যুক্ত
হয়ে ভ্যাসোডাইলেশন বা রক্তনালীর প্রসারণ
সৃষ্টি করে থাকে। এ ছাড়া বর্মি-বর্মি ভাব, মাথা
ব্যথা এবং শরীরে ঘাম ও বৃক্ষ ধড়ফড় করতে
পারে। লিভার সংক্রান্ত কোন জটিলতায় যাদের
মুখে রোগের সৃষ্টি হয় তাদের ক্ষেত্রে হার্বাল
ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে। দন্ত চিকিৎসার
ক্ষেত্রে অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রায়ই ভিটামিন সি
ট্যাবলেট দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সমস্যা
হলো শিশুরা ভিটামিন সি ট্যাবলেট চকলেটের
মত একসাথে অনেকগুলো খেয়ে ফেলে যা
যাচ্ছ্বের জন্য ক্ষতিকর। দাঁতের ক্ষয়ের কারণে
বা অন্যান্য সমস্যায় অনেক শিশুই ক্ষুধায়নদায়
ভূঁয়ে থাকে। তাই এসব ক্ষেত্রে কিছু হার্বাল
সিরাপ প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যায় এবং
ভিটামিন সি-ও পাওয়া যায়। অতএব, দাঁতের
চিকিৎসায় হার্বাল অষুধ প্রয়োগ করে সুচিকিৎসা
নিশ্চিত করা সম্ভব। তবে রোগের ধরন বুঝে
চিকিৎসা দিতে হবে। মুখ ও দাঁতের যে কোন
ধরনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীকে দুর্বিজ্ঞামুক্ত
থাকতে হবে। দুর্বিজ্ঞামুক্ত মানব দেহের হরমোন
নিঃসরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এ হরমোন
রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে
মুখের রোগ সহ অন্যান্য রোগ নিরাময় হতে
বেশি সময় প্রয়োজন হয়। ■

মোবার: ০১৮১৭৫২১৮৭

ভয়াল চতুষ্টয়

তোফির হাসান উর রাকিব

পর্যায় ভেসে
উঠেছে
কুসিত
কদাকার
এক
পিশাচের
মূৰ্খ। স্থিৰ
দৃষ্টিতে
ওটা
তাকিয়ে
আছে মিলিৱ
চোখের
দিকে।



হল্টেড

ণতুন এ বাসাটায় এসে বেশ ভাল সময় কাটছে মিলিৱ। কলেজ থেকে ফিরেই টিভিৰ সামনে বসে যায় সে। একে-একে দেখতে থাকে পছন্দেৰ সবকটা সিরিয়াল। মা-বাবা কাছে নেই, তাই খৰবদাৰী কৰাবও কেউ নেই। ভাইয়া-ভাৰী দু'জনেই চাকৰি কৰেন, তাঁদেৱ ফিরতে ফিরতে সেই সক্ষাৎ। তাই দিনেৱ পুরোটা সময় একচৰ্জ শাধীনতা ভোগ কৰে মিলি।

ছেলেবেলা থেকেই এমন একটা শাধীন জীবনেৱ প্ৰতীক্ষায় ছিল ও, অবশ্যে এস.এস.সি পাস কৰাব পৰ সে সুযোগ মিলেছে। আমে ভাল কলেজ নেই, তাই বাধ্য হয়েই তাকে শহৰে কলেজে পড়তে পাঠিয়েছেন বাবা। মিলিৱ ভাইয়া-ভাৰীৱ একই শহৰে চাকৰিৰ সুবাদে, আবাসনেৱ সমস্যাটুকুও যখন আৱ রইল না, তখন আৱ আদৱেৱ মেয়েকে আগলে রাখাৰ কোন কাৰণ বুঝে পাবনি বাবা। মেয়ে বলে তো আৱ তাকে অৰ্ধ-শিক্ষিত কৰে ঘৰে বসিয়ে রাখতে পাৱেন না, তাই খুশি মনেই সম্পতি দিয়েছেন তিনি।

মিলিৱ ভাইয়া-ভাৰী আগে একটা ছেটা বাসায় থাকলেও, মিলি আসাৱ পৰ এই নতুন বাসাটায় এসে উঠেছেন। বাসাটা এককথায় চমৎকাৰ। ড্রাইং-ডাইনিং ছাড়াও আলাদা দুটো বেডৰুম। দুটোৱ সাথেই লাগোয়া বারান্দা আৱ বাথৰুম রয়েছে। দেয়ালগুলোয় নতুন চুনকাম কৰা হয়েছে বেশিদিন

হয়নি, এখনও রীতিমত চকচক করছে। তবুও কেন যেন বাসটা ভাড়া হচ্ছিল না!

একজন ভাড়াটে যা-ও বা এসেছিল, তিনদিনের মাথায়ই নাকি গাঁটরি-বোঁচকা শুনিয়ে বিদায় নিয়েছে! তাই নিতাত অল্প ভাড়াটেই বাসটা পেয়ে গিয়েছিলেন মিলির ভাইয়া। পরের সন্তানেই সপরিবারে উঠে এসেছেন এখানে। ইতোমধ্যেই পার করেছেন গোটা দশশক দিন, কোনরকম সমস্যায় পড়তে হয়নি তাঁদেরকে!

দুপুরে খাবার পর কোন একটা বই হাতে নিয়ে শয়ে পড়ে মিলি। আর অপেক্ষায় থাকে বিকেলের। কারণ বিকেলেই পাশের বাসার সুলতানা ভাবী আসে। দু'জনাতে আড়ত দেয় সেই সন্ধ্যা অবধি।

সুলতানা বয়সে মিলির চেয়ে বছর তিনিকের বড়-ই হবে। বিয়ে হয়েছে মাস ছয়েক আগে। একান্নবর্তী পরিবারে বেশ সুবেহে ঘরকন্না করছে সে এখন। তার সুবিশাল পরিবারের হরেক সদস্যের নানারকম মুখরোচক কাহিনিই সে প্রতিদিন শোনায় মিলিকে।

মিলি ও বেশ আগ্রহ নিয়েই শোনে সেসব। আর আপনমনে ভাবে, কবে তারও এমন একবাণী আলাদা সহসর হবে!

সুলতানার বেশিরভাগ গল্পই অশ্বীল প্রকৃতির। নেওয়া কথা বলে বেশ তৃষ্ণি পায় সে। তার ধূমসি ননদটা ওড়না গলায় জড়িয়ে কেমন করে ছেলেদের মাথা খারাপ করে, তার উঠৰ্তি বয়সের দেবরটা কেমন লোলুপ দৃষ্টিতে তার ভাবীর শরীরের বাঁজ-ভাঁজগুলো জরিপ করে, ভাস্তুটা কাজের ব্রার দেহের প্রতি কেমন পাগলপারা, এসব নিয়েই নিত্য আবর্তিত হয় সুলতানার কথামালা!

তবে সুলতানার গল্পের পিছে বিষয় হলো, শ্বাসীর সাথে তার বাতের আদর-সোহাগের স্মৃতি রোমস্থন! অবলীলায় নির্লজ্জের মত ধারাবিবরণী দিতে থাকে সুলতানা! আর সেগুলো শুনতে-শুনতে কান গরম হয়ে যায় মিলির, কেমন অহির অহির লাগে!

সুলতানা অবশ্য মিলির এই উন্মেজনাটা বেশ-বুরতে পারে। তাই আরও রসিয়ে-রসিয়ে

বয়ান করে সে সমস্ত উপাখ্যান, আর তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করে মিলির হাসফাস অবস্থা!

মাঝে-মাঝে কথাছলে মিলির শরীরের এখানে-ওখানে হাত দেয় সে। মুখে কপট রাগ দেখালেও ব্যাপারটা বড় ভাল লাগে মিলির। এমনি এক বিকেলের আড়ায় মিলি জানতে পারল, কেন তাদের এ বাসটায় ভাড়াটে পাওয়া যাচ্ছিল না এতদিন ধরে। চোখ বড় বড় করে সুলতানা বয়ান করল এক গা শিউরে ওঠা কাহিনি। জানা গেল, বহুকাল ধরে কোন এক অশরীরীর বাস এখানে!

অনেকদিন ধরে খালি পড়ে থাকার পর মাস কয়েক আগেই বাসটার সংক্ষার শুরু করেন মালিক ভদ্রলোক। তিনি প্রবাসে থাকায়, এতকাল বাড়িটার কোন যত্নআতি নেয়া সম্ভব হয়নি, একরকম খালিই পড়ে ছিল এটা। সংক্ষার করার সময় নানা রকম দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় বেশ ক'জন শুধুমাত্র। তাকে স্বপ্নে বেশ কয়েকবার সতর্কও করা হয় এ বাড়িতে আর না আসার জন্য! লোকে বলতে শুরু করে, দৃষ্ট আজাদের বসবাস এখানে!

হজুর, কবিরাজ ডেকেও নাকি এখন থেকে অপ্রাকৃত শঙ্কিটিকে ভাড়ানো সম্ভব হয়নি! তাই মালিক ভদ্রলোক নিজে আর এ বাসায় বসবাস না করে, বাসটা স্বল্পমূলে ভাড়া দিতে চান। কিন্তু এহেল কাহিনি শোনার পর আর কার-ই বা এমন হালাবাড়িতে ওঠার সাহস থাকে? কম ভাড়ায় পেয়ে যে একজন সাহসী ভাড়াটে এসে উঠেছিল বাড়িটায়, সে-ও তিনদিনের মাথায়ই বিদায় নিয়েছে! যাওয়ার কারণ সে অবশ্য কাউকে বলে যায়নি, শুধু বলেছে এখানে বসবাস করা কোন মানবের পক্ষে সম্ভব নয়! এসব অনে ঘরের গাঁটীরে একটা ভয় ঢুকে যায় মিলির। তবে কি ওরা একটা ভুতুড়ে বাড়িতে এসে উঠেছে? সতীই কি অতিপ্রাকৃত কোন কিছুর বসবাস আছে এখানে?

সে রাতেই ভাইয়া-ভাবীকে ব্যাপারটা জানাল মিলি। অনে ভারা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তাকে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, 'ভূমি কখনও কিছু দেবেছ নিজের চোখে? আমরা কেউ তো কিছু দেবিনি! শিক্ষিত মেয়ে এসব গালগঞ্জে বিশ্বাস করলে কেমন করে?' চট করে

কোন উভয় দিতে পারে না মিলি, চুপ করে থাকে। সত্ত্বাই তো, তার নিজের চোখে তো কোনদিন অস্থাভাবিক কিছু পড়েনি! তা হলে?

নিশ্চয়ই সুলতানা ভাবী তাকে ভয় দেখানোর জন্যই এসমত্ত কথা বলেছে। এগুণিতেই যে কোন বিষয় রঙ চাড়িয়ে ফুলিয়ে-ফালিয়ে উপস্থাপন করতে তার জুড়ি মেলা থাব। নাহ, এই মহিলাকে নিয়ে আর পারা গেল না! আপনমনে বকবক করে সুলতানার উপর রাগ ঝাড়তে-ঝাড়তেই সে রাতে ঘুমিয়ে পড়ল মিলি।

উপদ্রবটা শুরু হলো পরদিন দুপুর থেকে! কলেজ থেকে ফিরে কিছুতেই আর দরজা খুলতে পারছিল না মিলি! চাবি ঘুরিয়ে দরজা খোলার পরও দরজাটা কেমন গাঁট হয়ে এংটে রইল! অনেক ধাক্কাধাকি করেও দরজাটা একচুল নড়তে পারল না ও! যেন ভিতর থেকে কেউ একজন সর্বশক্তি দনেয়ে টেপে ধরে আছে। কী করবে, কিছুই ব্রহ্মতে না পেরে ভাইয়াকে ফোল করার সিদ্ধান্ত নিল মিলি। মোবাইল ফোনটা বের করে যেই না ভাইয়ার মোবাইলে কল দিতে যাবে, অগনি তার চোখের সামনে আলতো করে খুলে গেল দরজাটা! কীভাবে খুল ওটা? অথচ একক্ষণ বলপ্রয়োগ করেও ওটাকে খুতে পারেনি মিলি!

ভয়ে-ভয়ে ঘরের ভিতরে পা ঝুঁকল ও। ভীত তাহনিতে এদিক-ওদিক ঝুঁজে দেখল। যদিও ঠিক কী ঝুঁজছে, সেটা তার নিজেরও জানা নেই! অবশ্য অস্থাভাবিক কোনকিছুই তখন চোখে পড়ল না তার।

শেষপর্যন্ত নিজে নিজেই একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করল মিলি। হয়তো তালাটা ঠিকমত না খুলেই দরজায় ধাক্কা দেয়া শুরু করেছিল ও। পরে কোনভাবে হয়তো তালাটা খুলে যায়, আর দরজাটাও সহজেই উন্মুক্ত হয়! যদিও ব্যাখ্যাটা পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত হলো না, তবুও মনে বেশ খানিকটা বল ফিরে পেল ও। ভৃত-প্রেতে তার মোটেও বিখ্যাস নেই, কেবল কল্পনার জগতেই তাদের অস্তিত্ব আছে! রংগরগে হুরে কাহিনি পড়েও সে কদাচিতই তয় পায়!

হালকা নাস্তা করে তিভি দেখতে ঘসে যায়

মিলি। মায়ের বানিয়ে দেয়া তেঁতুলের আচার সাবাড় করতে-করতে রিমোটের বাটন টিপতে থাকে। দিনটা বিশ্বাস হওয়ায়, তার পছন্দের সিরিয়ালগুলোর বেশিরভাগেই আজ অফ-ডে। সঙ্গের হ্যাটা দিন টানা সম্প্রচার করে এই একটা। দিন বিশ্রাম নেয় সিরিয়ালওয়ালারা। অবশ্য এই ক্ষিটো তারা পুরিয়ে দেয় ভাল-ভাল সিনেমা পচার করে।

চামেল ঘোরাতে-ঘোরাতে হঠাত একটা হৱর মুভি পেয়ে গেল মিলি। গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতে থাকে ও, যদিও আজকালকার হৱর মুভিগুলো দেখলে তার তরের চেয়ে হাসিই বেশি পায়।

হঠাত তাকে অবাক করে দিয়ে পর্দার ছবিটা একটা জায়গায় এসে পুরোপুরি স্থির হয়ে রইল! পর্দার ভেসে উঠেছে কৃত্স্নিত কদাকার এক পিশাচের মুখ। স্থির দৃষ্টিতে ওটা তাকিয়ে আছে মিলির চোখের দিকে। নিষ্প্রাণ চোখগুলোয় কেমন এক অস্ত ছায়া।

অকারণেই বুকটা কেঁপে উঠল মিলির। চটকজলন্দি রিমোট টিপে চামেলটা পরিবর্তন করতে চাইল। কিন্তু যতই বোতাম চাপা হোক না কেন, রিমোটটা কিছুতেই আর কাজ করে না! তিভি ক্লিন থেকে কিছুতেই অদৃশ্য করা গেল না সেই ভয়ঙ্কর মুখটাকে! কী হলো রিমোটটার? ব্যাটারি শেষ হবার আর সময় পেল না বুঝি? রাগের চোটে রিমোটটাকে প্রচও জোরে মাটিতে আছড়ে ফেলল মিলি। তারপর ছুটে গেল তিভির সামনে, সরাসরি সুইচ টিপেই চামেল চেঞ্চ করবে বলে।

ভীষণ রকম অবাক হলো মিলি, তিভির সুইচগুলোও কাজ করছে না! এমনকী তিভি অক করার সুইচটা টেপার পরও দিব্য ক্লিনে তেসে রয়েছে সেই তয়ানক পিশাচের চেহারা!

আর কোন উপায় না পেয়ে মিলি ঝটকা দিয়ে খুলে ফেলল তিভিটার বিদ্যুতের তার। যাক, এবার নিশ্চয়ই মুক্তি মিলবে। কিন্তু মিলির বিশ্বাসের বুঝি তখনও কিছুটা বাকি ছিল। বিদ্যুৎ সংযোগ ছাড়াই চলছে তিভিটা এখন! পদার্য এখনও ভাসছে সে তয়াল পিশাচের মুখটা! আরও বেশি জীবন্ত মনে হচ্ছে এখন ওটাকে, যেন এক্সুপি বেরিয়ে আসবে পর্দা ভেদ

করে!

আতঙ্কে থরথর করে কাপতে লাগল মিলি। গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠবে যে কোন সময়।

ঠিক তখনই আচমকা টিভিটা বন্ধ হয়ে গেল! অদ্য হয়ে গেল ভৃত্যের অবয়বটা।

বিদায় নেবার পূর্বমুহূর্ত হাসছিল নাকি ওটা? নাকি সবটাই মিলির চোখের ভুল?

এরপর আর কিছুতেই একা থাকার সাহস রইল না মিলির। চটজলদি গিয়ে পাশের বাসা থেকে সুলতানাকে টেনে নিয়ে এল। সবকিছু শুনে সুলতানার চোখমুখও শকিয়ে গেল। কথা দিল, মিলির ভাইয়া-ভাবী না আসা পর্যন্ত মিলির সাথেই সময় কাটাবে সে। এরপরও অনেকটা সময় লেগে গেল মিলির পুরোপুরি ব্যাভাবিক হতে। বুকের ধূকপুকানি করতেই চাইছে না তার! সাহস করে টিভিটা আবার ছাড়ল সুলতানা। নাহ, ভয়ের কিছু নেই পর্দায়। খবর পড়ছে সুন্দরী সংবাদ পাঠিকা, প্রায় আড়াইশ' জন মানুষ নিয়ে গায়ের হয়ে গেছে মালয়েশিয়ার একটি বিমান।

দুপুরে বাথরুমে গোসল করতে গিয়ে কেমন যেন অবস্থি লাগতে লাগল মিলির। বারবার মনে হচ্ছে, কেউ যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে! মেয়েদের দিকে কেউ তাকিয়ে থাকলে তারা সেটা বুঝতে পারে। এ অস্তু ক্ষমতা স্বয়ং দৈশ্বরই তাদের দিয়েছেন।

সুলতানা ভাবী মজা করছে না তো আবার? কিন্তু তা কী করে হ্যাঁ! সে তো বসে বয়েছে সেই ড্রয়িংরুমে। তা ছাড়া বাথরুমের দরজাটাও তো ভিতর থেকেই বন্ধ করা।

চট করে তার চোখ গিয়ে পড়ল শিছন্নের আধখোলা ছেট জানালাটার দিকে। বাসার পিছনের ওদিকটায় জংলামতন একটা জায়গা। কিছু

কঁটাবোপে ভরা। ওদিকটায় লোক চলাচলের পথ নেই, তাই আলো-হাওয়ার জন্য ছেটে এই জানালাটা খোলাই রাখা হয়। ঠিকমত হাওয়া না খেললে, গোসলখানা অল্পদিনেই কেমন স্যাতসেঁতে হয়ে যায়।

ওখানে গাছের আড়ালে লুকিয়ে কোন দুষ্ট ছেলে উঁকি দিচ্ছে না তো? নয় নারীদেহ দেখাৰ লোভ, উঠতি বয়সী ছেলে-ছেকরাদেৱ বেশ ভাল রকমই থাকে। তাদেৱই কেউ হয়তো এই ভৱনপুরে বোপেৰ আড়ালে আত্মোপন করে নাইভ শো দেখাৰ ফণ্ডি কৰছে!

হাত বাড়িয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিল মিলি। তাৰপৰও তাৰ অস্থিতি বিন্দুমাত্রও কমল না! চটজলদি কোনৰকমে গায়ে পানি ঢেলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ও।

মনেৰ গভীৰে ভয়টা আবারও দানা বেঁধে উঠেছে তাৰ। নিৰপায় হয়ে সুলতানাকে রাটটাও তাৰ সাথে থেকে যাওয়াৰ অনুরোধ কৰতে বাধ্য হলো মিলি।

মিলি ভেবেছিল, শ্বাসীকে ছাড়া রাত কাটাতে কিছুতেই রাজি হবে না সুলতানা। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে নিমিষেই সম্ভতি জানাল সুলতানা! এ ক'দিনেই মিলিকে ভালবেসে ফেলেছে সে, তাই তাৰ অনুরোধ ফেলতে পাৰেনি।

সে রাতে শুকনো মুখে ভাইয়া-ভাবীকে সবকিছু খুলে বলল মিলি। শুনে তাঁৰা যথারীতি অটহাসি দিয়ে উড়িয়ে দিলেন মিলিৰ আশক্ষাকে! তাদেৱ ধাৰণা, অতিৰিক্ত হৱৱ বই পড়তে-পড়তেই এ অবস্থা হয়েছে মিলিৰ। আৱ তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে সুলতানা ভাবীৰ কাছ থেকে শোনা যতসব গাঁজাখুরি গশ্চো। হৱৱ বই পড়া ক'দিনেৰ জন্য ইন্তফা দেয়াৰ, পৰামৰ্শ দেয়া হলো তাকে।

তাদেৱ সাথে কথা বলাৰ মুহূৰ্তগুলোতে

ইসলামিয়া সাইন্সেৱা Y-9 নূরজাহান ৱোড, মোহাম্মদপুৰ, ঢাকা।

মোবাইল: ০১৯১২০০১২৫২

এখানে সেবা প্ৰকাশনী ও প্ৰজাপতি প্ৰকাশনৈৰ নতুন ও সমস্ত রিপ্ৰিণ্ট বই পাওয়া যায়।

শাখা-১: বাড়ি নং ১১, মোহাম্মদিয়া হাউজিং, প্ৰধান সড়ক, মোহাম্মদপুৰ।

শাখা-২: ১৪/১৭ ইকবাল ৱোড, মোহাম্মদপুৰ।

মিলির বারংবার মনে হলো, তারা ছাড়াও কামরায় আরও কেউ উপস্থিত আছে! যে কান পেতে শুনছে তাদের কথোপকথন, জানতে চাইছে কী তাদের সিদ্ধান্ত! ভয়ে কঠো দিয়ে

উঠল মিলির শরীর। ভাইয়া-ভাবীর উপহাসের জয়ে, একথা আর তাদের জনাল না সে। বিষণ্ণ মুখেই নিজের কুমে ফিরে এল।

অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই তয় কেটে গিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সে। সুলতানার মজার মজার সব নোংরা চুটকি শোনার পরও মন ভার করে রাখবে, এমন সাধ্য কার আছে?

মাঝারাতে হঠাৎ ঘূম ভেঙে গেল মিলির। প্রথম কয়েক মুহূর্ত বুতে পারল না, ঠিক কী কারণে ঘুমটা ভেঙেছে তার। পাশে তাকাতেই দেখতে পেল, বেঞ্চেরে ঘুমাচ্ছে সুলতান। এলোমেলো চুলে মুখের অনেকটা ঢাকা পড়ে আছে। গল্প করতে-করতে কখন যে সুজনে ঘুমিয়ে গেছে, সেটা নিজেরাও জানে না।

মশারীও দেয়া হয়নি, ইচ্ছেমত মশা কামড়াচ্ছে এখন। মশার কামড়েই কি ঘূম ভাঙল? তাই হবে হয়তো।

ঘূম-ঘূম চোখে উঠে মশারী টানাল মিলি। নিজে মশার কামড় থেকে রাজি আছে ও, তবে মেহমানকে খাওয়াতে রাজি নয়। আবার বালিশে মাথা বাথতেই শুলতে পেল বাথরুমের ট্যাপ থেকে টপ-টপ করে পানি পড়ছে। এ মধ্যরাতের নীরবতায়, বড় বেশি কানে লাগছে শব্দটা। কে ছেড়েছে ট্যাপ? সুলতান ভাবী? তাই হবে। কারণ তার জানার কথা নয়, এ ট্যাপটার মাথাটা একটু জোরে ঘোরাতে হয়, না হ্যাঁ জল বুরা বৃক্ষ হয় না। হয়তো ঘুমের ঘোরে জলদি টিয়লেট সেরে এসে শুয়ে পড়েছে, ভাল করে আর নল বন্ধ করার দিকে খেয়াল করেনি।

কিছুক্ষণ বালিশে কান চেপে রেখে ঘুমানোর বৃথা চেষ্টা করল মিলি। নাহ, আওয়াজটা একেবারে যাখায় এসে আঘাত করছে। শেষমেশ বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে গেল ও। লাইট জ্বালল না, পাছে সুলতানার ঘুমের ব্যাধাত ঘটে। বেচারি বেশ আরাম করে ঘুমোচ্ছে, দেখতে মায়া লাগছে ভীষণ।

ট্যাপ বন্ধ করে ফেরার পথেই দড়াম করে

আছাড় খেল মিলি! যতটা না ব্যথা পেল, তারচেয়েও বেশি লজ্জা পেল ও। ভাগ্যস কেউ দেখে ফেলেনি। এতবড় মেয়ে কেমন করে আছাড় বায়?

দরজার কাছে এসে ভীষণ অবাক হলো মিলি। কিছুতেই খুলছে না দরজাটা! এদিক-ওদিক নব ঘুরিয়ে বারংবার চেষ্টা করল, কিছুতেই কিছু হলো না! তয়ের শীতল স্ন্যাত নেমে গেল তার শিরদিঙ্গি বেয়ে। হাতলে হাত রেখে চেষ্টা করে চলল ও। মনে-মনে আশা করছে, সকালের মতই দৈবক্রমে খুলে যাবে ওটা!

কিন্তু বিধি বাম!

আচমকা কিছু একটা শক্ত করে তার পায়ের গোড়ালি চেপে ধরল! হড়ডড় করে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল বাথরুমের যাবানামাবি জায়গায়। টীব্র আতঙ্কে পুরোপুরি পাথর হয়ে গেল মিলি। পরমহৃতেই কেউ একজন পিছন থেকে জাপটে ধরল তাকে। শক্ত বাঁধনে চাপা পড়ল তার নাকমুখ। নিমিমেই শাসপ্রস্থাস বন্ধ হয়ে গেল। প্রাণ বাঁচানোর তাড়নায় দিঘিদিক হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল ও। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না! মুক্তি মিলল না বজ্রাকঠিন সে বন্ধন থেকে! হঠাৎ আয়নায় চোখ পড়তেই সীমাহীন আস ছড়িয়ে পড়ল মিলির দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায়! সে দেখতে পাচ্ছে সকালের সেই ভয়কর মুখটাকে! ওটা এখন এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক তার পিছলটাতে। প্রাণপণে চিংকার করতে চাইল মিলি, কিন্তু পারল না। মুখ দিয়ে কেবল গোঙানি ছাড়া আর কোন শব্দই বেরোল না তার! চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অঞ্জল, গাল বেয়ে মেমে গেল আরও নীচে।

আয়নায় তখন হেসে উঠেছে মুখটা, সকালেও ঠিক এমনি করেই হেসেছিল ওটা। ভুল দেখেনি মিলি। পরিত্তিগ্রস্ত সে হাসি বড় কৃত্স্নিত, বড় ভয়কর। তার রাঙ্গে কোন অনাহতের ঠাই নেই, বাঁচতে দেবে না সে!

শ্রিয় পাঠক, কোন এক মাঝারাতে ঘূম ভেঙে যদি শুনতে পান বাথরুমের ট্যাপ থেকে ফেন্টায়-ফেন্টায় জল ঝরছে, একা-একা ছুটে

যাবার আগে, আরেকবার ভেবে দেখবেন কি?

প্রেতঘৰ

বস্তু মহলে একটা কথা চাউর হয়ে গেছে যে, ভূত-প্রেতের কাহিনির প্রতি আমার বেজায় অগ্রহ। কেউ ভাল কোন বাস্তব কাহিনি শোনাতে পারলে সিঙ্গারা-সমুচৰ সাথে দু-এক কাপ চা খাওয়াতেও কার্পণ্য করি না কখনও।

কাহিনি যত বেশি জয়জমাট, ট্রিটের পরিমাণও ঠিক ততটাই বেড়ে যায়।

তাই বস্তুত্ত্বের খাতিরেই হোক কিংবা ট্রিটের লোভেই হোক, বস্তুরা আয়ই আমাকে কিছু অভিজ্ঞাকৃত কাহিনি শোনায়। বেশিরভাগ সময়ই অবশ্য ছাইপাশ গেলানোর চেষ্টা করে, হাড় কাঁপানো ভয়ের কাহিনি খুব একটা পাই না আজকাল। শুধু সফেদ কাপড়ে জড়নো বিশালদেহী ছায়ামূর্তির কপা, বাঙ্গার খেকে মাছ নিয়ে মেশার সময় নাফি সুনে মাছ চাওয়ার কথা, কিংবা শেষই আছ ভাজাপ পর রান্ধানোর জন্য সা নিয়ে কানেক হাত বাঢ়িয়ে দেবার কথা আবে শুন লাগবেই বা কেমন করে? কাহাতেক আর এসব ধূঁধাটা আগমনের ভূঙ্কের বেছে ওমে সন্তুষ্ট থাকতে হবে!

এসব গুরু শুনতে-শুনতে শাহু মাঝেই আপনার ধারণা হতে পারে, মাছ ধাওয়া ছাড়া বুঝি ভূতদের আর কোন কাজকর্ম নেই। কিংবা এই যে দেশ থেকে টেক্কা, পুঁটি, পাবনা, চিতল, আড়, বোজাল, শিং মানুষ এসব দেশে মাছগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এর পিছনে হয়তো ভূতেরাই দায়ী! তবে আদতে ঘটনা কিন্তু দেখন ভাবছেন তেমন নয়!

যাহোক, মোদ্দা কথা হলো, তব পাশ্চায়ার জন্য প্রাণটা আমার রীতিমত আইটাই কঢ়িছি! মাঝেন্দারিয়ে কানে হেডফোন ঘুঁজে, একা ঘরে আইট নিয়ে হরে ঝুঁড়ি দেখলে, কিছুটা ডয় আমি ঠিকই পাই। কিন্তু এসব কৃতিম জিনিসে বি মন ভরে? আমার চাই রক্ষিত করা বাস্তব অভিজ্ঞতা। সেই সাথে মুক্তে দু'একটা অশুরীরীর দেখা যদি পাওয়া যায়, তা হলে তো সোনার সোহাগা!

অবশ্যে আমার নিখাদ আকৃতি দেখে এক সহদয় বস্তুর খানিকটা দয়া হলো। সে

জানাল, আমি চাইলে সে আমার সাথে অপ্রাকৃত সমাদের দেখা করিয়ে দিতে পারে এবং এতে যে আমি নির্ধার্ত ভয় পাব, তাতেও তার মনে সন্দেহ নেই! তবে এজন্য আমাকে যেতে হবে তাদের বাগানবাড়িতে। যেহেতু অনেক দূরের পথ, তাই যাতায়াত বাবদ আমার বেশ কিছু অর্থকড়ি ব্রচ হবে, বিষয়টা যেন আমি মাঝায় রাখি।

তৎক্ষণাৎ তাকে জানিয়ে দিলাম, কুচ পরোয়া নেই! এ জীবনে কত শত ফালতু জিনিস দেখতে গিয়ে আকেল সেলামী দিলাম, আর এত শব্দের ভূত দেখতে গিয়ে বুঝি কয়টা পরসা খৰচ করতে পারব না! সাক বলে দিলাম, খৰচের চিঞ্চা না করে সে যেন যাবার আয়োজন করে। যে কোন সময় রওয়ানা দেবার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত আমি।

এর দু'টিনের মাধ্যমেই সেই বাগানবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম আমি। শান্তে আছে, শুন কাঞ্চে নিম্ন করতে নেই। আমার বস্তুটি অবশ্য জরুরী কাজ গড়ে যাওয়ায় আগমন সাথে মেতে পারণ না। নাফি কাটা ভয়ে নিষেই পিটোন নিয়েছে কে জানে! তবে এতে কোন সমস্যা নেই। বাড়ির কেয়ারটেকারেরে সব বলা আছে, ধূকা-ধোওয়ার কোন রকম অসুবিধা হবে না আসার।

নিম্নে বেলায় গোটা বাড়িটা ঘূরে-ফিরে দেখলাম। বেশ পুরানো, তবে সুন্দর। বেলী ডিম্বাইনের একবানা হিতল ভবন। সংস্কৰণ বস্তুটির পরদরদার আঘাতে তৈরি।

বাড়ির সামনের দিকটার নিয়মিত ষষ্ঠুন্নাস্তি করা হলেও, পিছন দিকটায় অব্যক্তের ছাপ স্পষ্ট। জায়গায়-জায়গায় পলতারা খসে গিয়ে কঙ্কাল বেরিয়ে রয়েছে। আগছার দস্তলের কারণে হাঁটা দায়, পরিষ্কারের বালাই নেই। বেশ বেকা যায়, বাড়ির এদিকটায় তেজন একটা আলা-যাওয়া নেই কাবও।

বাড়ির কেয়ারটেকার ভোরাব আলীর বয়স হয়েছে, চুল দাঢ়ি সবই সাদা। তিনকুলে কেউ না থাকায়, এখানেই মাটি কাঘড়ে পড়ে আছেন বহু বছর ধরে। চেষ্টে ভাল দেখতে পান না, সক্ষ্যাত পর প্রায় অক্ষই বলা চলে। কেবলমাত্র উপস্থিতি ছাড়া, তাঁর কাছ থেকে

আর তেমন কোন কাজ বোধহয় আশাও করেন
না বাড়ির মালিক!

দোতলা বাড়ির নীচতলার একখানা
কামরায় থাকেন তিনি। আমার থাকার ব্যবস্থাও
নীচতলায় তাঁর, পাশের কামরাতেই করা
হয়েছে। উপরতলায় রাতে থাকা নিষিদ্ধ। এই
নিষেধাজ্ঞার কারণটাও তোরাব আলীর কাছ
থেকেই সবিভাগে জানতে পারলাম আমি।
দোতলার সবচেয়ে কোনার ঘরটায় এককালে
প্রেত-সাধনা করতেন আমার বস্তুটির দাদা।
সময়ে-অসময়ে সেখান থেকে ভুঁড়ে সব
চিকিৎসার শোনা যেত। বড় ভয়ঙ্কর সে আওয়াজ,
শুনলেই পিলে চমকে উঠত। তারপর হঠাৎ
একদিন কাউকে কিছু না বলে কোথায় যেন
চলে যান তিনি! পুরোপুরি গায়ের হয়ে যান,
কোন ঝোঁজই আর পাওয়া যায়নি তাঁর!

ভয় পেয়ে ঘরটাতে মন্ত বড় একখানা
তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁর ছেলে, অর্থাৎ আমার
বস্তুটির বাবা। শুধু তা-ই নয়, দোতলায়
যাওয়াও পরিবারের সবার জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা
করেন। প্রেত-সাধনা দু'চোকে দেখতে পারেন
না তিনি। অবশ্য এরপর উপদ্রব বক্ষ হয়নি
মোটেও! এখনও রাতের বেলা ওই ঘরটা থেকে
ভেসে আসে রক্ষিত করা অপর্যবেক্ষণের!
কখনও-কখনও ভিতর থেকে দরজার উপর
করাঘাতের আওয়াজ!

তোরাব আলীকে জানালাম, আজ রাতেই
সেখানে যেতে চাই আমি। শুনে অবশ্য খুব
একটা অবাক হলেন না তিনি, আমার আসার
কারণটা আগে থেকেই জানা ছিল কিনা!

তবে তাঁর মূখ দেখে এটা স্পষ্ট বুবাতে
পারা গেল যে, ব্যাপারটা নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট নন
মোটেও। তবে আমাকে কোন বাধাও অবশ্য
দেয়ার চেষ্টা করলেন না তিনি! কোন মাথামোটা
ছাগল যদি নিজেই নিজের কবর খুঁড়তে অস্তির
হয়ে যায়, তা হলে তাঁর কী-ই বা করার আছে?
রাতের আহার সমাপ্ত হবার পর আমার হাতে
একখানা পুরানো চাবি ধরিয়ে দিয়ে শুতে চলে
গেলেন তিনি। বুঝে নিলাম, এটা দোতলার
সেই বক্ষ ঘরটারই চাবি। ভিতরে-ভিতরে বেশ
খানিকটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলাম। যাক, এতদিনে
তা হলে অশ্রীরী কারও দেখা পেতে চলেছি

আমি!

আগন যনে উপরে ওঠার প্রস্তুতি
নিছি, ঠিক তখনই শুনতে পেলাম দোতলার
বারান্দায় কে যেন পায়চারী করছে। কে?
তোরাব আলী কোন কারণে দোতলায় গেলেন
নাকি?

চুটে পেলাম পাশের কামরায়। দেখতে
পেলাম তোরাব আলী দিবিয় খাটের উপর লম্বা
হয়ে শুয়ে বেঝোরে শুমাছেল। তা হলে উপরে
হেঁটে বেড়াচ্ছে কোন ব্যাটা? চোর-টোর এল না
তো আবার!

পা টিপে টিপে উঠে এলাম দোতলার
বারান্দায়। সিডির গোড়ায় নিজেকে লুকিয়ে শুধু
যাথা বের করে উকি দিলাম। কোথাও কেউ
নেই, পুরো বারান্দা ফাঁকা!

বাইরে শুনুন্দ হাওয়া বইছে, তার ঝুলক
বারান্দাতেও তের পাওয়া গেল। সে বাতাসে
কেমন যেন একটা অপার্ধির গুঁড় ভেসে এল!
সত্তি-ই কি? নাকি সবটাই আমার মনের ভুল?
ধীরে-ধীরে কোনার দিকের বদ্ধ
কামরাটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তালার
ফোকরে চাবিটা ঢোকাতেই মনে হলো যেন
নিজ থেকেই শূরতে শুরু করল ওটা! বহুদিনের
অব্যবহৃত তালা অথচ খুলতে একটুও কষ্ট হলো
না আমার! শুধু ধাক্কা দিতেই ক্যাচকোচ শব্দ
তুলে দু'দিকে সরে গেল দরজার পাল্লা দু'টা।
কেমন একটা আঁষটে গুঁড় ভক করে এসে
লাগল নাকে। নিমিষেই গা শুলিয়ে উঠল
আমার। কীসের গুঁড় ওটা? বহুকাল আবদ্ধ
থেকে এমন গুঁড় হয়ে গেছে নাকি?

ভিতরে চুকে হাতের টর্চটা জ্বালাম।
তোরাব আলী আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন,
দোতলায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। যতবারই
সংযোগ দেয়া হয়েছে, কীভাবে যেন সেটা
ঘট্টাখানেকের মধ্যেই কেটে যায়! তাই
অনেকবার চেষ্টা করার পর অবশেষে হাল ছেড়ে
দেয়া হয়েছে। টর্চের আলো এদিক-সেদিক
ফেলে যখনই আমি ঘরটা পরখ করতে যাব,
অমনি ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় রাখা একখানা
মোরবাতি আগনাআপনি দপ করে জলে উঠল!

প্রচণ্ড ভয় পেলাম আমি। খাস বক্ষ করে
নিজের জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে বইলাম, নড়বার

সাহসটুকুও নেই তখন আমার! অপেক্ষায়
বইলাম অতিপ্রাকৃত কোন সন্তার সাথে
সাক্ষাতের!

কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেলেও যখন
নতুন কোন কিছুই আর ঘটল না, ধীরে-ধীরে
খানিকটা সাহস ফিরে পেলাম। ঘাড় শুরিয়ে
যোমবাতির আলোয় ঘরটা ভাল করে দেখতে
লাগলাম। মাথায় ভাবনা চলছে, কে জ্বলল
যোমবাতিটা?

ঘরের মেঝে এবং সবকটা দেয়ালজুড়ে
নানারকম নকশা আর বিচিত্র আঁকিবুকির
ছড়াচড়ি! যেন দিনের পর দিন এঘরে বসে
ঘোলোয়াটি খেলেছে কোন কিশোর ছেলে!
একপাশের দেয়ালজুড়ে বিশাল একটা আয়না
ঝোলানো। তার ফ্রেমে দুর্বোধ্য সব প্রাচীন
নকশা কাটা! কে মুখ দেখত এই আয়নায়?

ঘরের কোনার দিকটায় মাঝারি আকৃতির
একখানা ভয়ঙ্করদর্শন মূর্তি। এই আধো
অঙ্কর্কারে সেটা মানুষ নাকি অন্য কোন প্রণীর
প্রতিমা, সেটা স্পষ্ট ঠাহর করা গেল না।
মূর্তিটির সামনেই একটা গোল বেদী মতন
জায়গা। এখানেই যে নানা উপাচার সাজিয়ে
নৈবেদ্য নিবেদন করা হত অপদেবতাকে, সেটা
বেশ বৃক্ষতে পারছি।

হঠাতে মনে হলো কে যেন তাকিয়ে আছে
আমার দিকে। চট করে ইতি-উতি মুখ তুলে
চাইলাম। চোখ পড়ল দেয়ালে নিচুপ বসে
থাকা একটা টিকটিকির উপর। স্থির দৃষ্টিতে
আমার দিকে তাকিয়ে আছে ওটা। টিকটিকিই
তো, নাকি তক্ষক ওটা? দৃষ্টি দিয়েই আমার রক্ত
শৈবে নিছে না তো ব্যাটা!?

পরক্ষণে আমার পিছনের দরজায় কড়া
নাড়ার শব্দ হতেই, জ্বালায় জ্বে একেবারে
বরফ হয়ে গেলাম। ভয়ে অস্তরাত্মা কেঁপে উঠল
আমার। বহুক্ষে নিজের উপর অনেকখানি
জোর খাটিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলাম পিছন
দিকে। কেউ নেই সেখানে! শুধু হাট করে
খালা শূন্য দরজাটা আমার দিকে তাকিয়ে
উপহাস করছে যেন!

আচমকা দেয়ালের আয়নাটার দিকে চোখ
পড়তেই দুঃখের বিক্ষারিত হবার উপক্রম হলো
আমার! সেটা আর খালি নেই এখন, সেখানে

এসে দাঁড়িয়েছেন একজন বৃক্ষ লোক! কেউ
বলে দেয়ানি আমাকে, তবুও স্পষ্ট বুঝতে
পারলাম আমি, ইনিই আমার বন্ধুটির সেই
হারিয়ে যাওয়া দাদা!

আমার দিকে তাকিয়ে মন্দু হাসলেন
তিনি। তারপর হাত নেড়ে ইশারা করলেন,
যেন আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর দিকে এগিয়ে
যাবার! সে আহ্বানে ভয়ের লেশমাত্রও ছিল
না। তবুও তীব্র আভক্ষের স্রোত নেমে গেল
আমার শিরদাঁড়া বেয়ে! বুকের বাঁচায় ধড়াস
করে লাফ দিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ডটা। যেন পিঞ্জর
তেঙ্গে বেরিয়ে পড়তে চাইছে!

আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস রইল
না আমার। পড়িমিরি করে ছুট লাগলাম।
বেরোতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে একটা রাম
হোচ্চে খেলাম, চিংপটাং হয়ে পড়লাম
মেরেতে।

সে রাতে কীভাবে যে আমি নীচতলায়
নিজের রুমে এসেছিলাম, সেটা নিজেও জানি
না! পরদিন সকালে প্রচও জর নিয়ে বাসায়
ফিরলাম। সে রাতে যা যা ঘটেছে, তার সঠিক
কোন বাখ্য মোটেও নেই আমার কাছে। শুধু
জানি, প্রচও ভয় পেয়েছিলাম আমি। সেই সাথে
অশৰীরীদের সাথে সাক্ষাতের খায়েগও মিটে
গেছে চিরতরে!

এরপর থেকে কেউ আমাকে ভূত-প্রেতের
গল্প শোনাতে এলে খুশি হবার বদলে প্রচও
বিরক্ষ হই আমি। কী দরকার বাপু ওদের নিয়ে
ঘাঁটাঘাঁটি করার?

রিপিটার

মুখ ব্যাদান করে কাউষ্টারে বসে আছে মিক
কার্টার। সেই বিকেল থেকে তুষার বারছে,
এখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমে এলেও থামবার
নায়টিও করছে না! বাইরের শুমোট প্রকৃতির
মত মন্টাও ভার হয়ে আছে মিকের। এই
বেলায় একজন খন্দেরও জোটেনি, ফুটোকড়িও
আমদানি হয়নি দোকানে। মন ভাল থাকেই বা
কেমন করে?

এমনিতেই পুরানো অ্যাটিক শপগুলোর
বেহাল দশা, ক্রেতা নেই তেমন একটা।
আজকালকার বাজারে প্রায় সবারই তো নুন

ଆନତେ „ପାଞ୍ଚ ଫୁରାୟ, ସୌଖ୍ୟନତାର ସୁଯୋଗ କେଥାୟ?

ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାହକରା ମିକେର ମତ ଛୋଟ ଦୋକାନଗୁଲୋ ପାଯେର ଧୁଲୋ ଦେନ ନା କଥନାନ୍ତି, ତାରା ସରାସରି ଡିଲାରଦେର କାହିଁ ଥେକେ ସଂଗ୍ରାହ କରେ ନେଣ ଦୁଷ୍ଟାପ୍ୟ ସବ ଅୟାଟିକ ଜିନିସ । ତବୁଣ୍ଡ କୋନମତେ ଥେଯେ ପରେ ଦିନ ଚଳେଇ ଯାଏ, ଜୀବନ ଚାଲାନୋ କଠିନ ହେଲେ ଓ ଅସମ୍ଭବ ନୟ ମିକେର ମତ ଦୋକାନୀଦେର । ଅନ୍ତରିବିତର ଯେତୁକୁ ବେଚାକିନି ହୟ, ସେଟୁକୁ ନିଯେଇ ସଞ୍ଚିତ ଥାକେ ତାରା ।

ତା ଛାଡ଼ି ଯାଏ ଏହି ପେଶାଯ ଆହେ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକେରଇ ରୟେଛେ ଅୟାଟିକେର ପ୍ରତି ଦୂରିବାର ଆକର୍ଷଣ । ଏବେ ପୁରାନୋ ଜିନିସଗୁଲୋଇ ତାଦେର, ବେଚେ ଥାକାର ଆଗଶିକ୍ଷି ଯୋଗାଯ, ନେଶାତ୍ର କରେ ତୋଲେ । ଏ ପେଶା ଥେକେ ସରିଯେ ନିଲେ ନିଃଶ୍ଵରେହେ ତାଦେର କାହିଁ ବେଚେ ଥାକଟା ଅଥିନ ମନେ ହବେ! ତାଇ ତୋ ପୁରାନୋ ଜିନିସେ ବୋଧାଇ ଜରାଜିର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦୋକାନଗୁଲୋକେ ଧିରେଇ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୟ କିନ୍ତୁ ମାନୁଷେର ଜୀବନଜୀବିକା । ଆଶପାଶେର ସବକଟି ଦୋକାନ ଇତୋମଧ୍ୟେଇ ବନ୍ଦ ହୟ ଗେଛେ । ସଙ୍କ୍ୟା ନାମତେଇ ଯେ ଯାର ଦୋକାନରେ ଝାପ ଫେଲେ ବାଡ଼ିର ପଥ ଧରେଛେ ଦୋକାନୀର । ଗୋଟା ମର୍କେଟେ କେବଲମାତ୍ର ମିକେର ସୁପାର୍ଚ ଦୋକାନଟାଇ ଏଥନାନ୍ତି ଖୋଲା । ଚିରକୁମାର ମିକେର ଜନ୍ୟ ଘରେ ଅପେକ୍ଷାଯ ନେଇ କୋଣ ସୁନ୍ଦରୀ-ରମଣୀ, ତାଇ ଫେରାର ତାଡ଼ାଓ ନେଇ ତାର । ଏରଚେଯେ ବରଂ ଯତକ୍ଷଣ ଦୋକାନେ ଥାକେ ତତକ୍ଷଣେଇ ସମ୍ଯାଟା ଭାଲ କାଟେ ମିକେର । ଛୋଟବଡ଼ ଅୟାଟିକଗୁଲୋକେ ବଡ଼ ଆପନ ମନେ ହ୍ୟ ।

ଏକା-ଏକା ବସେ ଥାକତେ-ଥାକତେ ବିରଙ୍ଗ ହୟ ଉଠିଲ ମିକ । କାହାତକ ଆର ନିର୍ବିକାର ବସେ ଥେକେ ତୁରାପାତ ଦେଖା ଯାଏ? ଓ ସଥନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରେ ଘରେ ଫେରାର କଥା ଭାବରେ, ଠିକ ତଥନିଇ ଏଲ ଲୋକଟା ।

ଦୂମଡ଼ାଳେ ଯୋଚଡ଼ାଳେ ଏକଥାନା ପୁରାନୋ ଓ ଭାରକୋଟ ଗାୟେ ଲୋକଟାର, ତାତେଓ ଆବାର ଗୋଟା କରେକ ତାଲି ଦେଇ । ଗଲାର ମାଫଲାରଟା ଶେଷ କରେ ଯେ ଧୋରା ହୟେଛେ, ସେ କଥା କେବଲମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଇ ଜାନେନ! ମୁସେ ଏକଗାଦା ଦାଡ଼ି ପୋଫେର ଜଙ୍ଗଳ, କୋନଦିନ କୁରେର ହୋଇ ପେହେବେ ବଲେ ମନେ ହ୍ୟ ନା!

ଲୋକଟା କାହିଁ ଏସେ ଦାଢ଼ାତେଇ ଏକଟା

ବୋଟକା ଗନ୍ଧ ଭକ କରେ ଏସେ ଧାକା ମାରଲ ମିକେର ନାକେ । ଖାନିକଟା ପିଛେୟେ ଯେତେ ବାଧୁ ହଲୋ ନେ । ମନେ-ମନେ ଲୋକଟାର ପିଣ୍ଡ ଚଟକାଛେ, ବ୍ୟାଟା ଖବିଶ କୋଥାକାର । ଗୋଲ ନାମେର ବ୍ୟାପାରଟାର କଥା ବୋଧ୍ୟ ଜାନାଇ ନେଇ ବ୍ୟାଟାର!

କାଉଟାରେର ସାମନେ ଦାଢ଼ିଯେ ଚାରଦିକେ ଏକବାର ଚୋଖ ବୁଲିଯେ ନିଲ ଲୋକଟା । ତାରପର ଓଭାରକୋଟେ ଭିତରେ ପକ୍ଷେଟେ ହାତ ତୁକିଯିୟ ଏକଥାନା ମୟଳା କାପଡ଼େର ପୁଟଲି ବେର କରେ ଆନଳ ।

ମନେର ଗଭିରେ ସନ୍ଦେହ ଦାନା ବାଁଧିଲ ମିକେର, ହାବତାବ ବିଶେଷ ସ୍ଵିଧେର ନୟ ଲୋକଟାର । କୋଥାଓ ଥେକେ ଚାରି-ଟୁରି କରେ ଆନେନି ତୋ କିଛି? ମୁସେ ଅବଶ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତାବ ବଜାୟ ରାଖିଲ ମେ । ଦେଖାଇ ଯାକଣା ବ୍ୟାଟାର ପୁଟଲିର ପ୍ୟାଚେର ଭିତର ଥେକେ କୀ ବେର ହ୍ୟ । ସାଧାରଣତ ଚୋର-ଛ୍ୟାଚୋରାଇ ତାର କାହିଁ ରାତର ଦିକେ ଜିନିସପତ୍ର ବେଚତେ ଆସେ । ଏଦେର କାହିଁ ଥେକେ ନାମାତା ମୁଲେ ବେଶ ଭାଲ ମାଲାମାଲ ସହଜେଇ ବାଗିଯେ ନେଇ ଯାଏ । ଏ ଲାଇନେ ଦୀର୍ଘକାଳେର ଅଭିଭାବ୍ୟ ଏଟାଇ ଦେଖେ ଏସେହେ ମିକ । ଗଭିର ରାତ ଅବଧି ତାର ଦୋକାନ ଖୋଲା ରାଖାର ଏଟାଓ ଏକଟା କାରଣ ବଟେ!

ମାଲେର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକାନା ନିଯେ କଷଣୋ ମାଥା ଘାମାଯ ନା ମେ, ଦେଖେ କେବଲ ଜିନିସଟାର ଗୁଣମାନ । ମାଲ ଚୋରାଇ କିନା, ତାତେ ତାର କୀ ଆସେ ଯାଏ? ଚୋରାଇ ହଲେଇ ବରଞ୍ଚ ଖାନିକଟା ବେଶି ଲାଭେର ଏକଟା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହ୍ୟ । କାରଣ ଚୋରଦେର ଧରା ପଡ଼ାର ଭୟ ଥାକେ, ତାଇ ତାର ଯତ ଦ୍ରୁତ ସମ୍ଭବ ମାଲାମାଲ ହତ୍ସତର କରେ କିନ୍ତୁ ନଗଦ ଅର୍ଥ ବାଗିଯେ ନିତେ ଚାଯ । ତାଦେର ସାଥେ ବାଗିଜୋର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏହି ସୁଯୋଗଟାଇ ସବସମୟ କାଜେ ଲାଗାଯ ମିକ!

ଲୋକଟାର ପୁଟଲି ଥେକେ ବେରୋଲ ଏକଥାନା ପୁରାନୋ ଆମଲେର ଟେବିଲ ଘଡ଼ି । ଛୋଟ, ଗୋଲ । ଏକକାଳେ ହୟତୋ ରଙ୍ଗଟା ସୋନାଲିଇ ଛିଲ, ତବେ କାଳେର ଧକଳେ ଏଥନ ସେଟା କିନ୍ତୁ କାଳଚେ ହୟେ ଗେଛେ । କାଟାଗୁଲୋ ହିର ହୟେ ଆହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୋପୁରି ଅଚଳ, ସଠିକ ସମୟ ଜାନାନୋର ମୁରୋଦ ନେଇ ଆର । ପିଛନ ଦିକଟାର ଦୁଟୋ ଚାବି, ଏନ୍ଦିକ-ଓଦିକ ଘୋରାନୋ ଯାଏ । ଏଦେର ସାହାଯ୍ୟେଇ ଏକକାଳେ ଘଡ଼ିଟାକେ ସଚଲ ରାଖୋ ହିତ । ଏହେ

ঘড়ি খুব একটা দৰ্জন নয়, তাই বাজারে কদৱে তেমন নেই। তা ছাড়া সংগ্রাহকরা খোজে সচল ঘড়ি, অথবা এর অবস্থা দেখে মনে হয় না যে একে আর কোনদিনও চালানো যাবে।

মিকের চেহারায় স্পষ্ট অনাগ্রহ দেখতে পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠল আগন্তুক। তড়িঘড়ি করে বলল, ‘ঘড়িটা চীনের একটা সমাধি থেকে পাওয়া।’

অবশ্য এতেও খুব একটা স্ফতিবৃদ্ধি হলো বলে মনে হয় না! আগের মতই খিম মেরে বইল মিক।

চীনের সমাধি থেকে পাওয়া ঘড়ি এমন কোন মহার্ঘ বন্ধ নয় যে, শুনেই তিড়ি়-বিড়ি় করে লাফাতে হবে। আজকাল হৰহামেই এগুলো পাওয়া যাচ্ছে, যার বেশিরভাগই অবশ্য শেষপর্যন্ত নকল প্রতিপন্ন হয়। তাই বারংবার ঠক শেয়ে সংগ্রাহকরাও চীনের ঘড়ির প্রতি আগ্রহ হারিয়েছে।

অবশ্যে লোকটা তার ঝুলির সেরা বোমাটা ফাটো! ‘ঘড়িটা সোনার তৈরি।’

এবারে কাজ হলো। বাট করে সোজা হয়ে বসল মিক কার্টার। আগ্রহ নিয়ে হাত বাড়াল ঘড়িটার দিকে। হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাল করে নেড়েচেড়ে পরুখ করল। তারপর আগন্তুকের অনুমতি নিয়ে ঘড়িটাসুন্দ গিয়ে চুকল দোকানের পিছনের কামরাটায়। মিকের নিজস্ব ছোট গবেষণাগারটা ওখানেই।

খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এল মিক, দু'চোখে উভেজনা ঠিকরে পড়ছে। যিথে বলেনি লোকটা, ঘড়িটা আদতেই পুরোদস্তর সোনার তৈরি। অবশ্য ভিতরে-ভিতরে খানিকটা হতাশাও বোধ করছে মিক। ঘড়িটা রাখা সম্ভব হবে না তার পক্ষে, অত নগদ টাকা নেই আজ দোকানে। সারাদিন বিক্রিই হয়নি তেমন কিছু খাকবে কোথেকে?

বিনয়ের সাথে সেকথাই লোকটাকে জানাল সে। সেই সাথে তার সময় নষ্ট করার জন্য ক্ষমাও প্রার্থনা করল। তৎক্ষণাত মিককে অবাক করে দিয়ে অবিশ্বাস্য কম ম্যালেই ঘড়িটা বেচতে রাজি হয়ে গেল লোকটা! মিকের প্রশ্নের জবাবে জানাল, আজ রাতেই নগদ টাকাটা দরকারি তার, তাই যা পায় তা-ই সই! আর

যেহেতু অন্য সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, তাই এ ছাড়া আর কোন উপায়ও তো নেই।

মিক তখন পরদিন সকালে এসে বাকি টাকাটা নিয়ে যেতে বলল লোকটাকে। তবে লোকটা জানাল, তা আর সম্ভব নয় কোনমতেই! আজ রাতেই চিরতরে এই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে!

খানিকটা অবাক হলেও ব্যাপারটা নিয়ে আর তেমন বাড়াবাড়ি করল না মিক। কেউ যদি সম্ভায় তার কাছে কিছু বেচতে চায়, তা হলে সে বাধা দেবে কেন? দোকানে খেটুক ছিল, সবটুকু নগদ অথবা সে তুলে দিল লোকটার হাতে। এতেও অবশ্য ঘড়িটার প্রকৃত দামের দশভাগের এক ভাগও পরিশোধ করা সম্ভব হলো না!

যাবাব সময় লোকটা বলল, ‘খুব বেশি সময় ঘড়িটা নিজের কাছে রাখতে যেয়ো না, মিস্টার! যত দ্রুত পার, কোন নির্বোধের কাছে বেচে দিয়ো। জানো তো, নির্বোধের কোতুহল কম থাকে, তাই তারা বেচে থাকে যেলা দিন!’ বলেই লোকটা চলে গেল, চাকিতেই হারিয়ে গেল অঙ্ককারাচ্ছন্ন তৃষ্ণারটাকা পথে!

কয়েক মুহূর্ত বিমৃঢ় হয়ে বসে রাইল মিক। একথা বলে গেল কেন লোকটা? ঘড়িটা কি চোরাই মাল? এজন্যই কি বেশিক্ষণ নিজের কাছে রাখতে মানা করল সে? খুব ছাই, চোরাই মাল হলেই বা কী আসে যায় তার! এসবের থোড়াই পরোয়া করে এই মিক কার্টার। পরদিন সকালেই ঘড়িটা নিয়ে বসল মিক। পিছনের চাবিদুটো আচ্ছামতন ঘুরাল। যদি দৈবক্রমে ঘড়িটা চালু হয়ে যায়, সেই আশায়। কিন্তু যারপরনাই হতাশ হতে হলো তাকে, প্রাণের কোন স্পন্দনই দেখা গেল না ওটার মধ্যে!

তবে গুঁতোগুঁতি করতে গিয়ে নীচের দিকে ছোট-ছোট দুটো নব আবিক্ষার করল মিক। কী কাজ এদের?

অবশ্য একটায় হাত রেখে খানিকটা মোচড় দিতেই ও বুঁৰো গেল কী জন্য বানানো হয়েছে এটাকে। ঘড়ির কাঁটাগুলো ঘুরিয়ে সময় সমর্পণ করা হয় এর সাহায্যে।

মুচকি হেসে নিজের হাতঘড়িটার সাথে সময় মিলিয়ে ঠিক করে দিল মিক। সকাল

নয়টা। কথায় আছে, প্রতিটা নষ্ট ঘড়িও দিনে
অস্তত দুইবার সঠিক সময় দেখায়! সে হিসেবে
এখন অস্তত সঠিক সময় দেখাচ্ছে ওটা!

আরেকটা নব দিয়ে ভিতরের ছোট একটা
বাড়তি কাটা ঘোরানো যায়। সেকেও, মিনিট
এবং ঘট্টার কাটাগুলোর রঙ সোনালি হলেও,
এই বাড়তি কাটাটার রঙ লাল। কী কাজ হয়
এটা দিয়ে? যালার্ম নাকি? বা ব্রাবাহ!

হাসতে-হাসতেই আপনমনে সাত
সংখ্যাটার উপর কাটাটা এনে রাখল মিক।
সকাল সাতটায় সাধারণত ঘুম থেকে জেগে
ওঠে সে, ডিনারও করে সক্ষ্য সাতটায়! দেখা
যাক, মাকাতা আমলের অচল ঘড়িটা কী কর্তব্য
পালন করে!

নবটা থেকে হাতটা সরাতেই আচমকা
ঘড়িটার পিছন দিকের একটা অংশ ভিতরের
দিকে দেবে যেতে শুরু করল! বেরিয়ে পড়ল
ছেটে একটা গোপন কুরুরি!

শুভিত মিক সেখানে একখানা গোল করে
মোড়ানো কাগজ দেখতে পেল। কীসের কাগজ
এটা? পুরানো কোন রাজবাজারের লুকানো
ধনভাণ্ডারের গোপন নকশা নয়তো?

অতি সাবধানে কাগজটা খুলল মিক।
কালের আবর্তে কাগজটা একেবারে জরাজীর্ণ,
মাজুক হয়ে আছে। একটু এদিক-সেদিক
হলেই ছিঁড়ে যাবে, এমন দশা!

কাগজটা খোলার পর মেজাজটা
একেবারে খিচড়ে গেল মিকের। বিজাতীয়
ভাষায় কুসিব যেন লেখা ওডে! লেখা না বলে
অবশ্য কিছু এলোমেলো আকিবুকি বলাই
ভাল। এর মর্ম উদ্ধার করে কার বাপের সাধ্য!
তবে কি সাতরাজার ধন হাতের মুঠোয় এসেও
অধুরাই রয়ে যাবে? হতাশায় বীতিমত মাথার
চুল ছিড়তে ইচ্ছে হলো তার। গোমড়া মুখে
সেখানেই বসে রইল মিক।

পরক্ষণেই কী একটা মনে পড়ায় চোখমুখ
উজ্জল হয়ে উঠল তার! আশার আলো দেখতে
পাচ্ছে সে। প্রফেসর জোসেফ! কাছেই থাকেন
ভদ্রলোক। পুরিবীর বহু ভাসার উপর তার
অগাধ দখল। বিশেষ করে হারিয়ে যাওয়া
প্রাচীন জনগোষ্ঠীগুলোর ভাসার উপর। প্রায়ই
ভদ্রলোক ভাষা বিষয়ক বক্তৃতা করতে দেশ-

বিদেশের বিভিন্ন সম্মেলনে যান। তাঁর কাছে
গেলে নিষ্ঠয়ই একটা উপায় মিলবে।

দেরি করার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পেল
না মিক। তক্ষুণি ছুটে গেল প্রফেসর সাহেবের
ডেরায়। কপাল ভাল তার, আরেকটু দেরি
হলেই প্রফেসর জোসেফ বেরিয়ে পড়তেন,
ভাস্তিতে ক্লাস আছে তাঁর।

কাগজটা দেখে বিস্ময়ে চোখ বড়-বড়
হয়ে গেল প্রফেসর সাহেবের। ভাষাটা বহু
প্রাচীন হলেও মোটেও অপরিচিত নয় তাঁর
কাছে।

‘এ কাগজটা তুমি কোথায় পেলে, মিক?
বহুকাল আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া চীমের একটা
ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ভাষা ছিল এটা। এদের কিছুই
তেমন একটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুরো
সম্প্রদায় রহস্যজনকভাবে বেমালুম গায়েব
হয়ে গিয়েছিল।’

জবাব দেবার আগে কয়েক মুহূর্ত ভেবে
নিল মিক। সোনার ঘড়িটার কথা কি প্রফেসর
সাহেবকে বলাটা ঠিক হবে? যদি সত্যিই কোন
গুণধনের ব্যাপার থেকে থাকে, তা হলে যদি
ভদ্রলোক এর ভাগ চেয়ে বসেন?

তাই আপাতত তাঁকে ঘড়িটার কথা না
জানানোই মঙ্গল মনে করল মিক। বলল,
‘পুরানো এক বস্তা মালের চালানের দীচে
পেয়েছি, প্রফেসর সাহেবে। লেখাগুলো দেখে
কৌতুহল হলো, তাই আপনার কাছে নিয়ে
এলাম। যদি বলে দেন, ঠিক কী লেখা আছে
কাগজটায়, তা হলে মনে আনিকটা শান্তি পাব,
এই আর কী! ’

অবিশ্বাস করলেন না প্রফেসর জোসেফ।
তাঁর জানা আছে মিকের অ্যাস্টিক ব্যবস্থার
কথা। টুকিটাকি দুঃ�েকটা পছন্দের জিনিস
তিনি নিজেও কিনেছেন মিকের দোকান থেকে।
দোকানটা ছোট হলেও বেশ সমৃদ্ধ।

‘এখন তো কাগজটা করতে পারব না,
মিক, দুঃখিত। আমাকে এখনই একটা জরুরি
ক্লাস নিতে ভাস্তিত যেতে হবে। তা ছাড়া
বহুকাল ভাষাটার চৰ্চাও করা হয় না, তাই
বিভিন্ন রেফারেন্স ষেটে-ষেটে তবেই অনুবাদটা
করতে হবে। ব্যাপারটা বেশ সময়সাপেক্ষ।
তুমি বরং সক্ষ্যার দিকে একবার এসো,

একসাথে চা খাব আমরা। আশা করি এরমধ্যে
কাজটাও হয়ে যাবে।'

অপেক্ষায় থাকার ব্যাপারটা তাল লাগল
না মিকের। তবে আপাতত তার আর কিছু
করারও নেই। তাই প্রফেসর সাহেবকে
ধন্যবাদ জানিয়ে তখনকার মত বিদায় নিল ও।

সারাটা দিনই একরকম অস্থিরতার মধ্যে
কাটল তার! কী লেখা আছে কাগজটায়, এটা
না জানা পর্যন্ত কিছুতেই স্পষ্ট পাচ্ছে না সে।
অবশ্যে সত্যিই কি কগাল খুলতে চলেছে
তার? আচমকা ধৰী লোক হয়ে গেলে কী
করবে সে এত টাকা দিয়ে? প্রথমেই প্রাচ্যের
দেশগুলো ভ্রমণে গেলে কেমন হয়?

অপেক্ষার প্রহর যত দীর্ঘই হোক না কেন,
একসময় সেটা ঠিকই শেষ হয়। সন্ধ্যা সাড়ে
ছয়টা নাগাদ প্রফেসর জোসেফের বাসার সদর
দরজায় পৌছে গেল মিক।

তাকে হরেক পদের নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন
করা হলো। তবে অতিরিক্ত উভেজনায় কিছুই
তেমন খেতে পারল না ও। সামান্য কিছু মুখে
গুঁজেই এক কাপ চা টেনে নিল।

অবশ্যে বললেন প্রফেসর সৃষ্টিরে,
'কাজটা খুবই কষ্টসাধ্য হলেও, শেষ করতে
পেরেছি আমি। অনেকদিন পর তোমার
বদোলতে একটা বিলুপ্ত ভাষার চৰ্চা আবার
করার সুযোগটা পেলাম। এজন্য তোমাকে
অনেক ধন্যবাদ, মিক।'

মিকের অবশ্য তখন এসব সৌজন্য
উপভোগের মত অবস্থা নেই, উভেজনায় কিছুটা
সামনে ঝুঁকে এল সে। 'কোন শুণ্ধনের
ব্যাপারে কিছু কি বলা আছে কাগজটায়?'

খানিকটা অবাক হলেন প্রফেসর
জোসেফ! মিক কি তা হলে কোন ধনরত্নের
হিসিস পাবার আশায় ছিল? 'তোমাকে হতাশ
করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত, মিক। তবে

কাগজটায় তেমন কোন কিছু লেখা নেই। বরঞ্চ
বলা আছে, একটা অস্তুত ঘড়ির কথা। যেটা সে
যুগের তাত্ত্বিকরা কালো জাদুতে প্রায়ই ব্যবহার
করত।'

ভিতরের গভীর হতাশা কিছুতেই বাইরে
চাপা দিতে পারল না মিক। মুখচোখ বিকৃত
করে সোফায় হেলান দিল। উভেজনা কেটে
যেতেই ভীষণরকম ক্লান্ত লাগছে তার।

প্রফেসর জোসেফ বলে চললেন, 'ব্র্যাক
ম্যাজিশিয়ানরা ঘড়িটাকে বলত দেখ ওয়াচ!'
অসঙ্গে রকমের ক্ষমতাবান ছিল ঘড়িটা।
অনেকেরই প্রাণ নিয়েছে ওটা। একটা লাল
কাঁটায় সময় বেঁধে দিয়ে শক্তির বাড়িতে মেঝে
আসলেই হলো। বাকি কাজ ঘড়িটা নিজেই
সেরে নিত। ঠিক করে দেয়া নির্দিষ্ট সময়ে প্রাণ
নিয়ে নিত গৃহকর্তার! বড় বীভৎস ছিল সে
মৃত্যু।'

হঠাৎ কী একটা মনে পড়ায় আতঙ্কে জ্যে
গেল মিক! লাল কাঁটাটা আজ সকালে নিজ
হাতে ঘুরিয়ে সে সাতটায় রেখেছিল। আর
ঘড়িটা এখন তারই ঘরের আলমারিতে রাখা
আছে! গুরুত্বপূর্ণ ভোবে, দোকান থেকে এনে
বাড়িতে রেখেছিল ওটা মিক। এতকাল পরও
কি ঘড়িটার প্রাণ নেবার ক্ষমতা বহাল আছে?

জবাব পেতে অবশ্য খুব একটা দেবি
হলো না। প্রফেসর সাহেবের বিশালাকার
দেয়াল ঘড়িটা ঢং ঢং করে সাতটা বাজার
সংকেত দিল। প্রবক্ষণেই বিশ্বিত প্রফেসরের
চোখের সামনে মিকের পোটা দেহটা দ্রুত নীল
হয়ে গেল! মিকের জিভটা আর চোখদুটো যেন
কেটের ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এখনই! ঘড়ঘড়
শব্দ বেরোতে শুরু করল তার গলা দিয়ে। যেন
এখনই কোন ধারাল অস্ত দিয়ে জবাই করা
হয়েছে তাকে। দেখতে-দেখতে তার শরীরের
কয়েক জায়গায় কেটে পিয়ে তয়ক্ষর রূপ ধারণ

মেসার্স আমীর এণ্ড সন্স

এখনে মাসিক রহস্যপত্রিকা বিক্রি করা হয়

৫৯/৩/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

মোবাইল: ০১৭১১১৩৭৮৫১, ০১৬১১১৩৭৮৫১

ফোন: ৯৫৫৬৮৪৮, ৭১১১৩৭২

করল গোটা দেহটা! ঠিক এমনি করেই চৈত্রে
প্রচও দাবদাহে ফেঁটে চৌচির হয়ে যায় ফসলের
মাঠ। ফোয়ারার মত রক্ত বরতে শুরু করল
ফাটলগুলো দিয়ে!

মৃত্যুঘড়ি বহুকাল বাদেও তার ক্ষমতা
জাহির করতে ছাড়ল না! তার তালিকায় যুক্ত
হলো আরেকটি নাম-মিক কাটাৰ!

অঙ্গজ

বিকেল গড়ালেই আজকাল মনের গভীরে ঘরে
ফেরার তাগাদা অনুভব করে জালাল মিয়া।
সাঁৰ ঘনালেই সেই আকৃতি একলাকে বেড়ে
যায় বহুগুণে। তাই পারতপক্ষে সন্ধ্যাৰ পৰি
বাইরে থাকতে চায় না সে। বারবার মনে হতে
থাকে, ঘরে পোয়াতি বউটা একা, সে আবার
অঙ্গকারকে ভীষণ তয় পায়। তাই চট্টজলদি
বাঢ়ি ফিরে আসে জালাল। তাকে কিরতে
দেখলে ভয়ে চোখমুখ শুকিয়ে আসা রহিমাৰ
চেহারায়ও রঙ ফিরে আসে।

জালাল পেশায় একজন রিঙ্গাচালক।
তবে রিঙ্গাটা তার নিজের নয়, মালিকের কাছ
থেকে রোজকাৰ হিসেবে ভাড়া নিয়ে চালায়
সে। প্রতিদিনকার আয় থেকে মালিকের ভাড়া
মিটিয়ে দেবার পর খুব একটা টাকা অবশিষ্ট
থাকে না তার হাতে। তবে যেটুকু থাকে, তা
দিয়েই দু'জনের সংসারটাকে ঠেলেঠেলে
চালানো যায়। আল্লাহুক্রান্ত খুব বেশি চাওয়া
নেই, তাই দিন শেষে নিজেকে সুবীই মনে হয়
জালালের।

অবশ্য সংসার শুরু প্রথমদিকে অনেক
রাত অবধি রিঙ্গা চালাত জালাল। প্যাডেল
ঘূরলেই যখন টাকা আসছে, তখন জোয়ান মৰ্দ
ছেলে অকারণে ঘরে বসে থাকবে কেন? তা
ছাড়া রাতের বেলায় তুলনামূলক বেশিই ভাড়া
পাওয়া যায় দিনের চেয়ে। তাই উদয়ান্ত
পরিশ্রম করতে এতটুকুও কার্পণ্য করত না
জালাল।

তার উপর সংসার জীবনে তখনও অভ্যন্ত
হয়ে উঠতে পারেনি সে। সদ্য কৈশোর
পেরোনো রহিমাৰ সাথে একই ঘরে সময়
কাটাতে কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা লাগত তার!
চিরকাল একাকী জীবন কাটানোৰ ফল। তাই

যতটা সম্ভব ঘরেৰ বাইরে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য
বোধ কৰত সে।

তবে সহসাই নিজেৰ এহেন জীবনধাৰা
পাট্টাতে বাধ্য হয়েছিল জালাল। ঘুমোতে
যাবার আগে বহু ভণিতাৰ পৰ সলজ রহিমা
মেদিন তাকে জানিয়েছিল, মা হতে চলেছে সে,
খুঁশিতে একেবাবে পাগলপাৰা হয়ে গিয়েছিল
সে। ঝট কৰে জড়িয়ে ধৰেছিল রহিমাকে।
চুমোয়-চুমোয় রীতিমত অস্তিৰ কৰে তুলেছিল
তাকে। সেদিনই এক নিমিষে দূৰ হয়ে
গিয়েছিল তাদেৱ মধ্যকাৰ সমষ্টি সংকোচ, সে
জায়গায় ঠাই নিয়েছিল একৰাশ ভালবাসা।

তারপৰ থেকেই যথাসম্ভৱ দ্রুত বাঢ়ি
ফিরতে শুরু কৰল জালাল। খালি হাতে বাঢ়ি
ফেৰাব স্বভাব নেই তার মোটেও। রোজ সে
দৈনন্দিন বাজাৰেৰ পাশাপাশি গভৰ্বতী স্ত্ৰী
জন্ম নিয়ে আসে রকমাৰি ফল-ফলাদি।
সামৰ্থ্যেৰ ঘাটতিৰ কাৰণে যদি বা কখনও
আঙ্গুৰ, কমলা আনতে না পাৰে, এক হালি
পেয়াৰা অথবা গোটা দুই ডালিম আনতে
কক্ষণেও ভুল হয় না তার।

পোয়াতি মেয়েদেৱ আলাদা যত্নআন্তি
কৰতে হয়, একথা তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ ডাঙাৰ
আপা খুব ভাল কৰে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রহিমাৰ
দেহেৰ ভিতৰ তিল-তিল কৰে বেড়ে উঠেছে
আৱেকটি শৰীৰ, তাই তার চাই বাড়তি খৰাবাৰ,
চাই বাড়তি যত্ন, একথা কি আৱ জালাল বোঝে
না? বোঝে সে।

তাই তো নিজেৰ ক্ষুদ্ৰ সামৰ্থ্যে, সবটুকু
উজাড় কৰে রহিমাৰ যত্নআন্তিৰ দিকে নজিৰ
দিয়েছে সে।

নিজে বিস্তাৰ চড়িয়ে নিয়মিত তাকে
স্বাস্থ্য-পৰীক্ষা কৰতে নিয়ে যায় জালাল।
ডাঙাৰ আপাৰ সব কথা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে
চলতে রহিমাকে রীতিমত বাধ্য কৰে সে।

রহিমাকে যেন ঘৰেৰ ভাৱী কাজগুলো
কৰতে না হয়, এজন্য একজন ঠিকা বুয়াৰ
ব্যবস্থাও কৰেছে সে। সকাল-সকাল এসে
ঘৰেৰ যত ভাৱী কাজ, সব কৰে দিয়ে যায়
বুয়াটা। এ নিয়ে অবশ্য জালালকে
প্রতিবেশীদেৱ নানাবকম উপহাস সহ্য কৰতে
হয়েছে। অনেকেই মুখ বাঁকিয়ে বলেছে,

গরিবের ঘোড়ারোগ ভাল নয় মোটেও। নানাজনের কানকথা শুনতে-শুনতে রহিমা পর্যন্ত তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে। ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছে বুয়াকে, ঘরের কাজ সে-একাই করতে পারবে, দূরকার নেই বাড়িত পয়সা নষ্ট করার। দুখানাই তো মোটে ঘর ওদের। তবে কারও কথায় মোটেও কর্ণপাত করেনি জালাল। একঙ্গের মতন বলেছে, বউ আমার, সন্তান আমার, টাকাও আমার। তা হলে অন্যের কথা শুনতে যাব কোন দুঃখে?

একথার পর আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে রহিমার? তাই বেচারি তৎক্ষণাত চুপ মেরে গেছে। মনে-মনে স্বামীর ভালবাসার গভীরতা বুঝতে পেরে খুশিতে ডগমগ হয়েছে। আবার খালিক বাদে অকারণেই শক্তি হয়েছে, এত সুখ সহিবে কি তার কপালে?

এক সন্ধ্যায় বাড়ি ছিরে খালিকটা অবাক হলো জালাল। ঘরটা অঙ্ককার, বাতি জালেনি রহিমা। অথচ এমনটা কখনও হয় না, বিকেল গড়ালেই ঘরের সবকটা বাতি জ্বলে দেয় সে, আধাৰকে ভীষণ ভয় পায় কিম।

তা ছাড়া সন্ধ্যায় ঘর অঙ্ককার থাকলে গৃহকর্তার অমঙ্গল হয়, এমনটাই বিশ্বাস করে সে। তা হলে? কোথাও কি বেড়াতে গেছে রহিমা? আশ্পাশের ভাবাদের কারও ঘরে বসে আজড়া দিচ্ছে না তো? ভাবতে ভাবতেই ঘরে ঢেকে জালাল। সুইচ টিপে বাতিগুলো জ্বলে দেয়। পরক্ষেই রীতিমত চকমে ওঠে জালাল। একখালি চাদর গায়ে জড়িয়ে, খাটের কোনায় গুটিসুটি মেরে বসে আছে রহিমা! মাথাভর্তি কালো চুলগুলো পিঠিয়ে ছড়ানো। চোখগুলো বজ্জল, মূখটা উকিয়ে আধাখানা হয়ে আছে। এই গরমকালেও হি-হি করে কাঁপছে সে, যেন ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে তার! দাঁতে দাঁত ঢোকার স্পষ্ট আওয়াজ দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছে জালাল।

কী হয়েছে রহিমার? ভয় পেয়েছে সে? কীভাবে?

জালালকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে তার বুকে ঝাপিয়ে পড়ল রহিমা। তারপর হাউমাউ করে শিশুদের মত কাঁদতে লাগল। শক্ত করে আটেপুঁচ্ছে জালালকে জড়িয়ে ধরেছে, যেন

ছাড়লেই পালিয়ে যাবে সে! হতভয় জালাল কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। পরম ভালবাসায় রহিমার মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে সে। সান্তুনার কোন বাণী রহিমাকে শোনানোর জন্য তার মনটা আকুলিবিকুলি করলেও মুখে কোন কথা জোগায় না তার! বহুক্ষণ আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে দাঢ়িয়ে থাকে দুই নরমারী। তারপর একসময় বড় শাক্ত হয়, কান্না থামিয়ে স্থান্তরিক হয় রহিমা।

জানা যায়, দুপুরে খাবার পর একটুখানি ভাতভূম দিয়েছিল সে। তখন ভীষণ রকম বাজে একটা স্বপ্ন দেখে ও। স্বপ্নে ভয়ক্ষণদর্শন এক প্রাণীর সাথে তার আলাপ হয়। জানোয়ারটা রহিমাকে তার গর্ভের সন্তান সম্পর্কে সতর্ক করে। বলে যে, এ সন্তান জন্ম দেয়াটা কোনমতেই উচিত হবে না, একে গর্ভে থাকতে মেরে ফেলাটাই সমীচীন!

ঘূম ভেঙে রহিমা দেখে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ভয়নক আতঙ্কিত হবার কারণে সে একধরনের ঘোরের মধ্যে চলে যায়। ঘূম ভাঙার পর থেকে জালাল বাড়ি ফেরা অবধি সময়টা সে বিছানার উপর ঠাঁব বসে থেকেই কাটায়। নেমে এসে আলো জ্বালবার সাহসৃত্বও ছিল না তার। তার কাছে মনে হয়েছে, খাটের তলায় সেই ভয়ক্ষণ জানোয়ারটা ঘাপটি মেরে আছে। বিছানা থেকে নামলেই তার টুটি চেপে ধরবে! পুরো বৃত্তান্ত শুনে অনেকখানি আশ্চর্ষ হয় জালাল, শব্দ করে শক্তির নিষংশ্঵াস ফেলে সে। তার জানা আছে, গর্তকালীন সময়ে যেমেরো নানাকরমের উদ্ভৃত স্বপ্ন দেখে। যার বেশিরভাগ জুড়েই থাকে তার অনাগত সন্তানের রকমারি বিপদ-আপদ। প্রথমবার মা হবার বেলায় এসব স্বপ্নের পরিমাণ বেড়ে যায় বছগুণে। মাত্তু নিয়ে উকেষ্টা, সেই সাথে অনভিজ্ঞতাই এর কারণ। তাই এগুলো নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামানোর কিছু নেই।

হেসে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে সে রহিমাকে। রহিমাও পরম নির্ভরতায় বিশ্বাস করে জালালের প্রতিটি কথা। কারণ তার জানা আছে, পেশায় রিঞ্চালক হলেও তার স্বামী মোটেও গওয়ার্ঘ নয়। এস-এস-সি পরীক্ষায় একবার অংশ নিয়েছিল জালাল, তবে পাশ

করতে পারেনি। এক বিষয়ে ফেল করার পর, সেখানেই লেখাপড়ার যবনিকা ঘটেছিল তার।

ভালবাসার স্থামীর আশ্বাসে শঙ্কা অনেকখানি কেটে যায় রহিমার। জালালকে হাতমুখ ধূয়ে আসতে বলে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায় সে। খাবার গরম করে দু'জনে একসাথে খাবে।

এরপর আর বেশ কিছুদিন অমন কোন উচ্চত স্পন্দন দেখেনি রহিমা। কিংবা হাততে দেখেছে, জালালকে জানায়নি। বেচারা এমনিতেই সারাটাদিন খেটে মরে, কী দরকার আব তার পেরেশানি বাড়ানোর? এ ব্যাপারে জালালের অভিযত তো জানাই আছে রহিমা! এবরাতে ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে রহিমাকে ঝড়িয়ে ধরার জন্য হাত বাড়ায় জালাল। হাত শিয়ে ঠেকে শূন্য বিছানায়, নেই রহিমা। শক্তকে জেগে ওঠে জালাল। বেড সুইচ টিপে আলোটা জ্বলতেই দেখতে পায়, খাটের কোণায় বসে আছে রহিমা! সেদিনের মতই আনন্দপূর্ণ উদ্ভাবন দশা। দু'চোখে কেমন হোর লাগা দৃষ্টি!

কাহে শিয়ে আলতো করে তার মাথায় হাত দুটিয়ে দেয় জলাল। ধূম গলার জানতে চাই, আবাসও ভয়ের কোন স্পন্দন দেখেছে কিনা সে; কিন্তু করে তার দিয়ে ফিরে তাকায় রহিমা। তার চোখের দিকে তাকিয়ে নিমিত্তেই গায়ের রোগশ্লো দাঁড়িয়ে যায় জালালের। তাকে পুরোপুরি হতবাক করে দিয়ে নিজের সন্মোক্ষনা জানায় রহিমা। তার কষ্টস্থরে কোন জড়তা বা অনিষ্ট্যতা নেই। যেন যা বলাই, সচেতনভাবেই বলছে সে।

রহিমা জানায়, তার গর্ভের সন্তান সে আর বহুন করতে রাজি নয়। হাসপাতালে গিয়ে সরকিছু খাবাস করে দিতে চায় সে। সে পুরোপুরি নিশ্চিত, তার গর্ভে অভত কিছু একটা বেড়ে উঠেছে। কী লাভ একে জন্ম দিয়ে?

কথাশলো জালালকে বালিকক্ষের জন্য হতবুদ্ধি করে দিলেও, অচিরেই বোধবুদ্ধি ফিরে পায় সে। সকালেই হাসপাতালে খাবার প্রত্যক্ষিত দিয়ে সে রাতের মত রহিমাকে ঘুম পাড়ায়। আপাতত পরিষ্কৃতি ঠাণ্ডা হোক, পরেরটা পরে দেখা যাবে।

সত্তি সত্তিই পরদিন সকালে রহিমাকে

নিয়ে হাসপাতালে যায় সে। তবে অ্যাবরশনের জন্য নয়, ডাঙ্কার আপাকে দিয়ে রহিমাকে বোঝানোর জন্য। সে আগেই খেয়াল করেছে, ডাঙ্কার আপার প্রতি অগাধ ভক্তি রহিমার। তার প্রতি ভক্তি অবশ্য জালালের নিজেরও কোন অংশে কম নেই। আশা করা যায়, তিনি বোঝালে অবশ্যই বুঝতে পারবে রহিমা।

জালালের পরিকল্পনা বৃথা যায়নি। সেদিনের পর থেকে একেবারে শান্ত হয়ে যায় রহিমা। তবে সে যে এখনও স্পন্দনা প্রায়ই দেখে, সেটা বেশ বুঝতে পারা যায়। প্রায় রাতেই ঘুম ভেঙে জালাল দেখে, না ঘুমিয়ে ঠায় বসে আছে রহিমা। ফুলে ওঠা পেটের দিকে তাকিয়ে একমনে কী যেন ভেবে চলেছে। সে চোখের দৃষ্টিতে আর যা-ই হোক, অনাগত সন্তানের প্রতি ভালবাসা যে নেই, এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারে জালাল।

একরকম জোর করেই রহিমাকে শুতে বাধ্য করে সে। একেবারে না ঘুমালে মেয়েটা বাঁচবে কেমন করে? মাথার চুলে আলতো করে বিলি কেটে দেয়, কখনও বা ছেলেভুলানো কোন হাস্যকর গল্প শোনায়। তারপর একসময় পরিশ্রান্ত জালাল নিজেই সুযোগ পড়ে। তার আনা হয় না, তখনও রক্তলাল দু'চোখ মেলে দিয়ি চেয়ে আছে রহিমা!

দেখতে-দেখতে রহিমার সন্তান প্রসবের সন্তান দিনটা ঘনিয়ে আসে। তার ফুলে ওঠা পেটের সাথে-সাথে পান্না দিয়ে বাড়ে জালালের দৃষ্টিতা! তার কেবলই মনে হয়, কখন আবার মেয়েটা মাঝা ঠিক রাখতে না পেরে গর্ভের সন্তানের কোন ক্ষতি করে বসে। তাই আজকাল বাইরে বলতে গেলে থাকেই না জালাল। দিনের খোবাপোশের বরচটা কোনমতে তুলতে পারলেই, রিক্রা জমা দিয়ে ঘরে ফিরে আসে। রহিমাকে একা থাকতে দিতে বজ্জ ভয় হয় তার।

রহিমার পেট গড়পড়তা অন্যান্য পোয়াতি মেয়েদের তুলনায় বড় হয়ে উঠেছে। ডাঙ্কার আপার ধারণা, যমজ বাচ্চার জন্ম দিতে চলেছে রহিমা। এ নিয়ে আশপাশের বাড়ির ভাবীরা অবশ্য জালালকে একা পেলে টিপ্পনী কাটিতে ছাড়ে না! দুই হাসি হেসে বলে, ‘জালাল ভাই তো দেহি মরদের মতন মরদ! এত কাছে

থাইকাও আমরা কুন্দিন টের পাইলাম না! কেমুন কইরা রাহিমারে জোড়া পেট বাধাইয়া দিলেন!

জালাল লজ্জা পায় ভীষণ। চট করে মাথা নিচু করে ফেঙ্গে, চোখ তুলে তাকাতে পারে না। তার এমন সিঙ্গিন অবস্থা দেখে ভাবীরা আরও মজা পায়, খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। নিচু মাথা আরও নিচু হয়ে যায় জালালের।

এক বড়-বাদলের রাতে আচমকা প্রসব বেদনা ওঠে রাহিমার। অথচ ডাক্তার আপার কথামত এখনও দিন পনেরো বাকি সম্ভাব্য তারিখ আসতে! সেই মননই প্রস্তুতি নিছিল জালাল। তার ইচ্ছে ছিল, নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত সঙ্গাত্মকানেক আগে সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করে দেবে রাহিমাকে। কটা দিন রিস্কু ঢালানো ইন্ফ্যান্ট দিয়ে সারাক্ষণই পাশে থাকবে রাহিমার। কিন্তু হঠাৎ এই মাঝরাতে তার প্রসব বেদনা ওঠায় কিংকর্তব্যবিমৃত্ত হয়ে যায় জালাল। কী করবে কিছুই বুঁৰে উঠতে পারে না। এমনিতেই এতরাতে হাসপাতালে নেয়া কঠিকর হত, আর আজ এই বড়-তুফানের মধ্যে সেটা একেবারেই অসম্ভব। শেষমেশ বাধ্য হয়েই পাশের পাড়া থেকে ললিতা, ধাইকে নিয়ে আসে জালাল। বাচ্চা প্রসবে বেশ অভিজ্ঞ সে, এই এলাকার প্রায় সব বাচ্চার জন্ম তার হাতেই হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত পরিবারগুলো এখনও সভান জন্মদানের মত গোপন ব্যাপারে একজন ডাক্তারের চেয়ে একজন ধাইয়ের উপরই নির্ভর করে বেশি।

ললিতা ধাই এসেই নানা ফুট-ফরমামেশ দিতে শুরু করল জালালকে। জালালও ছুটোছুটি করে তার চাহিদামত সব জিনিসপত্র জোগাড় করে দিল। তারপর ঘরের বাইরে এসে বংশির মধ্যেই অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগল।

সে অবশ্য এ সময়টায় রাহিমার পাশে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু ললিতা ধাই তাতে রাজি হয়নি। যেয়েছেলের একান্ত ব্যাপারে একজন পুরুষ মানুষ উপস্থিত থাকবে, এটা আবার কেমন কথা? সে যতই যেয়েটার স্থামী হোক না কেন, পুরুষ তো!

হঠাৎ করেই বিদ্যুৎ চলে গেল। সাথে-সাথেই ভিতর থেকে ডাক পড়ল জালালের। দৌড়ে ভিতরে গিয়ে ঘরের দুটো ললিতা

আলোর ব্যবস্থা করল সে। তার পর আবারও বাইরে এসে বৃষ্টিতে ভিজক্তে লাগল। থেকে থেকেই শরীরটা কেঁপে উঠছে তার। শীতে নাকি ভয়ে, কে জানে!

ভিতরবাড়িতে ললিতের আলোয় নিবিষ্টমনে কাজ করে চলেছে ললিতা ধাই। একনামাড়ে রাহিমার চাপা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে জালাল বড়-তুফানের মধ্যেও। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠছে তার। আহারে, না জানি বট্টার কত কষ্ট হচ্ছে। আচমকা থেমে গেল রাহিমার গোঙানি, পরক্ষণেই শোনা গেল ললিতা ধাইয়ের রক্ষিত করা চিংকার। পিলে চমকে উঠল বাইরে দাঁড়ানো জালাল মিরার! কী হয়েছে? রাহিমার কিছু? নাকি বাচ্চার? ওরা বেঁচে আছে তো?

এক দোড়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল জালাল। ঢুকেই চোখে পড়ল বিছানায় অচেতনভাবে এলিয়ে পড়ে থাকা অর্ধনয় রাহিমার দিকে। তার বুকের ওঠানামা দেখে নিজের বুকের উপর থেকে একখানা দশশণ ওজনের পাথর সরে গেল জালালের। শ্বাস চলছে রাহিমার, বেঁচে আছে সে।

পরক্ষণেই তার চোখ পড়ল বিছানার পাশে মেঝেতে বেঁশ হয়ে পড়ে থাকা ললিতা ধাইয়ের উপর। হায় খোদা! ললিতা ধাইয়ের পাশে কী ওটা?

ঠিক তখনই মুখ তুলে কৃতকৃতে চোখে জালালের দিকে চাইল ওটা। ভয়ে অস্তরাত্মা কেঁপে উঠল জালালের। বুঁৰে গেছে কী ওটা এবং কোথেকে এসেছে!

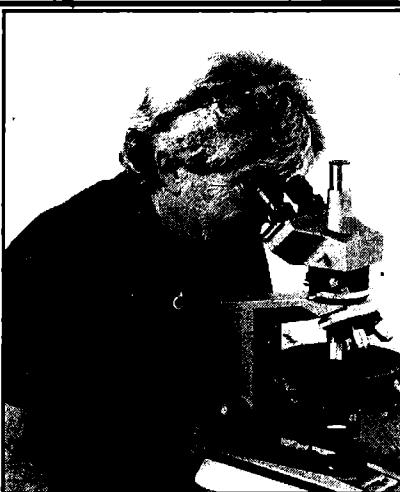
এ ডয়ঙ্করদর্শন জানোয়ারটা তাদেরই ওরসজাত সন্তান!

কোন মানবশিশুর জন্ম দেয়নি রাহিমা, জন্ম দিয়েছে এক দানবের। যার অবয়ব বর্ণনা করার মত শব্দ পৃথিবীর কোন ভাষাতেই নেই! আচমকা ললিতা ধাইকে থেকে শুরু করল ওটা, শুরু করেছে বুক থেকে! নরম মাংসে কচকচ করে বসে যাচ্ছে ধারাল দাঁতগুলো! মন্ত্রমুক্তের মত বিষ্ফারিত নেত্রে সেনিকে তাকিয়ে রাইল জালাল। হাড় ভাঙ্গার মুড়মুড় শব্দ কানে যেতেই সংজ্ঞা হারাল সে! তার জানা নেই, শুধু ললিতা ধাইকে দিয়ে পেটের ডয়ঙ্কর খিদে মিটোবাৰ নয় তার সন্তানের! ■

প্রস্তাবে অ্যালবুমিন

ডা. মোঃ ফজলুল কবির পাতেল

প্রস্তাবে যদি কখনও
অ্যালবুমিন পাওয়া যায়,
তবে বুঝতে হবে
শরীরে সমস্যা আছে।



অ্যালবুমিন এক ধরনের প্রোটিন। আমাদের রক্তে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন থাকে। তবে অ্যালবুমিন থাকে সবচেয়ে বেশি। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রস্তাবে কোন অ্যালবুমিন থাকে না। প্রস্তাবে যদি কখনও অ্যালবুমিন পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে শরীরে সমস্যা আছে। বিভিন্ন অসুস্থির কারণে প্রস্তাবে অ্যালবুমিন দেখা যায়। যেমন—

- ১। নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম।
- ২। গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস।
- ৩। ডায়াবেটিক নেফরোপ্যাথি।
- ৪। বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।
- ৫। উচ্চ রক্তচাপ।
- ৬। হার্ট ফেইলিওর।
- ৭। মেটাৰিলিক সিন্ড্রোম।
- ৮। প্রি-এক্রাম্পসিয়া, এক্রাম্পসিয়া।
- ৯। ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস।

১০। বিভিন্ন সংক্রমণ। এগুলো পৰিচিত কারণ। আরও কারণ আছে, যার জন্য প্রস্তাবে অ্যালবুমিন যায়।

প্রস্তাবে অ্যালবুমিন গেলে প্রস্তাব দেখলেই বোঝা যায়। প্রচৰ ফেনা থাকে প্রস্তাবে। প্রস্তাবে অ্যালবুমিন নির্ণয় কুব সহজ। সামান্য একটু ১০% অ্যাসিটিক অ্যাসিড মিশিয়ে প্রস্তাবকে তাপ দিলে যদি সাদা থকথকে হয় তবে বুঝতে হবে প্রস্তাবে অ্যালবুমিন আছে। আবার ‘ডিপস্টিক’ টেস্ট করেও অ্যালবুমিন ধরা যায়।

প্রস্তাবে অ্যালবুমিন গেলে অবশ্যই কারণ খুঁজে বের করতে হবে। কারণ বের করে যথাযথ চিকিৎসা করলে এসমস্যা ভাল হয়ে যায়। প্রস্তাবে অ্যালবুমিন দেখে অনেক রোগের অভিত্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পরীক্ষা করতে তেমন ব্যরচও হয় না, অর্থচ রিপোর্ট দেখে অনেক কিছু ধারণা পাওয়া যায়। ■

বইয়ের জগতে আপনাকে স্বাগতম

সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশন-এর গল্প, উপন্যাস, ওয়েস্টার্ন, ক্লাসিক, অনুবাদ, তিন গোয়েন্দা, কিশোর হরর, মাসুদ রানা ও যাবতীয় বিপ্রিষ্ঠ বই বিক্রেতা

কিশোর লাইব্রেরী
নুরেশ চৌহান সড়ক, ঠাকুরগাঁও।

গোয়েন্দা উপন্যাসিকা

স্যাংচুয়ারি

মূল: আগাথা ক্রিস্টি

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান



এক

দু, হাত ভর্তি ড্রাইসেনথেমাম ফুল নিয়ে
ভিকারেজের একটা কোনো ঘূরে
বেরিয়ে এল যাজকের স্তী বাঞ্ছ।
বাগানের মাটিতে মাখামাখি হয়ে আছে ওর
জুতো, নাকেও লেগেছে খানিকটা। কিন্তু
সেদিকে মেয়েটার কোনো বেয়াল আছে বলে
মনে হয় না।

কজায় মরচে-ধরা ভিকারেজের দরজাটা
বুলতে একটু কষ্টই করতে হলো ওকে।
একবলক দমকা বাতাস বয়ে গেল এমন সময়,
একদিকে কাত হয়ে গেল ওর হ্যাট। 'বামেলা!'
বিরক্ষ হয়ে বলে উঠল সে। ফুলগুলো ধরল
ভালমত, দরজা পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে
চার্চিয়ার্ডের দিকে। অনতিদূরে গির্জাৰ
দরজা।

বেয়ালিগনার কথা বাদ দিয়ে বললে

গির্জাৰ পুবদিকের একটা জানালার রঙ
নষ্ট-হয়ে-যাওয়া কাচ গলে ভিতরে ঢুকে পড়ল
ৰোদ। নীলচে লাল আলোতে ভরে গেল
ওদিকটা। 'বৃত্তপাথের মত,' ভাবল বাঞ্ছ, সঙ্গে
সঙ্গে থমকে দাঢ়াল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে
সামনের দিকে। চ্যাস্পেলের ধাপগুলোয় কুঙ্গী
পাকিয়ে পড়ে আছে কিছু একটা, অথবা কেউ
একজন।

ফুলদানিশ্বলো সাবধানে নামিয়ে রাখল
বাঞ্ছ। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল চ্যাস্পেলের
দিকে, কাছে গিয়ে ঝুকল। একটা লোক পড়ে
আছে, দেখে মনে হচ্ছে উচিতুটি মেরে শয়ে
আছে।

লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল
বাঞ্ছ। ধীরে ধীরে, সাবধানে চিৎ কৰল
লোকটাকে। পাল্স দেখল লোকটার-বুবৈ
দুর্বল, এবং যত সময় যাচ্ছে তত দুর্বল হচ্ছে।

'কুন?'

'হ্যা, কুন। মেজন্যাই আগনার কাছে এসেছি, আস্টি। আরেকটা কথা।

লোকটা মগার আগে দু'বার পিষ শব্দটা বলেছে আমাকে।'

নভেম্বরের বাতাস শান্ত, ভেজা ভেজা। আকাশে
মেঘ জমে আছে, তবে এখানে-সেখানে ছোপ
ছোপ নীলও চোবে পড়ে। গির্জাৰ ভিতরটা
অঙ্ককার আৰ ঠাণ্ডা। কাজের সময় ছাড়া
অন্য সময়ে উত্তাপের ব্যবস্থা কৰা হয় না
এখানে।

কেঁপে উঠে অন্তু এক আওয়াজ কৱল
বাঞ্ছ। বিড়বিড় করে বলল, 'তাড়াতাড়ি করতে
হবে। ঠাণ্ডায় মৰতে চাই না।'

কাজ কৰতে কৰতে হাত চালু হয়ে গেছে;
দ্রুত হাতে টুকিটাকি জিনিস ঠিক কৰে নিল সে:
ভাস, পানি, ফুলদানি। ভাবল, 'যদি লিলিকুল
ধাক্কত! পেঁকাটে ড্রাইসেনথেমামগুলো দিয়ে
গির্জা সাজাতে সাজাতে ক্লান্ত হয়ে গেছি।'

ফুলদানিশ্বলোয় দ্রুত হাতে ফুলগুলো
সাজিয়ে রাখল সে। তারপৰ ফুলদানিশ্বলো
হালে নিয়ে আইল ধৰে বেদিৰ দিকে এশোতে
ওক কৱল। বাইরে, মেঘের আড়াল থেকে সূর্য
উঠিকি দিল এমন সময়।

একইসঙ্গে ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে চেহারাটা।
সদেহ নেই, মারা যাচ্ছে সে।

লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশের মত। পৰনে
একটা কালো রঙের জীৰ্ণ আৰ ছেঁড়াকটা স্যুট।
ওৱ যে-হাত ধৰে পাল্স দেখেছে বাঞ্ছ সেটা
নামিয়ে রেখে অন্য হাতটার দিকে তাকাল।
দেখে মনে হচ্ছে আঙুলগুলো খামচে ধৰে আছে
বুকটা। ভালমত তাকিয়ে বাঞ্ছ দেখতে পেল,
বড় কুমালজাতীয় কিছু একটা বুকের সঙ্গে
চেপে ধৰে আছে লোকটা। ওৱ মুষ্টিবদ্ধ
আঙুলগুলোয় শুকিয়ে-যাওয়া তৱল পদার্থের
বাদামি দাগ-সন্দৰ্বত রঞ্জের, অনুযান কৱল
বাঞ্ছ। গোড়ালিৰ উপৰ ভৱ দিয়ে বসে পড়ল
সে, জু কুঁচকে গেছে।

এতক্ষণ বক ছিল, এবাৰ হঠাৎ কৰে দুই
চোৰ বুলুল লোকটা। বাঞ্ছের চেহারার দিকে
নির্দিষ্ট তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি বলে দিচ্ছে
মেয়েটাকে দেখে হতবুদ্ধি হয়নি সে, এমনকী
মৃত্যুপথযাত্ৰীৰ চোখে যে-ৱকম ঘোৰ লাগে

তা-ও ঘটেনি ওর ক্ষেত্রে। বৰং আগের আশ্চর্য হেয়া আছে চোখ দুটোতে, আছে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। ঠোঁট নড়ে উঠল ওর। কথাগুলো, বলা ভাল কথাটা শোনার জন্য আরেকটু ঝুকল বাঞ্ছ।

একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করল লোকটা:
‘স্যাংচুয়ারি’।

বাঞ্ছের মনে হলো, শব্দটা ফিসফিস করে বলতে পেরে খুবই মন্দ একটা হাসি যেন ফুটে উঠল লোকটার ঠোঁটের কোনায়। শুনতে ভুল হয়নি ওর, কারণ এক মুহূর্ত পর আবার বলল লোকটা, ‘স্যাংচুয়ারি’।

তারপর মন্দু কিন্তু দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে আবার চোখ বন্ধ করল সে। আবারও ওর পাল্স দেখল বাঞ্ছ-আগের চেয়েও দুর্বল হয়েছে। থেমে থেমে চলছে হ্রদপিণ্ড।

কী করবে ঠিক করে ফেলল যেয়েটা, উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘নড়বেন না, নড়ার চেষ্টাও করবেন না। দেবি কী করতে পারি আপনার জন্য।’

আবার খুলে গেল লোকটার দুই চোখ। তবে বাঞ্ছের দিকে না, মনে হয় পুবদিকের জানালা গলে-আসা বর্ষিল আলোর দিকে তাকিয়ে আছে সে। বিড়ালিড় করে কী যেন বলল আবারও, ঠিক বুঝতে পারল না বাঞ্ছ। কিছুটা চমকে উঠল যেয়েটা, ভাবল ওর স্বামীর নাম উচ্চারণ করেছে মুমৰ্শু লোকটা।

‘জুলিয়ান?’ বলল বাঞ্ছ, ‘আপনি কি জুলিয়ানকে খুঁজতে এসেছেন এখানে?’

কোনো জবাব নেই।

চোখ বন্ধ করে ফেলেছে লোকটা, পড়ে আছে মড়ার মত। আরও ধীর হয়েছে ওর শাস্ত্রশাস, একহাতে খামচে-ধরা বুকটা ঝঠানামা করছে কী করছে না।

ঘুরে দ্রুত গির্জা থেকে বের হয়ে এল বাঞ্ছ। হাতছড়ির দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট শওয়ার ভঙ্গিতে যাথা বাঁকাল। ডাঙ্কারখানায় এখনও ধাকার কথা ডাঙ্কার প্রিফিল্স-এর। গির্জা থেকে পায়ে হেঁটে ওখনে যেতে মাত্র দু মিনিট নাগে।

ডাঙ্কারখানায় গিয়ে হাজির হলো যেয়েটা। দরজায় টোকা না-দিয়ে অথবা বেল

না-বাজিয়ে সরাসরি ঢুকে পড়ল ডাঙ্কারের ঘরে।

‘এখনই আসতে হবে আপনাকে,’ বলল সে। ‘গির্জার ভিত্তে পড়ে আছে একটা লোক, মারা যাচ্ছে।’

দুই

কয়েক মিনিট পর।

ইটু গেড়ে বসেছিলেন ডাঙ্কার প্রিফিল্স, এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মোটামুটি দেখেছেন মুমৰ্শু লোকটাকে। বললেন, ‘লোকটাকে এখন থেকে ডিকারেজে নিয়ে যাওয়া যায়? ওর আরেকটু যত্ন নিতে পারতাম তা হলে, যদিও কোনো লাভ আছে বলে মনে হয় না।’

‘অবশ্যই,’ বলল বাঞ্ছ। ‘এখনই যাচ্ছি আমি, প্রয়োজনীয় সবকিছুর বদ্দোবন্ত করছি। খবর দিচ্ছি হারপার আর জোঙ্গকে। ওরা লোকটাকে ধরাধরি করে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে আপনাকে।’

‘ধনবাদ। অ্যাম্বলেসের জন্য কোন করব তিকারেজ থেকে। কিন্তু ততক্ষণ...’ কথাটা শেষ করলেন না ডাঙ্কার প্রিফিল্স।

বাঞ্ছ বলল, ‘ইন্টার্নাল রিডিং?’

মাথা বাঁকালেন ডাঙ্কার প্রিফিল্স। ‘লোকটা এখানে এল কী করে?’

‘আমার মনে হয় সারারাতই এখানে ছিল। সকালে গির্জার দরজা খুলে দিয়ে কাজে চলে যায় হারপার। সাধারণত ভিতরে আসে না সে।’

তিনি

পাঁচ মিনিট পর।

টেলিফোনের “রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ডাঙ্কার প্রিফিল্স। যে-ঘরে ওইয়ে রাখা হয়েছে মুমৰ্শু লোকটাকে সে-ঘরে ঢুকলেন। তড়িঘড়ি করে একটা সোফার উপর কম্বল বিছিয়ে শোওয়ানো হয়েছে লোকটাকে। ওকে এবার ভালমত দেখেছেন ডাঙ্কার প্রিফিল্স। এক গামলা পানি সরাচ্ছে বাঞ্ছ। একটু পর পরিষ্কার করবে জায়গটা।

‘যা করার ছিল করেছি,’ বললেন

রহস্যপত্রিকা

গ্রাফিথস। 'অ্যাম্বুলেন্স ডেকে পাঠিয়েছি। পুলিশকে খবর দিয়েছি।' জি কুচকে তাকালেন তাঁর বোগীর দিকে। চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে শোকটা। মাস্পেশীর আঙ্কেপে কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর বাঁ হাত।

'গুলি করা হয়েছে ওকে,' বললেন গ্রাফিথস, 'বুব কাছ থেকে। নিজের কুমাল বলের মত করে পাকিয়ে ক্ষতস্থানে চেপে ধরে ছিল সে যাতে রক্ষণাত্মক থামাতে পারে। কিন্তু...'

'গুলি খাওয়ার পর কি অনেকদূর যাওয়া সম্ভব কারও পক্ষে?' জানতে চাইল বাঁশ।

'হ্যা, সম্ভব। আমি এমন লোকের কথাও জানি, যে মারাত্কারভাবে আহত হওয়ার পরও রাস্তা দিয়ে দিব্যি হেঁটে গেছে—যেন কিছুই হয়নি। তারপর পাঁচ বা দশ মিনিট বাদে হঠাৎ পড়ে গেছে ধ্বপাস করে। এই লোকটাকে শির্জায় পাওয়া গেছে, তারমানে সে যে শির্জার ভিতরে গুলি খেয়েছে তা কিন্তু না। আমার ধারণা, আরও দূরে কোথাও গুলি চালানো হয়েছে ওর উপর। আবার, সে নিজেই নিজেকে গুলি করে থাকতে পারে। তারপর রিভলভারটা ফেলে দিয়ে অঙ্কের মত টলমল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হাজির হয়েছে শির্জায়। তবে একটা ব্যাপার বুবলাম না। লোকটা ভিকারেজে না এসে শির্জায় গেল কেন?'

'আমি জানি,' বলল বাঁশ। 'সে বলেছে: স্যার্চয়ারি।'

ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন গ্রাফিথস। 'স্যার্চয়ারি?'

'ওই যে, জুলিয়ান এসে গেছে,' হল-এ শামীর পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ঘুরাল বাঁশ। 'জুলিয়ান, এদিকে এসো।'

ঘরে ঢুকলেন রেভারেণ্ড জুলিয়ান হার্মন। তাঁর যা বয়স, তার চেয়ে বেশি বয়স্ক বলে মনে হয় তাঁকে পাতিয়াপূর্ণ আচরণের কারণে। 'দীর্ঘের!' সার্জিকাল যত্নপ্রাপ্তি আর সোফায় পড়ে থাকা দেহটা দেখে বললেন তিনি।

বাঁশ বলল, 'শির্জায় মুমুর্শ অবস্থায় পেয়েছি লোকটাকে। গুলি করা হয়েছে ওকে। চেনো লোকটাকে, জুলিয়ান? আমার মনে হয়

তোমার নাম উচ্চারণ করেছে সে।'

সোফার কাছে এগিয়ে গেলেন জুলিয়ান, ভালমত দেখলেন লোকটাকে। 'বেচারা,' বললেন নিচু গলায়, মাথা নাড়লেন। 'না, ওকে চিনি না। আগে কখনও দেখিনি।'

এমন সময় আবার চোখ ঝুলল মুমুর্শ লোকটা। প্রথমে ডাক্তার গ্রাফিথস, তারপর রেভারেণ্ড জুলিয়ান, শেষে বাঁশের দিকে তাকাল। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে।

আগে বাড়লেন গ্রাফিথস। 'আপনি কি আমাদেরকে বলবেন...'

'পিয়ে...পিয়ে...' বাঁশের দিকে তাকিয়ে থেকে শরীরের শেষ শক্তিটুকু খরচ করে অত্যন্ত দুর্বল গলায় বলে উঠল লোকটা। তারপর, একটুখানি কেঁপে উঠে, মারা গেল।

চার

পেপসিলের শিষ জিভ দিয়ে ঢাটলেন সার্জেন্ট হেইস, নেটুরুকের পাতা উল্টালেন। 'আপনার কি আর কিছু বলার আছে, মিসেস হার্মন?'

'না,' বলল বাঁশ। 'লোকটাৰ পকেটে থেকে ওই জিনিসগুলো পাওয়া গেছে।'

সার্জেন্ট হেইস যেখানে আছেন সে-জায়গার কাছাকাছি একটা টেবিলের উপর রাখা আছে একটা ওয়ালেট, 'ড্রিউট. এস.' আদ্যক্ষরযুক্ত একটা পুরনো ভাঙা পকেটবঢ়ি আর লগুনের একটা টিকেটের রিটার্ন হাফ।

'লোকটা কে, জানতে পেরেছেন?' জিজেস করল বাঁশ।

'জনৈক মিস্টার ও মিসেস একেল্স ফোন করেছিলেন পুলিশ স্টেশনে,' বললেন সার্জেন্ট হেইস। 'তাঁদের কথা শুনে মনে হলো মৃত লোকটা মিসেস একেল্সের ভাই। নাম স্যাওর্ন। ওর শরীরের নাকি বেশিরভাগ সময়ই থারাপ থাকত। স্নায়বিক আর মানসিক সমস্যাও নাকি ছিল। কিছুদিন আগে অবস্থা আরও খারাপ হয়। গত পরও কাউকে কিছু না-বলে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে এবং তখন থেকে লাপান্ত ছিল। যাওয়ার সময় সঙ্গে একটা রিভলভার নেয়।'

'তারপর এখানে এসে গুলি করে

নিজেকে?' বলল বাঞ্ছ। 'কেন?'

'কী বলব, বলুন? মানসিক সমস্যাগত
একটা লোক...'

'আমি সেটা বলিনি,' সার্জেন্ট হেইসকে
বাধা দিয়ে বলল বাঞ্ছ। 'আমার কথা হচ্ছে,
এখানে কেন?'

প্রশ্নটার জবাব জানেন না সার্জেন্ট হেইস।
তাই বললেন, 'এখানেই এসেছে সে। পাঁচটা
দশের বাসে।'

'বুঝলাম। কিন্তু কেন?' আবারও জানতে
চাইল বাঞ্ছ।

'জানি না, মিসেস হার্মন। রহস্যটার
কোনো ব্যাখ্যা নেই আমার কাছে। লোকটার
যদি মানসিক সমস্যা থেকেই থাকে...'

'তা হলে যে-কোনো জায়গায় আত্মহত্যা
করতে পারত,' সার্জেন্ট হেইসের কথাটা শেষ
করে দিল বাঞ্ছ। 'আমার কাছে সবচেয়ে অন্তৃত
লাগছে কোন বিষয়টা, জানেন? কোনো দরকার
হিল না, তারপরও বাসে করে এ-জায়গার
মতো একটা ছোট গ্রাম এলাকায় হাজির হলো
লোকটা। এখানকার কাউকে সে চিনতেও
না।'

'এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায়নি শুই
ব্যাপারে,' ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে কাশলেন
সার্জেন্ট হেইস, উঠে দাঁড়ানে। 'ম্যাম, যদি
কিছু মনে না করেন, আপনার সঙ্গে দেখা করার
জন্য মিস্টার আর মিসেস একেল্স আসতে
পারেন এখানে।'

'না, মনে করার কী আছে? সেটাই
সামাজিক। তবে আফসোসের কথা, তাঁদেরকে
বলার মত তেমন কিছু জানা নেই আমার।'

সার্জেন্টের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে
ভিকারেজের সামনের দরজার কাছে শিয়ে
দাঁড়াল বাঞ্ছ। 'একটা বিষয় ডেবে ভাল
লাগছে-কোনো খুনখারাপির সঙ্গে জড়িয়ে

পড়িনি আর্মারা।'

কথাটা শেষ করেছে কী করেনি বাঞ্ছ,
ভিকারেজের সদর-দরজার কাছে এসে থামল
একটা গাড়ি। ওটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে
থেকে সার্জেন্ট বললেন, 'দেখে মনে হচ্ছে
হাজির হয়ে গেছেন মিস্টার আর মিসেস
একেল্স।'

পাঁচ

কুশল বিনিময় করার সময় কিছুটা আশ্র্য হতে
হলো বাঞ্ছকে। মিস্টার আর মিসেস একেল্স
দেখতে যে-রকম হবে বলে ডেবেছিল সে, তাঁরা
সে-রকম নন।

মিস্টার একেল্স একটু মোটাসোটা আর
শক্তপোক গড়নের, চেহারাটা লালচে। গঁষ্টীর
হয়ে থাকার কথা তাঁর, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে আছে
কেটুক আর লাক্ষ্যটা। আর মিসেস একেল্সের
চোখ দুটো ভাসা ভাসা, তাতে কেমন জলজুল
চাহনি। চেহারাটা শ্রীহীন, দেখলেই মনে হয়
সঙ্কীর্ণমনা। চেহারার তুলনায় মুখ ছোট। কঠ
পাতলা আর ভৌঁক।

'বুঝতেই পারছেন, মিসেস হার্মন, খবরটা
শুনে কত কঠ পেয়েছি আমি,' বললেন তিনি।

'জানি,' শুধু গলায় বলল বাঞ্ছ। 'কষ্ট
পাওয়ার মত খবরই বটে। বসুন। তা বাবেন?'

বেঁটে আর মোটা হাত নেড়ে প্রত্যাবর্তা
প্রত্যাখ্যান করলেন মিস্টার একেল্স। 'না, না,
কিছুই লাগবে না আমাদের। অনেক ধন্যবাদ
আপনাকে।' আমরা শুধু 'জানতে
চাচ্ছিলাম...বেচারা উইলিয়াম কী বলেছে
আপনাকে।'

'অনেকদিন দেশের বাইরে ছিল আমার
ভাইটা,' বললেন মিসেস একেল্স। 'আমার
মনে হয় ওখানে জন্ম কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল
ওর। সে-কারণেই দেশে ফেরার পর কেমন

জাতীয় পত্রিকা ও সেবা প্রকাশনীর বইসহ স্জনশীল বইয়ের বিপুল সমাহার আনন্দ বিপণী

১০ খান সুপার মার্কেট, জনতা ব্যাংক মোড়
ফরিদপুর।

মোবাইল: ০১৭১১২৩৪২৭৩, ০৬৩১৬৪৪৬৭

। প্রাচীন থাকত বেশিরভাগ সময়, মনমরা হয়ে থাকত। প্রায়ই বলত, দুনিয়াতে বেঁচে থাকার জন্মে মানে নেই, দুনিয়াতে আশা-ভরসা বলে। গুরু নেই। বেচারা বিল, খেয়ালিপনায় ভুগত মনসময়।'

কিছু না-বলে তাঁদের দু'জনের দিকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল বাধ্য।

মিসেস একেলস বলে চললেন, 'কোন গাঁকে আমার স্বামীর রিভলভারটা নিয়ে নেয় সে, টেরও পাইনি আমরা। তারপর, শুনে যা মনে হলো, বাসে করে হাজির হয় এখানে। একদিক দিয়ে চিন্তা করলে হয়তো ভালই করেছে কাজটা-আত্মহত্যা করতে চায়নি আমাদের বাসায়।'

'বেচারা, বেচারা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মিস্টার একেলস। 'ঠিক করেনি কাজটা।'

কিছুক্ষণের নীরবতা।

'সে কি? কিছু বলে গেছে আপনাকে?' মিস্টার একেলস বললেন একসময়। 'কোনো মেসেজ? শেষ কোনো কথা?'

জুলজুলে, অনেকটা ঘয়োরের মত চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন তিনি বাখেরের দিকে। মেয়েটার মুখ থেকে জবাব শোনার আশায় ঝুঁকে বসেছেন মিসেস একেলসও।

'না,' নিষ্পৃহ ভঙ্গিতে বলল বাধ্য। 'আমার মনে হয় যখন মারা যাচ্ছিলেন তিনি তখন সাহায্য পাওয়া যেতে পারে ভেবে ঢুকে পড়েন গির্জায়। তবে...'

'তবে?' একইসঙ্গে বলে উঠলেন মিস্টার আর মিসেস একেলস।

'একটা কথা বলেছেন...'

'কী?'

'স্যাংচুয়ারি।'

'স্যাংচুয়ারি?' গলা শুনে মনে হলো থত্তমত শেয়ে গেছেন মিসেস একেলস, চট করে দৃষ্টি বিনিময় করলেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে। 'আমার মনে হয় ন আমি...'

'পবিত্র জায়গা, যাই ডিয়ার,' অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলেন মিস্টার একেলস। 'তুমি জানো আত্মহত্যা করা মহাপাপ। মরার আগে কখনো বুঝতে পেরেছিল তোমার ভাই। তাই

গির্জার মত পবিত্র একটা জায়গায় হাজির হয়, উদ্দেশ্য ছিল কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া।'

'তবে মারা যাওয়ার আগে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিলেন তিনি,' বলল বাধ্য। 'কিন্তু প্রিয় শব্দটা দু'বার বলার পরই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।'

রূমাল দিয়ে চোখের কোনা মুছলেন মিসেস একেলস, নাক টানলেন।

তাঁর স্বামী বললেন, 'শান্ত হও, প্যাম, তেঙে পোড়ো না। বেচারা উইলি! ওর আত্মার জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আর কী করার আছে আমাদের, বলো? একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে-যে নিদর্শণ মানসিক ব্যস্তা ভোগ করছিল সে এতদিন ধরে, যুক্তি পেয়েছে সেটা থেকে।' বাখেরের দিকে তাকালেন। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মিসেস হার্মন। আশা করি বিরক্ত করিন আপনাকে। আমরা জানি একজন যাজকের স্তু ব্যস্ত মানুষ।' উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাশেকে করলেন বাখের সঙ্গে, দেখাদেবি তাঁর স্তু। ঘুরে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন দু'জনে।

কিন্তু হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়ালেন মিস্টার একেলস, ঘুরলেন আবার। 'একটা কথা, মিসেস হার্মন। উইলির কোটটা রয়ে গেছে আপনার কাছে, না?'

'কোট?' ক্র কোচকাল বাধ্য।

ঘুরে দাঁড়িয়েছেন মিসেস একেলসও। বললেন, 'আমার ভাইয়ের সবকিছু রাখতে চাই আমার কাছে-বুঝতেই পারছেন, আবেগ জড়িত আছে ব্যাপারটার সঙ্গে।'

'একটা ঘড়ি, একটা ওয়ালেট আর একটা টিকেট ছিল তাঁর পকেটে।' বলল বাধ্য। 'ওগুলো দিয়ে দিয়েছি সাজেক্ষে হইসকে।'

'ঠিক আছে,' বললেন মিস্টার একেলস। 'আশা করছি তিনি ওগুলো তুলে দেবেন আমাদের হাতে। উইলির ব্যক্তিগত কাগজপত্র পাওয়া যাবে ওয়ালেট থেকে।'

'ওয়ালেটের ভিতরে একটা এক পাউতের সেটি ছিল,' বলল বাধ্য। 'আর কিছু না।'

'আর কিছু না? কোনো চিঠি? অথবা অন্য কোনোকিছু?'

মাথা নাড়ুল বাঞ্ছ।

‘ঠিক আছে। আপনাকে আবারও ধন্যবাদ, মিসেস হার্মন। উইল যে-কোটটা পরে ছিল সেটাও কি নিয়ে গেছেন সার্জেন্ট?’

মনে করার ভঙ্গিতে জি কোঁচকাল বাঞ্ছ।
বলল, ‘না। আমার মনে হয় না...একটু দাঁড়ান, মনে করে দেখি। ক্ষতস্থানটা দেখার জন্য ডাক্তার আর আমি যিলে কোটটা খুললাম। তারপর...’ এদিক-ওদিক তাকাল সে। ‘আমার মনে হয় তোয়ালে আর গামলার সঙ্গে কোটটাও নিয়ে গেছি উপরতলায়।’

‘যদি কিছু মনে না-করেন, মিসেস হার্মন, বুবাত্তেই পারছেন...স্মৃতি হিসেবে বাখতে চাই কোটটা। উইলির পরা শেষ কোট, আমার স্তী আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছে ওই ব্যাপারে।’

‘অবশ্যই। আমি কি ওটা ধূয়ে দেব? আসলে...অনেক ধূলোময়লা লেগে গেছে তো...’

‘না, না, না। ওসব কোনো ব্যাপার না।’

আবারও জি কোঁচকাল বাঞ্ছ। ‘কোথায় যে বাখলাম...মাঝ করবেন, একটু খুঁজে দেখতে হবে আমাকে।’ সিডি বেয়ে উপরতলায় উঠে এল সে।

একেল্স দম্পতির কাছে ফিরতে কয়েক মিনিট সময় লাগল ওর।

‘দুঃখিত,’ বলল হাঁপাতে হাঁপাতে, ‘যেসব কাপড় লঙ্ঘিতে যায় সেগুলোর সঙ্গে এটাকেও সরিয়ে ফেলেছিল বাসার কাজের মহিলাটা। তাই খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগল। এই যে দেখুন, নিয়ে এসেছি। একটা বাদামি কাগজে মুড়ে দিছি।’

‘লাগবে না, লাগবে না,’ থাক থাক, ইত্যাদি বলে মিস্টার আর মিসেস একেল্স বার বার প্রতিবাদ করার পরও কাজটা করল সে। তারপর কাগজেমোড়া কোটটা তুলে দিল একেল্স দম্পতির হাতে।

ওকে বিদায় বলে চলে গেলেন তারা।

ছয়

হল ধরে ধীর পায়ে হেঁটে স্টাডিকমে ঢুকল বাঞ্ছ।

চোখ তুলে তাকালেন রেভারেণ্ড জুলিয়ান

হার্মন, জি ঢুকলালেন। ‘কিছু বলবে?’

মাথা ঝৌকাল বাঞ্ছ। স্যাংচয়ারি কী?’

‘শব্দটার সঙ্গে রোমান আর শ্রীক মন্দিরের সম্পর্ক আছে।’

‘কী সেটা?’

‘কোনো কোনো রোমান আর শ্রীক মন্দিরের ভিতরে, অন্য কোনো প্রাচীন মন্দিরের মত দেখতে একটা জায়গা বানানো হত যেখানে একটা দেবতার মূর্তি থাকত। ল্যাটিন শব্দ “আরা” মনে সুরক্ষা বা তত্ত্ববধান। শ্রীষ্টান গির্জাগুলোতে তিনশ’ তিরানবাই শ্রীষ্টাদে স্যাংচয়ারির ব্যাপারটাকে পাকাপোজভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ইংল্যাণ্ডে স্যাংচয়ারির অথব উল্লেখ পাওয়া যায় এথেলবার্ট কর্তৃক ইস্যুরূপ কোড অভ ল-ঘ-এ, শ্রীষ্টাদ ছ-শ’ ’

জুলিয়ানের জ্ঞানগর্ত বক্তব্য শেষপর্যন্ত শোনার পর বাঞ্ছ বলল, ‘চমৎকার! তারপর বুকে চুম্ব খেল শামীর নাকে। ‘একেল্স দম্পতি এসেছিল।’

‘একেল্স? ও-রকম কাউকে তো...’

‘চেনো না, তাই তো? না চেনারই কথা। রহস্যজনকভাবে যে-লোকটার মৃত্যু হয়েছে তিনি হলেন মিসেস একেল্সের ভাই। অদৃশহিলা তাঁর স্বামীকে নিয়ে এসেছিলেন।’

‘আমাকে ডাকা উঁচিত ছিল তোমার, মৃই ডিয়ার।’

‘দরকার ছিল না আসলে। তাঁদেরকে তেমন একটা সাজ্জনা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি। আচ্ছা, জুলিয়ান, আগামীকাল যদি তোমার খাবারের বদোবস্ত করে দিয়ে যাই, কষ্ট করে একটা দিন চালিয়ে নিতে পারবে না? আমার একটু লগুনে যাওয়া দরকার।’

‘লগুনে?’

‘জেন আন্টির সঙ্গে দেখা করা উচিত আমার।’

সাত

দু’সপ্তাহ হলো লগুনে আছেন মিস জেন মার্পল, রাজধানী শহরের আনন্দ উপভোগ করছেন, নিজেকে ঠিকমত মানিয়ে নিয়েছেন ভাগ্নের স্টুডিয়ো ফ্লাটের সঙ্গে।

‘রেমণকে অনেক ধন্যবাদ,’ বিড়বিড় করে

বললেন তিনি, 'সে আর জোয়ান গেছে আমেরিকায়, পীড়াগীড়ি করে আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে। তা না-হলে এত লম্বা একটা সময়ের জন্য আসা হত না লওনে।' তাকালেন বাক্ষের দিকে। 'এবার বলো তো, সোনামণি, তোমার সমস্যাটা কী।'

বাখ্শ, মিস মার্পলের প্রিয় ধর্মকন্যা, নিজের সবচেয়ে ভাল ফেল্ট হ্যাটিটাকে ঠেলা মেরে মাথার আরেকটু পিছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে কাহিনিটা সংক্ষেপে কিন্তু শুধুয়ের বলল তাঁকে।

'আচ্ছা, আচ্ছা,' বাক্ষের কথা শেষ হওয়ার পর মাথা ঝোকাতে ঝোকাতে বললেন মিস মার্পল, 'এ-ই তা হলে ঘটনা?'

'হ্যাঁ। সেজনাই ছুটে এসেছি আপনার কাছে। আচ্ছি, আপনি জানেন আমি তেমন একটা বৃক্ষিমতী না...'

'কে বলেছে? তুমি যথেষ্ট চালাক।'

'না। আমি জুলিয়ানের মত বৃক্ষিমান না।'

'জুলিয়ান, বলা ভাল, যতটা না বৃক্ষিমান তারচেয়ে বেশি জ্ঞানী।'

'আমি তো তা-ও না। সেজনাই বুঝতে পারছি না কী করা উচিত এখন। কথাগুলো বলতে পারতাম জুলিয়ানকে, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিল...'

'বুঝতে পেরেছি। কাজের কথায় আসি। সব শুনলাম তোমার কাছ থেকে। কিন্তু কিছু বলার আগে জানতে চাই, তোমার কী মনে হয়।'

'আমার মনে হয়, দেখে যতটা সাধারণ লাগছে, আসল ঘটনা তত সাধারণ না। কোথাও-না-কোথাও কোনো-না-কোনো প্যাঁচ আছে। গির্জায় যে-লোকটা যাবা যাচ্ছিলেন তিনি স্যাংচুয়ারি সম্পর্কে সব কিছু জানেন। মানে, তিনি যথেষ্ট পড়াশোনা করেছেন, উচ্চশিক্ষিত বলা যায়। তিনি যদি নিজেকে শুলি করে থাকেন, শুধু স্যাংচুয়ারি শব্দটা বলার জন্য একটা গির্জায় হাজির হবেন না। আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, স্যাংচুয়ারি মানে হচ্ছে, মনে করুন পাকড়াও করার জন্য ধাওয়া করা হয়েছে। আপনাকে, আপনি যদি কোনো গির্জায় ঢুকে পড়তে পারেন তা হলে বেঁচে গেলেন।

ধাওয়াকারীরা তখন আর স্পর্শ করতে পারবে না আপনাকে। এমন একটা সময় ছিল যখন, আপনি যদি আইনভঙ্কারীও হন, আইন কিছু বলতে পারত না আপনাকে, কারণ আপনি গির্জায় আশ্রয় নিয়ে স্যাংচুয়ারি বলেছেন।'

জিজ্ঞাসু দষ্টিতে মিস মার্পলের দিকে তাকুল সে। তিনি কিছু বললেন না, শুধু মাথা ঝাকালেন।

বাখ্শ বলে চলল, 'একেল্স দম্পত্তিকে দেখে সম্পূর্ণ অন্যরকম মনে হয়েছে আমার। কেমন যেন অশিক্ষিত, আর অমার্জিত। আরেকটা কথা। ঘড়িটার পিছনদিকে-মৃত লোকটার ঘড়িটার কথা বলছি-দুটো আদক্ষর ছিল: ড্রিউ এবং এস। ওটোর ডালা খুল দেখেছি আমি। ডালার ভিতরের দিকে খুবই ছোট অক্ষরে লেখা ছিল: "টু ওয়াল্টার ফ্রম হিয় ফাদার।" সঙ্গে তারিখও ছিল। নামটা খেয়াল করুন: ওয়াল্টার। কিন্তু একেল্স দম্পত্তি লোকটার নাম বলেছে উইলিয়াম। কখনও বিল, আবার কখনও উইলিও বলেছে।'

কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুললেন মিস মার্পল, কিন্তু বাখ্শ তাড়াঢ়ো করে বলল, 'আমি জানি আপনি কী বলবেন। জন্মের পর শ্রীষ্টান ছেলেমেয়েদের যে-নাম দেয়া হয়, সবসময় সে-নামে ডাকা হয় না তাদেরকে। আমি বলতে চাইছি, ধরুন আপনার নাম রাখা হলো উইলিয়াম। আপনাকে "পর্জি" বা "ক্যারোট" নামে ডাকা হতে পারে। কিন্তু তাই বলে আপনার নাম ওয়াল্টার, অথচ আপনার আপন বোন আপনাকে বলবে উইলিয়াম বা বিল-এটা মেনে নেয়া যায় না।'

'তারমানে তুমি বলতে চাচ্ছ ওই মহিলা মিস্টার ওয়াল্টারের বোন না?'

'না, ওই মহিলা মিস্টার ওয়াল্টারের বোন না। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমির। আর দু'জনের কী বিকট চেহারা! আপনি দেখলে বুঝতেন। ওরা ভিকারেজে কেন এসেছিল জানেন? মিস্টার ওয়াল্টারের সঙে যা যা ছিল সব নেয়ার এবং মরার আগে হতভাগা লোকটা কিছু বলে গেছে কি না তা জানার জন্য। আমি যখন বললাম কিছুই বলেননি

মিস্টার ওয়াল্টার, তখন আত্ম এক স্বত্ত্ব দেখতে পেয়েছি ওই দু'জনের চেহারায়। আমার কী মনে হয়, জানেন? আমার মনে হয়, ওই একেল্স দম্পত্তিই আসলে শুলি করেছে মিস্টার ওয়াল্টারকে।'

'বুন?'

'হ্যা, বুন। সেজনাই আপনার কাছে এসেছি, আচ্ছি। আরেকটা কথা। লোকটা মরার আগে দু'বার প্রিয় শব্দটা বলেছে আমাকে। আমার মনে হয়, সে চাছিল ওর জন্য কিছু করি আমি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সেটা কী সে-ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই আমার।'

দু'-এক সেকেণ্ড কী যেন ভাবলেন মিস মার্গিল। তারপর বললেন, 'লোকটা গির্জায় গেল কেন?'

'মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, স্যাংচুয়ারি বলতে চাইলে যে-কোনো গির্জাতেই যেতে পারতেন তিনি, তা না-করে আমাদের প্রামের গির্জায় গেলেন কেন, তা-ই তো? আমিও ভেবেছি কথাটা, কিন্তু কোনো উভর পাইনি। তিনি যে-বাসে চড়েছেন সেটা লজ্জন থেকে দিনে চারবার ঘাতাঘাত করে আমাদের প্রামে।'

'কিন্তু কোনো-না-কোনো জবাব আছে প্রশ্নটার। প্রথম কথা, যে-লোক মরার আগে স্যাংচুয়ারি বলতে পারে সে আর যা-ই হোক মানসিক বিকারগত্ত হতে পারে না। দুই, কোনো একজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য সে গিয়েছিল তোমাদের চিপিং ক্লেগহর্ন-এ। গোটা তো বেশি বড় না। সবাইকেই কমবেশি চেনো তুমি, বাস্তু। বলো তো, কার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে লোকটা?'

প্রামের অধিবাসীদের চেহারাগুলো একে একে মনে করার চেষ্টা করল বাস্তু। কিছুক্ষণ পর যাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'বলতে

পারলাম না, আচ্ছি।'

'লোকটা কারও নাম বলেনি?'

'জুলিয়ানের নাম বলেছে।'

'জুলিয়ান?'

'আসলে ঠিকমত শুনিনি, আমার মনে হয়েছে জুলিয়ানের নামটাই বোধহয় উচ্চারণ করেছিল সে।'

'শুব্দটা কি জুলিয়া হতে পারে?'

আবারও কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল বাস্তু। তারপর যাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'হতে পারে, আমি আসলে নিশ্চিত না। তবে জুলিয়া নামের কেউ থাকে না চিপিং ক্লেগহর্ন।'

'লোকটা যখন ওই নাম উচ্চারণ করল তখন কী হয়েছিল বলো তো?'

চোখ বক্ষ করল বাস্তু, ফিরে গেল নিকট অতীতে। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'চ্যাসেলের ধাপে পড়ে আছে লোকটা। জানালা দিয়ে রোদ আসছে। লাল আর নীল কাচ ভেদ করে আসছিল বলে কেমন রত্নপাথরের মত...'

'রত্নপাথর?' বলে উঠলেন মিস মার্গিল।

'মানে জ্যোলে?'

চোখ ঝুলল বাস্তু। 'জানি না আচ্ছি। আমি যা ঠিকমত শুনিনি সে-ব্যাপারে আন্দাজে কিছু বলতে পারব না আপনাকে। তারচেয়ে বরং সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কিছু বলি আপনাকে।'

'সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ?'

'হ্যা।'

'কী সেটা?'

'মিস্টার ওয়াল্টারের কোট।'

'কোট?'

'হ্যা। লোকটার কোট নিয়ে একেল্স দম্পত্তির বাড়াবাড়ি দেখে সন্দেহ হয় আমার। ডাঙ্কার প্রিফিথ্স মিস্টার ওয়াল্টারকে ভালমত দেখার আগে আমরা দু'জনে মিলে কোটটা খুলে

নিউজ কর্নার

প্রোপ্রাইটর: মোঃ বাহালুল কবীর (বাহার)

দোকান নং ১২, বাড়ি নং ১, রোড নং ১০, আলতা প্রাজা

ধানমন্ডি, ঢাকা।

এখানে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের সমস্ত নতুন বই পাওয়া যায়।

ফোন: ৮১২৮৩০৫৬, মোবাইল: ০১৮১৯১৫৪৮৪৮

নিই। ওটা ছিল পুরনো, হেঁড়াফাটা আর ময়লা-এ-রকম একটা জিনিস কখনও নিতে ঢাইবে না কেউ। মিসেস এক্লেস আসলে তান করেছেন ভাইয়ের জন্য আবেগ উথলে উঠছিল তাঁর।'

'তারপর?'

'সিডি বেয়ে উপরতলায় উঠছিলাম আমি। চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পাই, হাত দিয়ে

অন্তু এক ভঙ্গি করেছেন মিস্টোর একেলস-ফেন নাগালে পেয়ে গেছেন কোটটা, হাতভাঙ্গেন ওটাৰ পকেটগুলো। যা-হোক, জাহাগামত গিয়ে কোটটা হাতে নিয়ে ভালমত দেবি। দেখতে পাই, আলাদা সুতা দিয়ে ওটাৰ একজায়গায় সেলাই কৰা। সাবধানে খুলাম সেলাইটা, ভিতৱ্ব থেকে পেলাম একটুকৰো কাগজ।

তারপৰ আগের মত করে সেলাই করে দিলাম যাতে একেলস দম্পত্তি কিছু বুবাতে না পারে। তাঁৰা কিছু বুবাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না আমার। তবে জোৱ দিয়ে কিছু বলতে পাৰব না ওই ব্যাপারে। যা-হোক, এ-কাজ করতে গিয়ে বেশ দেৱি হৱ আমাৰ। পৰে কোটটা তাঁদেৱ হাতে দেয়াৰ সময় বানিয়ে একটা কথা বলে দিই।'

'একটুকৰো কাগজ?' জ্ঞ উঁচু কৰলেন মিস মার্পল।

নিজেৰ হ্যাণ্ডব্যাগ খুলল বাধও। 'জুলিয়ানকে দেখাইনি এটা।'

'কেন?'

'কাৰণ দেখানোয়াত্ৰ নীতিবাক্য শোনাতে আৱশ্য কৰত: কাজটা ঠিক কৱিনি, একেলস দম্পত্তিকেই দিয়ে দেয়া উচিত ছিল কাগজটা ইভান্দি ইভান্দি। আমি ভেবেছি এটা আপনাৰ কাছে নিয়ে এলেই সবদিক দিয়ে ভাল হবে।'

কাগজটা হাতে নিলেন মিস মার্পল, উল্টেপাল্টে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপৰ বললেন, 'রেলস্টেশনেৰ ক্লোকৰমেৰ টিকেট।'

'প্যাডিষ্টন স্টেশন, না?'

মাথা ঝাকালেন মিস মার্পল।

'মিস্টাৰ ওয়াল্টাৰেৰ পকেটে প্যাডিষ্টনেৰ একটা রিটাৰ্ন টিকেট পাওয়া গেছে,' বলল বাধও।

ঝট কৰে চোখ তুলে তাকালেন মিস

মার্পল, 'বাখ্শেৰ চোখে চোখে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপৰ জৰুৰি কষ্টে বললেন, 'একটু দোড়াৰ্প কৰাৰ সময় হয়েছে তা হলে। কিষ্ট, বাধও, একটা কথা আগেই বলে রাখি, সাবধান থাকতে হবে আমাদেৱ। এখনে আসাৰ সময় তোমাৰ কি মনে হয়েছে কেউ অনুসৰণ কৰছে তোমাকে?'

'অনুসৰণ!'

'হ্যা, অনুসৰণ। এবং ব্যাপারটা খুবই সম্ভব। যে-কোনো কিছু ঘটে যেতে পাৰে ধৰে নিয়ে সেভাৰে কাজ কৰতে হবে আমাদেৱকে এখন,' তাড়াহংড়া কৰে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

আট

দেড় ঘণ্টা পৰ।

অ্যাপল বাউ নামেৰ ছোট আৰ নিৰ্জন একটা সংৱাইখানায় বাখ্শেৰ যুথোয়ুথি বসে আছেন মিস মার্পল। স্টেক, কিডনি পুড়ি, অ্যাপল ট্যান আৰ কাস্টাৰ্ড দিয়ে পেটপূজা কৰছেন দু'জন। যাতে সহজে চেনা না-যায় সেজন্য অতি-সাধাৰণ পোশাক পৰেছেন দু'জনই, বাজাৰ থেকে মামুলি গৃহস্থালী জিনিস কিনে ভৰ্তি কৰেছেন যাৰ যাৰ ব্যাগ।

গালে আচ্ছামত রুজ আৰ ঠোঁটে কড়া কৰে লিপিস্টিক লাগানো একটা মেয়ে সংৱাইখানায় ঢুকল এমন সময়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল বাখ্শদেৱ টেবিলৰ দিকে। মিস মার্পলৰ হাতেৰ কাছে নামিয়ে রাখল একটা এনভেলপ। 'এই যে, মিস,' বলল তাড়াহংড়া কৰে।

'থ্যাক্স যু, গ্যাডিস,' বললেন মিস মার্পল, 'থ্যাক্স যু ভোৰি মাচ।'

'আপনাৰ কোনো কাজে লাগতে পাৰলে সবসময়ই ভাল লাগে আমাৰ,' বলে চলে গেল গ্যাডিস।

যুখ খুলে এনভেলপটাৰ ভিতৱ্ব তাকিয়ে সেটা বাখ্শেৰ দিকে ঠেলে দিলেন মিস মার্পল। 'মেলচেস্টাৱেৰ সেই যুবক ইসপেষ্টৰ কি এখনও আছে?'

'জানি না,' বলল বাধও। 'মনে হয় আছে।'

'সে না-থাকলে চীফ কনস্টেবলকে ফোন কৰতে হবে। আমাৰ মনে হয় আমাৰ কথা

এখনও মনে রেখেছেন তিনি।'

'অবশ্যই তিনি মনে রেখেছেন আপনার কথা। আপনাকে মনে রাখবে সবাই। আপনি অনন্য,' উঠে দাঁড়াল বাঞ্ছ।

নয়

প্যাডিংটন স্টেশনে পৌছে সোজা লাগেজ রুমে গিয়ে চুকল বাঞ্ছ। ক্লোকরুমের টিকেটটা দেখাল। কিছুক্ষণ পর একটা ছেঁড়াফটা পুরনো স্যুটকেস দেয়া হলো ওকে। ওটা নিয়ে প্ল্যাটফর্মে চলে এল সে।

গ্রামে ফেরার পথে কিছুই হলো না। চিপং ক্রেগহন্রের কাছে এসেছে ট্রেন, থামি থামি করছে, এমন সময় উঠে দাঁড়াল বাঞ্ছ, স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে এগোতে লাগল দরজার দিকে। ট্রেন থামামাত্ত কামারার দরজা দিয়ে নামল সে। আর ঠিক তখনই প্ল্যাটফর্ম ধরে ছুটে এল একটা লোক, বাঞ্ছের হাত থেকে একথাবায় স্যুটকেসটা নিয়ে ছুট লাগাল।

'ধরুন!' চিৎকার করে উঠল বাঞ্ছ। 'ধরুন ওকে, ধরুন! আমার স্যুটকেস নিয়ে পলাচ্ছে লোকটা।'

পলাচ্ছন্নরত লোকটার পথ রোধ করে দাঁড়াল টিকেট কালেক্টর। বলতে শুরু করল, 'দেখো, কাজটা করতে পারো না তুমি। এটা ঠিক না...' বুকে বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি খেয়ে কথা বক হয়ে গেল ওর, একদিকে সরে যেতে বাধ্য হলো সে।

স্যুটকেসটা নিয়ে স্টেশনের বাইরে চলে গেল লোকটা। একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। গাড়ির জানালা দিয়ে স্যুটকেসটা ভিতরে চুকিয়ে দিল সে। দরজা খুলে উঠতে যাবে, এমন সময় ওর জামা খামচে ধরল শক্তিশালী একটা হাত।

পুলিশ কনস্টেবল অ্যাবেল বললেন, 'ঘটনা কী, খুন তো?'

দৌড়াতে দৌড়াতে হাজির হলো বাঞ্ছ, ইঁপিয়ে গেছে। 'আমার স্যুটকেস ছিনিয়ে নিয়েছে এই লোক। আমি ট্রেন থেকে নামামাত্ত কাজটা করেছে সে।'

'বাজে কথা!' মুখ ঝামটা যেরে বলল লোকটা। 'এই ভদ্রমহিলা কী বলছেন কিছুই

বুঝতে পারছি না। ওটা আমার স্যুটকেস। ওটা নিয়ে এইমাত্ত ট্রেন থেকে নামলাম আমি।'

বাঞ্ছের দিকে তাকালেন অ্যাবেল। 'আপনি বলছেন ওটা আপনার স্যুটকেস?'

'হ্যাঁ। অবশ্যই।'

এবার লোকটার দিকে তাকালেন অ্যাবেল। 'আর আপনি বলছেন আপনার?'

'জী, জনাব, ওটা অবশ্যই আমার স্যুটকেস।'

লোকটা লম্বা। চামড়া রোদেপোড়া। পরিপাটি পোশাক পরনে। কথায় অঙ্গুত টান আছে।

গাড়ির ভিতর থেকে একটা নারীকষ্ট বলে উঠল এমন সময়, 'এটা অবশ্যই তোমার স্যুটকেস, এডউইন। ওই মহিলা কী বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'সমস্যাটার সমাধান করা দরকার,' বললেন অ্যাবেল, তাকালেন বাঞ্ছের দিকে। 'ম্যাডাম, আপনি বলছেন ওটা আপনার স্যুটকেস। তা হলে ভিতরে কী আছে ভালমত জানার কথা আপনার। বলুন তো, ওটার ভিতরে কী কী আছে?'

'কাপড়চোপড়,' বলল বাঞ্ছ। 'ফুটকি ফুটকি দাগ আর বীভাবের লোমের কলারওয়ালা একটা কোট, দুটো উলের জাম্পার আর একজোড়া জুতো।'

এবার লম্বা লোকটার দিকে তাকালেন অ্যাবেল।

'আমি থিয়েটারে কাজ করি-কস্টিউমার। থিয়েটারের কাজে লাগে এমন সব জিনিস আছে ওই স্যুটকেসের ভিতরে। আমাদের একটা শৌখিন প্রদর্শনী আছে এখানে, তাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি ওগুলো।'

'খুব ভাল,' বললেন অ্যাবেল। 'তা হলে এবার স্যুটকেসটা খুলে দেখলেই মীমাংসা হয়ে যায়, নাকি? চলুন পুলিশ স্টেশনে যাওয়া যাক। আর আপনার যদি বেশি তাড়া থাকে তা হলে পার্সেল অফিসে গিয়ে খুলে দেবি স্যুটকেসটা।'

'ঠিক আছে, চলুন,' বলল লোকটা। 'ও ভাল কথা, আমার নাম মস-এডউইন মস।'

স্যুটকেসটা নিজের হাতে নিলেন কনস্টেবল অ্যাবেল, গিয়ে চুকলেন স্টেশনে।

‘পার্সেল অফিসে নিয়ে যাচ্ছি এটাকে, জর্জ,’
হাতে ধরা স্যুটকেসটা দেবিয়ে বললেন টিকেট
কালেষ্টেরকে।

বলা বাহ্ল্য, জর্জ তখন জ্বলত দৃষ্টিতে
তাকিয়ে আছে মসের দিকে। বিরাশি সিক্কার
যুসির কারণে এখনও ব্যথা করছে ওর বুক।

দশ

পার্সেল অফিসের কাউন্টারে স্যুটকেসটা নামিয়ে
রাখলেন কনস্টেবল অ্যাবেল। তাঁর দু'পাশে
দাঁড়িয়ে আছে বাঁধ আর মিস্টার এডউইন মস।
প্রতিহিংসাপরায়ণ দৃষ্টিতে দু'জনের দিকে
তাকিয়ে আছে দু'জন।

তালা মারা ছিল না, তাই ডালাটা ঝুলতে
কোনো অসুবিধা হলো না কনস্টেবল
অ্যাবেলের। ‘আহ!’ ভিতরে একনজর
তাকিয়েই বলে উঠলেন তিনি।

স্যুটকেসের ভিতরে দেখা যাচ্ছে একটা
লম্বা পুরনো ছেঁড়াফাটা টুইডের কোট, কলার
বীভাবের-লোম দিয়ে বানানো। উলের দুটো
জ্বাস্পার আর একজোড়া কান্টি শুণও আছে।

‘ঠিক যেমনটা আপনি বলেছিলেন,
ম্যাডাম,’ বলে বাঞ্ছের দিকে তাকালেন
অ্যাবেল।

হতাশ আর আশাভঙ্গের স্পষ্ট ছাপ
পড়েছে মিস্টার এডউইন মসের চেহারায়।
‘আমি ক্ষমা চাচ্ছি,’ বললেন তিনি। ‘আমি
আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাচ্ছি’ বাঞ্ছের দিকে
তাকালেন। ‘ম্যাডাম, বিশ্বাস করুন, আমি খুবই
দৃঢ়বিত। জানি আমি যা করেছি আপনার সঙ্গে
তা ক্ষমার অযোগ্য, তারপরও ক্ষমা প্রার্থনা
করছি আপনার কাছে।’ ঘাট করে হাত ত্ত্বলে
হাতঘড়ি দেখলেন বা দেখার ভান করলেন।
‘একদম সময় নেই, এখনই যেতে হবে
আমাকে। আমার স্যুটকেসটা হয়তো ট্রেনেই
যায়ে গেছে।’ হ্যাটটা একটু উঁচু করে বাঁধকে
বললেন আবারও, ‘পারলে ক্ষমা করে দিন
আমাকে।’ তারপর একচুটে বেরিয়ে গেলেন
পার্সেল অফিস থেকে।

‘লোকটাকে এত সহজে চলে যেতে
দিলেন?’ অনুযোগের সুরে কনস্টেবলকে বলল
বাঁধ।

জবাবে কিছু বলার আগে চোখ টিপলেন
অ্যাবেল। ‘বেশি দ্রুতে পারবে না সে।
নজর রাখা হচ্ছে ওর উপর।’

‘ওহ,’ আশ্রম্ভ হলো বাঁধ।

‘মিস মার্পল ফোন করেছিলেন আমাকে।
অনেক কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। আগামীকাল
সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে
ইস্পেষ্টার বা সার্জেন্ট।’

এগারো

বাঞ্ছের সঙ্গে যখন দেখা হলো ইস্পেষ্টার
জ্যাডকের, পুরনো বন্ধুর মত অকৃত্রিম আর
মধুর হাসি হাসলেন তিনি।

‘আবারও অপরাধ সংঘটিত হলো চিপিং
ক্রেগহর্নে,’ বললেন তিনি।

‘আমাকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য
এসেছেন আপনি?’ সরাসরি কাজের কথায় চলে
গেল বাঁধ। ‘নাকি কিছু জানানেন?’

‘প্রথমে কয়েকটা কথা বলি। নজর রাখা
হয়েছে মিস্টার আর মিসেস একেলসের উপর।
এ-অঞ্চলে সংঘটিত কয়েকটা ডাকতির সঙ্গে
জড়িত ওরা দু'জনে-কথাটা বিশ্বাস করার মত
যথেষ্ট কারণ আছে। আরেকটা কথা। স্যাওৰন
নামে মিসেস একেলসের বিদেশফেরত একটা
ভাই আছে আসেলেই। কিন্তু গির্জায় আপনি যে-
মূর্মূ লোকটাকে দেখতে পেয়েছিলেন, সে
অব্যাহৃত স্যাওৰন না।’

‘জানি। তাঁর নাম ছিল ওয়াল্টার।’

মাথা ঝাঁকালেন ইস্পেষ্টার। ‘লোকটার
পুরো নাম ওয়াল্টার সেইট জন। আমি জানি
ওর জন্য একটা নরম জায়গা তৈরি হয়েছে
আপনার মনে, কারণ মৃত্যুপথ্যাত্মী লোকটার
পরিচয় না-জেনেই ওকে সারিয়ে তোলার
যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন আপনি।’

চুপ করে আছে বাঁধ, রূদ্ধশাসে অপেক্ষা
করছে ইস্পেষ্টারের পরের কথাগুলো শোনার
জন্য।

‘আসলে একজন কয়েদি ছিল সে,’ বলে
চললেন ইস্পেষ্টার। ‘আটচালিশ ঘণ্টা আগে
চারিংটন প্রিম থেকে পালিয়েছিল।’

‘আইনের লোকেরা খুঁজছিল তাঁকে,’
বিড়বিড় করে বলল বাঁধ, ‘আর সেজন্যাই

গির্জায় আশ্রয় নিয়ে স্যাঁচুয়ারি বলেছেন
তিনি।' তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল, 'তার
অপরাধটা কী ছিল জানতে পারি?'

'জী, পারেন। কিন্তু কাহিনিটা অনেক লম্বা
আর জটিল।'

'হোক। সব কথা জানতে চাই আমি।'

'বেশ কয়েক বছর আগে এক নর্তকীর
আবির্ভাব হয়। মিউডিক হলগুলো মাতিয়ে
ভুলেছিল সে। আমার মনে হয় না ওর নাম
ওনেছেন আপনি, যে-বিশেষ নাচ পরিবেশন
করত সে সে-ব্যাপারেও কিছু জানেন।'

'কী নাচ?'

'আলাদিন ইন দ্য কেইভ অভ জ্যেলস।'

'না, ও-রকম কোনোকিছুর কথা শুনিনি
কখনও।'

'যদি কিছু মনে না-করেন, খোলাখুলি ই
বলি-নাচের সময় একগাদা রাইনস্টেন ছাড়া
কাপড়ের তেমন একটা বালাই থাকত না ওর
গায়ে।'

বাঞ্ছ কোনো মন্তব্য করল না।

'বলা বাহ্যিক, নর্তকী হিসেবে যতটা না,
আকর্ষণীয় শরীরের জন্য তারচেয়ে বেশি
ছাড়িয়ে পড়ে ওর নাম,' বলে চললেন
ইঙ্গপেষ্টের। 'যা-হোক, এশিয়ার কোনো এক
দেশের রাজা, ভূলোকের সম্মানের কথটা
মাথায় রেখে নামটা বললাম না, ওই নর্তকীর
প্রেমে মজে যান। অনেক উপহার দেন তিনি
ওই মেয়েটাকে, যার মধ্যে পান্নার চমৎকার
একটা নেকলেসও ছিল।'

'জ্যেল,' বিড়বিড় করে বলল বাঞ্ছ।

বাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন
ইঙ্গপেষ্টের ক্র্যাডক। 'প্রেমটা টেকেনি বেশিদিন,
টেকার কথাও না।'

'নর্তকীর নাম কী ছিল?'

'আসল নাম বলতে পারব না। তবে ওর

স্টেজনেইম ছিল যুবেইদা।'

'তারপর?'

'পান্নাৰ নেকলেসটা ওৱা কাছেই ছিল।
তারপর ওটা একসময় চুৰি হয়ে যায়। ওৱা
দ্ব্রীপ্রক্রম থেকে স্বেফ উধাও হয়ে যায়
জিনিসটা। থিয়েটা-কৰ্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ,
যুবেইদাই কাৰিগৰি কৰে সৱিয়ে ফেলেছে
ওটা। কাৰণ এৱে ফলে হইচই হবে, মেয়েটাৰ
নাম ছড়াবে-এ-ৱৰকম কাজকে বলা হয়
পাৰলিসিটি স্ট্যান্ট। আবাৰ এমনও হতে পাৱে,
আৱও খাৰাপ কোনো উদ্দেশ্য ছিল ওৱা।'

মনোযোগ দিয়ে ইঙ্গপেষ্টের কথা শুনছে
বাঞ্ছ।

'নেকলেসটা আৱ বুঁজে পাওয়া যায়নি
কখনোই। তবে তদন্ত কৰাৰ সময় ওই
ওয়াল্টাৰ সেইন্ট জনেৰ উপৰ নজৰ পড়ে
পুলিশেৰ। লোকটা ছিল উচ্চশিক্ষিত,
উচ্চবংশীয়। কিন্তু হলে কী হবে, কাজেকৰ্মে
ছিল দু'নম্বৰী, সোজাকথায় বাটপাৱ। গহনা
বানানোৰ একটা প্ৰতিষ্ঠান ছিল ওৱা, বলা ভাল
গহনা বানানোৰ একটা প্ৰতিষ্ঠানেৰ সঙ্গে জড়িত
ছিল সে। কিন্তু পুলিশেৰ সন্দেহ, গহনাচোৱদেৱ
সঙ্গে প্ৰত্যক্ষ যোগসাজশ ছিল প্ৰতিষ্ঠানটাৰ।'

চুপ কৰে আছে বাঞ্ছ।

'পান্নাৰ যে-নেকলেসেৰ কথা বললাম,
পুলিশেৰ কাছে প্ৰমাণ আছে, ওটা ওয়াল্টাৰেৰ
হাত দিয়েই উধাও হয়েছে। আৱও কয়েকটা
দামি দামি গহনা চুৰিৰ সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ে ওৱা
নাম। ব্যস, আৱ কী? মালা হয় ওৱা নামে,
জেলে পাঠানো হয় ওকে। কিন্তু ধূৰন্ধৰ লোক
তো, তাই কায়দামত ফাঁসানো যায়নি ওকে।
বেশিদিনেৰ শান্তি দিতে পাৱেননি আদালত।
তারপৰও সে জেল থেকে পালিয়ে যাওয়ায়
আশ্চৰ্যই হই আমৰা।'

'কিন্তু লোকটা এখনে এল কেন?'

সেবা প্ৰকাশনী এবং প্ৰজাপতি প্ৰকাশনীৰ সব ধৰনেৰ বই-এৱ জন্য বণ্ডড়ায়।

মুসলিম বুক ডিপো

আকবৱিয়া মাকেট, বণ্ডড়া।

ফোন: ৬৪২৬৪

মোবাইল: ০১৯১১৪০২৭৮২

এতক্ষণে মুখ খুল বাধ্য।

‘আমারও সে-প্রশ্নের জবাব খুঁজছি, মিসেস হার্মন। জেল থেকে পালানোর পর, খবর নিয়ে যতদূর জানতে পেরেছি, প্রথমে লগনে হাজির হয় সে। কিন্তু পুরনো সহচরদের কারও সঙ্গেই মোলাকাত হয়নি ওর। তবে মিসেস জেকব্স নামের বয়স্ক এক মহিলার সঙ্গে দেখা করে। এককালে থিয়েটারে ড্রেসার হিসেবে কাজ করতেন তিনি। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তাঁকে। কিন্তু ওয়াল্টার কেন গিয়েছিল তাঁর কাছে সে-ব্যাপারে একটা কথাও বলেননি তিনি। তবে ওই বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের জিজ্ঞেস করে জানা গেছে, বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে যায় ওয়াল্টার তখন ওর কাছে একটা সুটকেস ছিল।’

‘সুটকেসটা প্যাডিংটন স্টেশনের ক্লোকরমে নিয়ে যান মিস্টার ওয়াল্টার,’ বলল বাধ্য, ‘তারপর চলে আসেন এখানে।’

‘ওই সময়ে একেল্স দম্পত্তি আর যে-লোকটা নিজেকে এডউইন মস বলে পরিচয় দিয়েছে সে হন্তে হয়ে খুঁজছিল ওয়াল্টারকে। বলা ভাল সুটকেসটা খুঁজছিল ওরা। ওরা বাসে ঢুকতে দেখে লোকটাকে। অনুমান করে নেয় কোথায় যাচ্ছে সে। তারপর দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে চলে আসে এখানে, ঘাপাটি মেরে থাকে ওর জ্যা।’

‘তারপর সুযোগ পেয়ে শুলি চালায় মিস্টার ওয়াল্টারের উপর?’

‘হ্যা। রিভলভারটা একেল্সের। তবে আমার সদেহ শুলি করেছে মস। এবার মিসেস হার্মন, একটা প্রশ্ন করব আপনাকে। প্যাডিংটন স্টেশনে যে-সুটকেস জমা রেখেছিল ওয়াল্টার সেইটে জন, স্টো কোথায়?’

দাঁত বের করে হাসল বাধ্য। ‘আমার ধারণা জেন আষ্ট্রি কাছে।’

‘মান! আচর্য হলেন ইস্পেষ্টার।

‘প্যালটা আষ্ট্রি ই। কী ঘটতে পারে অনুমান করে নিয়ে তাঁর পরিচিত এক মেয়েকে আগেই প্যাডিংটন স্টেশনে পাঠিয়ে দেন তিনি। সঙ্গে দেন পুরনো একটা সুটকেস, ভিতরে কী ছিল তা নিচ্যাই বলতে হবে না আপনাকে। সুটকেসটা ক্লোকরমে জমা রাখে যেয়েটা,

তারপর টিকেটটা এনে দেয় আষ্ট্রির কাছে। ওটা আমাকে দেন তিনি, আর আমার কাছে যে-টিকেটটা ছিল সেটা নেন। আর কী? নির্দিষ্ট সময়ে প্যাডিংটন স্টেশনে যাই আমি, টিকেট জমা দিয়ে সুটকেসটা সংঘর্ষ করি। তারপর সেটা সঙ্গে করে নিয়ে আসি এখানে।’

এবার দাঁত বের করে হাসলেন ইস্পেষ্টার। ‘তা-ই তো বলি আমার সঙ্গে কথা বলার সময় এত খুশি খুশি শোনাছিল কেন মিস মার্ফলের কষ্ট! এখনই যাচ্ছি আমি লগনে, দেখা করতে হবে তাঁর সঙ্গে। আপনি যাবেন, মিসেস হার্মন?’

‘যাব না মানে? কাল রাত থেকে আমার দাঁতে ব্যথা। ভাবছিলাম লগনে গিয়ে ভাল একজন ডেচিস্ট দেখানো উচিত। বলুন, উচিত না?’

‘অবশ্যই,’ বললেন ইস্পেষ্টার ক্র্যাডক।

বাড়ো

প্রথমে ইস্পেষ্টার ক্র্যাডক, তারপর বাধ্য হার্মনের উৎসুক চেহারার দিকে তাকালেন মিস মার্ফল। তাঁর সামনের একটা টেবিলের উপর আছে সুটকেসটা। ‘ওটা এখনও খুলিনি আমি,’ বললেন তিনি। ‘আসলে আমার মনে হয়েছে সরকারি কোনো কর্মকর্তার উপর্যুক্তি ছাড়া কাজটা করা উচিত হবে না। তা ছাড়া,’ শান্ত কিন্তু দৃষ্টিমূর্ণ হাসি হাসলেন তিনি, ‘ওটা তালা মারা।’

‘ভিতরে কী আছে অনুমান করতে পারেন, মিস মার্ফল?’ জিজ্ঞেস করলেন ইস্পেষ্টার।

‘অনুমান করতে পারা উচিত। যবেইদার থিয়েটার-কস্টিউম। ...কিছু মনে না-করলে একটা বাটলি নিয়ে আসবেন, ইস্পেষ্টার?’

সুটকেসের তালা ভাঙতে বেশি সময় লাগল না। ডালা তোলামাত্র মিস মার্ফল আর বাধ্যের গলা দিয়ে হিঙ্কা ওঠার মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল একসঙ্গে।

জানালা দিয়ে রোদ আসছে। সুটকেসের উপর পড়ছে কিছুটা। ভিতরে অনেকগুলো রঞ্জপাথর; রোদ প্রতিফলিত হয়ে লাল, নীল, সবুজ, কমলা আলো বের হচ্ছে যেন। অন্তত এক আলোর খেলায় ভরে গেছে স্টুডিয়ো

অ্যাপার্টমেন্টের ছেট্টি ঘরটা।

‘আলাদিন’স কেইড,’ বললেন মিস মার্পল। ‘নাচ দেখানোর সময় এগুলো পরত মেয়েটা।’

‘আর ওয়াল্টারের মতো একটা লোককে খুন করার জন্য, এগুলো হাতিয়ে নেয়ার চেয়ে বড় কারণ আর কী থাকতে পারে?’ বললেন ইসপেষ্টর।

‘আমার মনে হয় যুবেইদা খুব ধূর্ত প্রকৃতির ছিল,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন মিস মার্পল। ‘মেয়েটা মারা গেছে, তা-ই না, ইসপেষ্টর?’

‘হ্যাঁ। তিনি বছর আগে।’

‘আসল নেকলেসটা কখনোই চুরি হয়নি,’ বললেন মিস মার্পল। ‘আমার মনে হয় ওটা উপহার পাওয়ার পর একেকটা পান্না কস্টিউমের একেক জায়গায় বিশেষ কায়দায় আটকিয়ে নাচতে শুরু করে মেয়েটা। তাতে দর্শকের চোখে আরও ঘোর লাগে। কিন্তু সে বুঝতে পারে, কাজটা বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে। তাই লুকিয়ে ফেলে নেকলেসটা। আসলটার মত দেখতে একটা রেপ্রিকো বানিয়ে নেয় গোপনে। পরে চুরি হয়ে যায় নকল নেকলেসটা। কিন্তু ওটা বিক্রি করেনি চোর, কারণ-চুরি করার পরই বুঝতে পারে, নকল জিনিস কজা করেছে।’

‘একটা এনভেলপ দেখা যাচ্ছে,’ সুটকেসের ডিতর হাত দিয়ে চকচকে রঞ্জপাথরগুলো সরিয়ে ওটা বের করে আনল বাঁধ।

ওর হাত থেকে এনভেলপটা নিলেন ইসপেষ্টর ড্রাইভ। ডিতর থেকে বের করলেন দুটা কাগজ। কিছুক্ষণ দেখেই ঘোষণা করলেন, ‘‘একটা ইচ্ছে ম্যারেজ সার্টিফিকেট-ওয়াল্টার এডমাণ সেইট জন আর ঘোর মসের ঘোষে। আমার মনে হয় যুবেইদার আসল নাম ওটাই।’

‘আচ্ছা, ওরা তা হলে বিয়ে করেছিল,’ বললেন মিস মার্পল।

‘আরেকটা কাগজ কৌমের?’ জানতে চাইল বাঁধ।

‘জ্যুল নামের একটা মেয়ের বার্ষ

সার্টিফিকেট।’

‘জ্যুলে?’ চিংকার করে উঠল বাঁধ। ‘এবার মনে পড়েছে আমার! জ্যুলে জিল! এবার সব মিলে যাচ্ছে খাপে খাপে। মেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যই চিপিং ক্রেগহৰ্নে গিয়েছিলেন মিস্টার ওয়াল্টার। গির্জায় মেয়ের নাম উচ্চারণ করেছিলেন আমার সামনে—জ্যুলে। আল্টি, ল্যাবার্নাম কটেজের মাঝি দম্পত্তির কথা মনে আছে আপনার? তাঁরা কারও হয়ে একটা মেয়ের দেখাশোনা করেন। মেয়েটাকে খুব ভালোবাসেন তাঁরা। যারা জানুন না তারা দেখলে বলবে, মেয়েটা তাঁদের আপন নাতনি। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে আমার, মেয়েটার নাম জ্যুলে। সবাই মেয়েটাকে জিল নামে ডাকে তো, তাই আসল নামটা বেয়াল হয়নি প্রথমে।’

মিস মার্পল বা ইসপেষ্টর কোনো মন্তব্য করলেন না।

সঙ্গাহানেক আগে স্ট্রোক হয়েছে মিসেস মাঝির। আর অনেকদিন থেকেই গুরুতর নিউমোনিয়ায় ভুগছেন মিস্টার মাঝি। দু’জনই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হাসপাতালে ভর্তি হবেন। জিলকে ভাল কোনো বাসায় রাখা যায় কি না সেটা নিয়ে ভাবছিলাম আমি। আমি চাই না ওকে ভর্তি করিয়ে দেয়া হোক কোনো ইস্টিউশনে।’

দৃষ্টি বিনিয় করলেন মিস মার্পল আর ইসপেষ্টর ড্রাইভ। বাঁধের আবেগ স্পর্শ করেছে দু’জনকেই।

‘এবার সব বুঝতে পারছি আমি,’ বলে চলল বাঁধ। ‘জেলে থাকা অবস্থাতেই মিস্টার আর মিসেস মাঝির অসুস্থিতার খবর পান মিস্টার ওয়াল্টার। বুঝতে পারেন তাঁর একমাত্র সন্তানকে ভর্তি করিয়ে দেয়া হতে পারে কোনো ইস্টিউশনে, যেখানে আদরের বদলে শাসন জোটে বেশিরভাগ সময়। ব্যাপারটা মনে নিতে পারেননি তিনি। যেভাবেই হোক পালিয়ে যান জেলখানা থেকে। মিসেস জেকবস্-এর সঙ্গে অনেক আগে থেকেই জানাশোনা ছিল তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর, ভদ্রমহিলাকে বিশ্বাস করতেন দু’জনে। তাঁদের সেই বিশ্বাস ডঙ করেননি তিনি। যা-হোক, ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করে

শুটিকেস্টা নেন মিস্টার ওয়াল্টার, হয়তো
ডেবেছিলেন ভিতরের রত্নপাথরগুলো ঠার
মেয়ের কোনো কাজে লাগতে পারে।'

'আমারও তা-ই মনে হয়, মিসেস হার্মন,'
বললেন ইসপেষ্টর।

তেরো

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' দীর্ঘশাস ফেলে বললেন
রেভারেণ্ড জুলিয়ান হার্মন, 'ফিরে এসেছ তুমি,
বাঞ্ছ। তুমি ছিলে না, মিসেস বার্ট আমাকে কী
খেতে দিয়েছে জানো? কিশ কেক। মুখের উপর
তো কিছু বলা যায় না মহিলাকে, মনে কষ্ট
পাবে, তাই আমাদের বিড়ালটাকে খেতে দিই
ওগুলো। যখন দেখলাম সে-ও খেতে পারছে
না, জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। তোমার
দাঁতের কী অবস্থা?'

'এখন বাথা কিছুটা কম মনে হচ্ছে। ভাল
কথা, জেন আস্টির সঙ্গেও দেখা হয়েছে
আমার।'

'তাই নাকি? কেমন আছেন তিনি?
ঠিকঠাক?'

'ঠিকঠাক মানে?' দাঁত বের করে হাসল
বাঞ্ছ। 'আগের মতই।'

পরদিন সকালে একশুচ্ছ টাটকা
ক্রাইসেনথেম ফুল নিয়ে গির্জায় গিয়ে ঢুকল
বাঞ্ছ।

আজও মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে
এসেছে সূর্য। আজও পুরুদিকের একটা জানালা
গলে ভিতরে চুকে পড়েছে রোদ। রত্নপাথরের
মত বহুর্বর্ণের আলোয় ভরা চ্যাপেলের একটা
ধাপে দাঁড়িয়ে আছে বাঞ্ছ।

বুব নরম আর নিচু গলায় বলল সে,
'আপনার ছোট মেয়েটাকে নিয়ে কোনো চিন্তা
করবেন না। আমি দেখব ওর যাতে কোনো
অযত্ন না হয়। কথা দিলাম।'

সময় নিয়ে গির্জার ভিতরটা পরিষ্কার-
পরিচ্ছন্ন করল সে। তারপর একটা বেত্তির
ধারে ইটু গেড়ে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ একমনে
প্রার্থনা করে ফিরে এল ভিকারেজে।

একটা রহস্যের সমাধানে কেটে গেছে
দু'দিন, ঘরে কাজ জমে গেছে অনেক। সেগুলো
শেষ' করার জন্য বাঁপিয়ে পড়তে হবে ওকে। ■



প্রকাশিত হয়েছে অনুবাদ

দি আইভরি চাইল্ড

মূলঃ স্যর হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
রূপান্তরঃ সাইফুল আরেফিন অপু

অ্যালান অ্যাও দ্য হোলি ফ্লাওয়ার গঞ্জের
প্রস্তরের কথা মনে আছে? ওদের এলাকা
থেকে আরও অনেক উত্তরে এক বিশাল
মরুভূমির পারে বাস করে দুই উপজাতি সাদা
আর কালো কেন্দ্র। আজন্য শক্ত ওরা
পরস্পরের সাদা কেন্দ্রদের শিশু-দেবতার
ওরাকল বেঁচে নেই। কিন্তু সে মারা যাওয়ার
আগে বলে দিয়েছে নতুন ওরাকলকে পাওয়া
যাবে ইংল্যাণ্ডে। এরপর মিশর থেকে গায়েব
হয়ে গেল সেই ওরাকল, লেডি রেণ্ড্যাল।

তাকে খুঁজতে অ্যালান কোয়ার্টারমেইনের সঙ্গে
যাদুর দেশ কেন্দ্রায় চলল লর্ড রেণ্ড্যাল।

যাত্তার অনেক আগেই অ্যালানকে আমন্ত্রণ
জানিয়েছিল সাদা পুরোহিতরা জেনাকে মারাদের
অভ্যাচারী হত্তি-দেবতা জেনাকে মারাদের সে
যেন কেন্দ্রায় যায়। যাদুর মাধ্যমে ওরা নাকি
জেনেছে, কেবল অ্যালানই পারবে জেনাকে
মারতে। বিনিয়য়ে অসংখ্য হাতির দাঁতের
সঞ্চান দেবে তারা। এদিকে সাদা আর কালো
কেন্দ্রদের মাঝে যুদ্ধ আসছে। ভবিষ্যদ্বাণী
বলছে: যুদ্ধে দুই উপজাতির মধ্যে একটি
তাদের দেবতাসহ ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই
যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল অ্যালান কোয়ার্টারমেইন।

দাম ■ একশ' চবিশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন: পদাৰ্থবিদ্যায় কিংবদন্তী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ কোন্ গ্রন্থটি উৎসর্গ কৰেছিলেন?

উত্তর: বিশ্বপরিচয়।

প্রশ্ন: কোনও বই-এর Identification নং-কে বলে ISBN. এটি সব বইতে থাকে। এটার মানে কী?

উত্তর: International Standard Book Number।

প্রশ্ন: রামপটল কোন্ সবজিৰ অপৰ নাম?

উত্তর: ঢেড়শ।

প্রশ্ন: কোনও খাবারকে সুন্দৰ কৰে সাজানোকে কী বলে?

উত্তর: গৱৰ্ণিশ।

প্রশ্ন: পানিৰ সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে কী উপকাৰ পাওয়া যায়?

উত্তর: রোগা হওয়া যায়।

প্রশ্ন: উগোৰ বৰ্ণনা কৰা হয় কোন্ গানে?

উত্তর: কৌর্তন।

প্রশ্ন: T ZONE কোথায় দেখতে পাওয়া যায়?

উত্তর: মুখমণ্ডল।

প্রশ্ন: ঘাঁড় ছাড়া অন্য কোন্ প্রাণীকে ইংৰেজিতে Bull বলে?

উত্তর: পুৰুষ হাতিকে Bull বলে।

প্রশ্ন: অবাঞ্চলি হয়ে জন্ম নিলেও কবিয়াল হিসেবে নাম কৰেছিলেন আঞ্চনী ফিরিসি, ইনি কেন্দ্ৰ দেশেৰ?

উত্তর: পৃতুগাল।

প্রশ্ন: একটি জনপ্রিয় Fast food Kati Roll- এৰ সূচনা কোথায় হয়েছিল?

উত্তর: এটি কলকাতা শহৰেৰ নামকৰা হোটেল নিজাম থেকে প্ৰথম সূচনা হয়েছিল। প্ৰথমে এটাৰ নাম ছিল কাঠি রোল, পৰিবৰ্ত্তীতে কাটি রোল হিসেবে পৰিচিতি পেয়েছে।

প্রশ্ন: মুখৰোচক খাবাৰ ডালমুট কোন্ ডাল দিয়ে তৈৰি হয়?

উত্তর: মুগডাল।

প্রশ্ন: ফুটস কেককে কী বলে?



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

উত্তর: ক্ৰিসমাস কেক।

প্রশ্ন: কোন্ পৰ্যটন কেন্দ্ৰে তেনজিং রক দেখা যায়?

উত্তর: দার্জিলিং।

প্রশ্ন: ২৪শে ডিসেম্বৰ কোন্ বিষ্যাত সঙ্গীত শিল্পীৰ জন্মদিন?

উত্তর: মোঃ রফি।

প্রশ্ন: ২৬শে ডিসেম্বৰ Boxing day. এই দিনটিৰ সূচনা কোন্ দেশে হয়েছিল?

উত্তর: অস্ট্ৰেলিয়া।

প্রশ্ন: গৰ্জিয়া প্ৰাৰ্থনা শেষে 'আমেন' বলা হয়, এৰ অর্থ কী?

উত্তর: তবে তাই হোক।

প্রশ্ন: দাঁড়াও পথিক বৰ, জন্ম যদি বক্সে তব তিষ্ঠ ক্ষণকাল-কে লিখেছেন?

উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

প্রশ্ন: প্ৰজাপতি কী থেকে হয়?

উত্তর: পঁয়োপাকা।

প্রশ্ন: পিসোলিকান্ডুক প্ৰাণীকে কী বলে?

উত্তর: প্যাসোডিন।

প্রশ্ন: ১ কিলোমিটার কত মিটার?

উত্তর: ১ হাজার মিটার।

প্রশ্ন: ক্রিসমাস ক্যারল কী?

উত্তর: গান।

প্রশ্ন: শুগী গাইন বাঘা বাইন কার লেখা?

উত্তর: উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর।

প্রশ্ন: সুর্যের সবচেয়ে কাছের এহ কী?

উত্তর: বৃথ।

প্রশ্ন: কোন গাছকে ক্রিসমাস গাছ হিসেবে দেখা যায়?

উত্তর: পাইন।

প্রশ্ন: দিল্লি চলো—এই উভিতি কার?

উত্তর: মেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর।

প্রশ্ন: সুকুমার রায়ের 'হ'কেমুয়ো হ্যাঙ্লা'-র বাড়ি কোথায়?

উত্তর: বাংলায়।

প্রশ্ন: কারও মুখের ছবি আঁকলে তাকে কী বলে?

উত্তর: পোত্রেট।

সঞ্চাহে: ফরিদা ইয়াসমিন

দুটি কণিকা

সামদাদ হোসেন সোহাগ

● আমরা যদি প্রতিটা হাসির বিনিময়ে আল্লাহর শোকর আদায় না করতে পারি তা হলে প্রতি ফোটা অঞ্চল বিকল্পে অভিযোগ করারও কোনও অধিকার নেই।

● সিংহের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কী চিন্তা করবে? আমি সিংহ খাই না। তাই সিংহও আমাকে খাবে না?

তবে কেন এই চিন্তা করো যে, আমি তো সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি, তবু কেন কেউ-কেউ আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করে?

তুমি দুশ্মার সবচেয়ে ভাল যানুষটি হলেও তোমার ঘৃণাকারী থাকবে। তাদের কথা শোনো এবং ভুলে যাও। সেগুলো নিয়ে ভাবতে বসলে শুধু নিজের হতাশাই বাঢ়বে।



প্রকাশিত হয়েছে

ওয়েস্টার্ন

তিনটি বই একত্রে

কারুসাজি/কাঞ্জী শাহবৃন হোসেন: জ্যাক কার্মাডি তার নিউ মেরিকোর প্রান্তে শহরে ফিরে এসেছে বুনো ঘোড়া বিক্রি করবে বলে। প্রচুর টাকার প্রশ্ন জড়িত এ কারবারে। সেনাবাহিনীর কাছে বিক্রি করবে ঘোড়া। কিন্তু শহরের কেউ কেউ পছন্দ করতে পারল না জ্যাকের প্রত্যাবর্তন। গড়ন হার্মার এদের একজন। এক যুগ আগে জ্যাকের পরিবারের প্রতি তার চরম অন্যান্য আচরণের জন্যে মনে মনে ভয় পাছে সে। প্রতিশোধ নিতে এল নাকি যুবক?

লালসা/গোলাম মাওলানা নহিয়া: মাঝ একটা ভূল করেছে বার্ট গ্যালিন। আয়ুশ্লাই যখন করবে, নিচিত হওয়া উচিত ছিল বুলেটা যাতে টমাস লোগানের মগজে ঢেকে, যাতে সিদ্ধ হয়ে

দাঢ়াতে না পারে সে। অর্থ সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঠিকই ফিরে এসেছে টমাস, যার লাশ এতদিনে পচে গলে যাওয়ার কথা! মরতে মরতে বেঁচে গেছে টমাস, এখন আর নৃশংস খুনি বাট গ্যালিন বা জাতগোক্ষুর ক্ষট ট্যাবেটের পরোয়া করে না, কিংবা মার্ট লিয়ারের নেকড়ের দলকেও গোনায় ধরে না। শুধু পালের গোদা মার্ট লিয়ারকে চাই ওর। আর লিয়াও চায় ওর সবকিছু...

অবস্থুরে/মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: চির ভবস্থুরে জিম ওয়েলেডন, বুনো পশ্চিমের শেষ প্রজন্ম। ভাইয়ের হোমস্টেডে দেখা করতে এসে আটকে গেল সে। যেহা বিপদে পড়েছে ওর ছেট ভাই। পাশে গিয়ে দাঁড়াল জিম ওয়েলেডন, চক্রান্ত কৃত্বে সাধ্যমত সাহায্য করল ভাইকে। আবারও কি অজ্ঞানার পথে

পা বাঢ়াবে জিম?
নাকি আটকে যাবে পিপড় টানারের ভালবাসার বাধনে?

দাম ■ একশ' চোল্দ টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-কুম

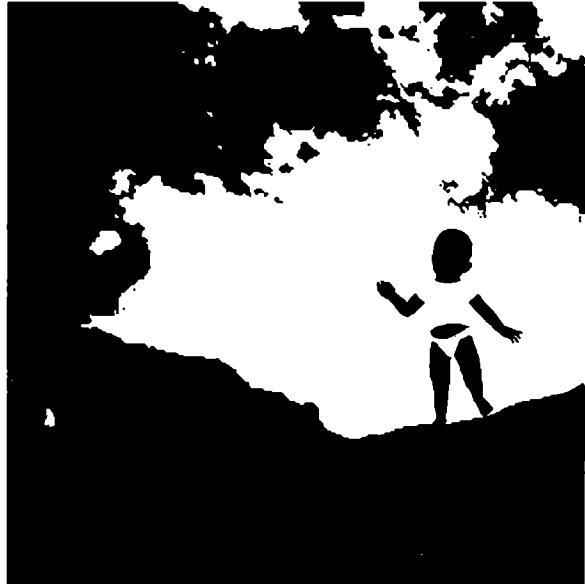
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ঘূমবাড়ি

আফজাল হোসেন

পাগল,
মাথা খারাপ
ধরনের
লোকের মধ্যে
কথনও-কথনও
আধ্যাত্মিক
ক্ষমতা দেখা
যায়।



তর দুপুর। চারদিক অঙ্ককার করে মেঘ করেছে। মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। রমিজ মিয়া ছাতা হাতে বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। এখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি বলে ছাতটা তিনি না মেলে হাতে ধরে হাঁটছেন। দ্রুত লম্বা-লম্বা পা ফেলছেন। বিরবিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। মূষলধারে বৃষ্টি নামল বলে।

রাস্তাঘাট জনমানবশূন্য। একেবারে ফাঁকা। এমনিতেও তর দুপুরে গ্রামের পথ-ঘাটে তেমন একটা লোকজনের দেখা পাওয়া যায় না। যে যার বাড়িতে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ভাতঘুম দেয়।

রমিজ মিয়া বেরিয়েছেন তাঁর ছাগলটাকে খুঁজতে। তিনি একটা পাঁঠা ছাগল পোষেন। পাঁঠাটা পূষ্টছেন এক কবিরাজের নির্দেশে। তাঁর ভয়ঙ্কর অ্যাজমার সমস্যা রয়েছে। ডাঙ্কার, কবিরাজ, বৈদ্য কিছুই বাদ দেননি। কিছুতেই কিছু হয়নি। শেষপর্যন্ত বয়স্ক এক কবিরাজ পরামর্শ দেন, একটা পাঁঠা ছাগল পোষার। বাতে পাঁঠাটাকে তাঁর খাটের নীচে রেখে ঘূমানোর। পাঁঠার গায়ের গক্ষে নাকি অ্যাজমার সমস্যা করবে।

বছরখানেক ধরে রমিজ মিয়া কবিরাজের নির্দেশ মোতাবেক তাই করছেন। সত্যিই এতে তাঁর

অ্যাজমার প্রকোপ অনেকটাই কমেছে। তিনি সেই কবিরাজের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। সেই সঙ্গে পাঠাটার প্রতিও তাঁর মনে এক ধরনের কৃতজ্ঞতাবেধ আর সেহ-মতার জন্ম নিয়েছে। পাঠাটাকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন।

পাঠাটা সারাদিন ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় সমস্ত গ্রাম ঘূরে বেড়ায়। সন্ধিয়া ঠিকই আবার এসে রমিজ মিয়ার খাটের নীচে আশ্রয় নেয়। কিন্তু আজ বড়-বৃষ্টিতে কোথায় না কোথায় আটকে যায়, না পথে হারিয়ে ফেলে—সেই আশঙ্কায় তিনি খুঁজতে বেরিয়েছেন।

গ্রামের বাজারে রমিজ মিয়ার একটি মুদি দোকান আছে। মুদি দোকান কাম ভ্যারাইটিস স্টেরও বলা যায়। তাঁর দোকানে সুই-সুতা, কাগজ, কলম থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া যায়। বাজারে তাঁরটি সবচেয়ে বড় দোকান। বেচা-বিক্রি ও জমজমাট। সকালে এবং সন্ধিয়া উপচে পড়া ভিড় হয়। একা সামাল দিতে পারেন না বলে দোকানের জন্য ছেলে-ছেকেরা টাইপের কর্মচারী রাখেন। কিন্তু তাদের কেউ মেশি দিন টেকে না। কারও চুরির অভ্যাস থাকে, কেউ আবার হিসাব-নিকাশ কিছুই বোঝে না, কেউ কেউ ফাঁকিবাজ। গত তিনি যাস ধরে তিনি একাই দোকান সামলাচ্ছেন। ভেবেছেন আর লোকই রাখবেন না। নিজে যতকুন বেচা-বিক্রি করতে পারেন তাতেই তাঁর চলবে। তাঁর চাহিদা কম। সংসারে তিনি আর তাঁর স্ত্রী, মাত্র দু'জন মানুষ। পৈত্রিকস্ত্রে পাওয়া টিনশেড দোতলা বিশাল বাড়ি। বাড়িতে প্রায় সব ধরনের দেশি ফলের গাছ আছে। বিশাল পুরুর আছে। পুরুর ভর্তি মাছ। এক সময় বেশ কয়েকটা দুধেল গাইও ছিল। গাই পালার জন্য ভাল রাখাল না পাওয়ায় শেষপর্যন্ত গাইগুলো বিক্রি করে দিতে হয়েছে। বাড়ির পেছনে শৰ্ণ্য গোয়াল ঘরটা এখনও পরিত্যক্ত অবস্থায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির আভিন্নায় লাউ, শিঘ, শশা...এই জাতীয় বেশ কিছু সবজি তাঁর স্ত্রী চাষ করে ফলান। সেই সঙ্গে অনেকগুলো ইস-মুরগি-কৃতির পালেন। কোনও কিছুরই অভাব নেই তাঁদের সংসারে।

রমিজ মিয়ার একটাই দুঃখ, ত্বরিষ

বছরের বিবাহিত জীবনে এখন পর্যন্ত একটা সন্তানের মুখ দেখা হলো না। ছেলে-গুলেহান শূন্য ঘরটা খী-খী করে। আর বোধহয় সন্তানের মুখ দেখি হবেও না। আশা ছেড়ে দিয়েছেন। স্ত্রীর বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। তাঁর বয়স পঁয়শাশ ছুই-ছুই। ভাণ্যের লিখন মেনে নেওয়া ছাড়া কী আর করার আছে! অনেক ডাঙার-কবিরাজ দেখিয়েছেন। কিছুতেই কিছু হয়নি। কেউ বলেছে, তাঁর সমস্যা। আবার কেউ বলেছে, তাঁর স্ত্রীর সমস্যা। সমবয়সী বন্ধু পর্যায়ের অনেকে পরামর্শ দিয়েছে, আবার বিয়ে করার। কিন্তু তাতে তিনি রাজি হননি। তিনি তাঁর স্ত্রী মরিয়ম বেগমকে খুব ভালবাসেন। মরিয়ম বেগমের ঝণ তিনি কোনও দিনও শোধ করতে পারবেন না। আজ তিনি যে খেয়ে-পরে সুখে আছেন এর পিছনে সম্পূর্ণ অবদান মরিয়ম বেগমের।

এক সময় রমিজ মিয়ার মুদি দোকান ছিল না। কোনও কাজ-টাজই তিনি করতেন না। সারাদিন শয়ে-বসে কাটাতেন। একদিন মরিয়ম বেগম বেগমের খণ তিনি কোনও দিনও শোধ করতে পারবেন না। আজ তিনি যে খেয়ে-পরে সুখে আছেন এর পিছনে সম্পূর্ণ অবদান মরিয়ম বেগমের।

তিনি অলস গলায় বলেন, ‘কী করব? আমাদের তো খাওয়া-পরার কোনও সমস্যা হচ্ছে না।’

মরিয়ম বেগম বললেন, ‘সারা জীবন কি আর এভাবেই চলবে?! খাওয়া-পরার ঠিকই সমস্যা হচ্ছে না, তাই বলে আমাদের জ্যা-জ্যামতি বলেও তো কিছু নেই। হঠাৎ বড় কোনও অসুখ-বিসুখ বা কত ধ্যানে টাকা-পয়সার দরকার হতে পারে। তখন কী করবে? মানুষের কাছে হাত পাতবে? আমাদের একটা সন্তানাদি হলে তাঁর জন্যেও তো কিছু ধন-সম্পদের প্রয়োজন আছে। এ ছাড়া পুরুষ মানুষ শয়ে-বসে কাটালে পুরুষ থাকে না। সময় কাটানোর জন্য হলেও পুরুষ লোকের কিছু একটা করা দরকার।’

‘কিন্তু আমি কী করতে পারি?! আমার আবার বেশি পরিশ্রম সহ্য হয় না।’

মরিয়ম বেগম বললেন, ‘গ্রামের বাজারে একটা দোকান দিয়ে বসতে পারো।’

‘কীসের দোকান?’

‘এই ধরো মুদি দোকান।’

‘তাতে তো অনেক ক্যাশ টাকা লাগবে।
তা পাব কোথায়?’

মরিয়ম বেগম বললেন, ‘আমার
গয়নাগুলো বিক্রি করে দিয়ে যা হয় তাই দিয়ে
না হয় শুরু করো।’

রমিজ মিয়া স্তীর গয়না বিক্রি করে ব্যবসা
শুরু করতে কিছুতেই রাজি হতে চাননি।
মরিয়ম বেগম অনেক বুবিয়ে-সুবিয়ে রাজি
করান। মরিয়ম বেগম বোঝান, ব্যবসায় যদি
উন্নতি হয় তখন আবার এমন গয়না গড়িয়ে
নেয়া যাবে। এরচেয়ে বেশি হয়তো যাবে।

সত্যিই দিনে দিনে রমিজ মিয়ার মুদি
ব্যবসা জমে ওঠে। তিনি মরিয়ম বেগমকে
একের পর এক গয়না গড়িয়ে দেন। বলা যায়
আগে যা ছিল তারচেয়ে এখন দ্বিগুণ গয়না
মরিয়ম বেগমের। ব্যাংকেও বেশ কিছু টাকা
জমিয়েছেন।

বড় বড় ফেঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। রমিজ
মিয়া মাথার উপর ছাতা মেলে এগোছেন।
চলার পথের আশপাশে তাঁর চোখ দুটো ঝুঁজে
ফিরছে পাঁঠাটাকে। নাহ, কোথাও পাঁঠাটাকে
দেখা যাচ্ছে না।

দেখতে-দেখতে বৃষ্টি ভয়ঙ্কর রূপ
নিয়েছে। রীতিমত ঝড়ো হাওয়া বইছে। সেই
সঙ্গে বিকট শব্দে এক-একটা বাজ পড়ছে।
ছাতায় কাজ ঝুঁচে না। হাওয়ার তোড়ে ছাতা
মাথার উপর ধরে রাখাও যাচ্ছে না। রামিজ
মিয়া ভিজে যাচ্ছেন। ডিজেল ঠাণ্ডা লেগে তাঁর
অ্যাজমার প্রকোপ বেড়ে যাবে। কোথাও আশ্রম
নিতে হবে। তিনি চলে এসেছেন ধারের
একেবারে উভর মাধ্যায়। এখানে কোনও
লোকবসতি নেই বললেই চলে। তবে কিছুটা
সামনে এগোলে একটা পরিত্যক্ত জুট মিল
পাবেন। বছ বছর ধরে মিলটা পরিত্যক্ত
অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই
বোধহ্য জুট মিলটা বক হয়ে যায়।

রমিজ মিয়া পরিত্যক্ত জুট মিলের ভিতরে
চুকে আশ্রয় নিয়েছেন। বিশাল লম্বা টিম্পেট
বিস্তিৎ। ভিতরে মেশিন-টেশিন কিছুই নেই।
শুধুই ফাঁকা, অক্ষকার, লম্বা একটা ঘর। ধুলো,

ময়লা, মাকড়সার ঝুলে ভর্তি। কেমন গুমোট
ভাপসা গুঁক। খুব একটা ভিতরে ঢেকেননি
তিনি। বৃষ্টি থেকে গা বাঁচাতে প্রবেশঘার থেকে
যতটুকু ঢেকার প্রয়োজন ততটুকু।

বড়-বৃষ্টি আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে।
কাছাকাছি বিকট কড়কড় শব্দে বাজ পড়ছে।
সেই শব্দে তিনি কেঁপে-কেঁপে উঠেছেন।
প্রবেশঘার থেকে আরও কিছুটা ভিতরে সরে
এলেন।

চিনের চালে ঝমঝম করে বড়-বৃষ্টির
প্রবল শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দ শুনতে-শুনতে
কেমন এক অস্তুত শূন্যতা ধিরে ধরল রামিজ
মিয়াকে। যেন তিনি লোকালয় থেকে বিছিন্ন
হয়ে পড়েছেন। আর কোনও দিনও লোকালয়ে
ফিরে যেতে পারবেন না। তাঁর গা ছমছম
করছে।

হঠাৎ বড়-বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কেমন এক
জাতৰ গোঙানির শব্দ শুনতে পেলেন রামিজ
মিয়া। তিনি চমকে উঠলেন। শব্দটা আসছে
জুট মিলের ভিতর থেকেই। শব্দে কাঠ হয়ে
গেলেন। শিরদাঁড়া বেয়ে নেয়ে গেল শব্দের
ঠাণ্ডা স্বীকৃত। কোনও হিংস্র জন্ম-জানোয়ারও কি
তাঁর মত এখানে আশ্রয় নিয়েছে? পাগলা
কুকুরও হতে পারে! গোঙানির শব্দটা পাগলা
কুকুরের ক্ষেত্রে শব্দের মতই লাগছে।

মুহূর্তে ভয়ে পুরোপুরি জমে গেলেন। সেই
সঙ্গে হাপানির টান উঠে গেল। তিনি হাপরের
মত বুক ফুলিয়ে-ফুলিয়ে শ্বাস নিচ্ছেন। ওদিকে
জাতৰ গোঙানির শব্দ ঝরেই জুট মিলের
অস্তকারের ভিতর থেকে তাঁর দিকে এগিয়ে
আসছে। তিনি ছুটে পালানোর প্রবল তাসিদ
অনুভব করছেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর জমে
যাওয়া পা নাড়াতে পারছেন না।

গোঙানির শব্দ একেবারেই তাঁর কাছে
চলে এসেছে। প্রবেশঘার থেকে আসা বিজলি
চমকানোর নীল আলোতে এবারে তিনি যে
গোঙাছে তাকে দেখতে পেলেন। একটা
মেরে! অব্যাভাবিক ফর্সা, রোগা পাট কাঠির মত
লিকলিকে শরীরের একটা মেরে। বয়স হয়তো
বিশ-এক্সু বা তারচেয়েও কম। গায়ে কোনও
পোশাক নেই। উলঙ্ঘ। মেয়েটা এগিয়ে আসছে
গোঙাতে-গোঙাতে পশুর মত চার হাত-পায়ে

হামাগুড়ি দিয়ে। বুকে থাকার ফলে মাথা ভর্তি উচ্ছবুক জঙ্গলে চুলগুলো মূখের উপর ছড়িয়ে রয়েছে। তাতে তার শরীরও এই আধো আলোতে পুরোপুরি স্পষ্ট হচ্ছে না। রমিজ মিয়ার মেন ঘাম দিয়ে জুর ছাড়ল। বুকে সাহস কিনে পেলেন। ইঁপানির টানও মুহূর্তেই অনেকটা কমে গেল। অল্প বয়সী একটা পাগলি! অমন রোগা লিকলিকে একটা পাগলি তাঁর কিছুই করতে পারবে না।

পাগলি মেয়েটা একেবারে তাঁর পায়ের কাছে ঢেলে এসেছে। তাঁর পা জড়িয়ে ধরতে চাইছে। তিনি সজোরে একটা লাখি মেরে পিছিয়ে গেলেন। লাখি খেয়ে মেয়েটা ছিটকে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। মেয়েটা এতই দুর্বল যে ঠিক মতন কাঁদতেও পারছে না। কাঁদতে গিয়ে দম আটকে-আটকে যাচ্ছে।

রমিজ মিয়া মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেলেন এটা ভেবে যে জিজেন করবেন, কে সে, কোথা থেকে এসেছে, বাড়ি কেোথায়-এসব। কিন্তু মেয়েটা তাঁকে এগোতে দেখে ডয়ে কুকড়ে গিয়ে পিছু হটতে লাগল। মনে করছে আবার হয়তো তিনি লাখি মারবেন।

তিনি এগোতে-এগোতে বললেন, ‘তয় নেই, আর তোকে কিছু বলব না। কে তুই সেটা বল?’

মেয়েটা আবার গোঙাতে লাগল। ভালভাবে খেয়াল করে শুনে রমিজ মিয়া বুঝালেন, না, মেয়েটা গোঙাচ্ছে না। সে আসলে বলতে চাইছে, ক্ষুধা, খুব ক্ষুধা, খুব ক্ষুধা পেয়েছে। হাত মূখের কাছে তুলে ইশারায়ও বোঝাতে চাইছে, খুব ক্ষুধা পেয়েছে, খেতে চায়। তার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে সে অনেক দিনের অভূত।

মেয়েটা যে অসম্ভব ক্ষুধার্ত একজন, এটা বুঝতে পেরে রমিজ মিয়ার মনটা খুব খারাপ হলো। লাখি মারায় মনে তৈরি অনুশোচনা জাগল। পাগলি হোক আর যা হোক ক্ষুধার্ত অসহায় একটা যেয়ে। ছেট একটা নিঃখ্বাস ফেললেন। তিনি বিয়ে করার কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর যদি একটা যেয়ে সন্তান হত, তা হলে সেই মেয়েও এখন এই পাগলি মেয়েটার

বয়সীই হত। যেয়ের বয়সী বাচ্চা যেয়েটাকে অমন নিষ্ঠুরভাবে লাখি মারায় খুব অনুশোচনা হচ্ছে! খুউব!!!

রমিজ মিয়া তাঁর গায়ের পাঞ্জাবি খুলে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, ‘নে, এই পাঞ্জাবিটা পরে নে। বৃষ্টি কমে এসেছে। তোকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব।’

দুই

সন্ধ্যা নাগাদ রমিজ মিয়া পাগলি মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরে শোনেন, পাঠাটা বড়-বৃষ্টি ওক্ত হবার আগেই বাড়ি ফিরে আসে। শুধু-শুধুই তিনি ওটাকে খুজে-খুজে হয়েরান হয়েছেন।

পাগলি মেয়েটাকে দেখে রমিজ মিয়ার ত্রী মরিয়ম বেগম অবাক হয়ে বললেন, ‘এ কাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ?’

রমিজ মিয়া মরিয়ম বেগমকে পাগলি মেয়েটাকে কীভাবে পেয়েছেন তা বিস্তারিত জানালেন। এরপর তিনি মেয়েটাকে কিছু খেতে দিতে বললেন, মেয়েটা ক্ষুধায় একেবারে ভেঙে পড়েছে।

মরিয়ম বেগম মেয়েটাকে শরবত, দুধ, ডিম পোচ, বিক্ষিট, কলা, এই জাতীয় হালকা কিছু খাবার দিলেন। মেয়েটা পশ্চ মত হামলে পড়ে দৃ-হাত দিয়ে ধরে খাবারগুলো নিয়মে গপাগণ খেয়ে শেষ করে ফেলল। তাই দেখে রমিজ মিয়া বললেন, ‘ওকে ভাত খেতে দাও। পেট ভরে ভাত খাক। ওর পেটে অনেক খিদে।’

মরিয়ম বেগম বললেন, ‘আগে ওকে গোসল করিয়ে নিই। ওর গা থেকে কেমন টকটক গা গোলানো বাসি গুঞ্জ আসছে।’

রমিজ মিয়া পোশাক পাটে দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর দেরি না করে এখনই গিয়ে দোকান খোলা দরকার। সন্ধ্যায় দোকানে বেচা-বিক্রি ভাল হয়।

রমিজ মিয়া যাবার পর মরিয়ম বেগম গরম পানি করে, সাবান মাখিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পাগলি মেয়েটাকে ভালভাবে গোসল

করালেন। গোসলের পর তার একটা শাড়ি পরালেন। এরপর অনেকক্ষণ ধরে যত্ন করে মেয়েটার চুল আঁচড়ে দিলেন। চুল আঁচড়ে দিতে বসে তার মনে হয় বহুদিন মেয়েটার চুলে চিরনির আঁচড় পড়েন। এরই মধ্যে তিনি অনেকবার মেয়েটার নাম-ধার্ম-পরিচয় জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু মেয়েটা কিছুই বলে না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মাঝে-মাঝে অবশ্য জড়ানো গলায় গৌ-গৌ করে কিছু বলতে চায়। তা তিনি বোবেন না। তবে মেয়েটার ভাব-ভঙ্গ দেখে এটা বুঝতে পারছেন, সে খেতে চাইছে, তার পেটে ভীষণ খিদে।

এক সময় মেয়েটাকে খেতে বসালেন। আজকে রান্না করেছেন ভাত, ডিম ভূনা, হাঁসের মাংস আর ডাল চচড়ি।

মরিয়ম বেগম মেয়েটার পাতে ভাত তুলে দিয়ে ডিম ভূনা দিতে যাবেন, তার আগেই মেয়েটা হামলে পড়ে ডিমের বাটি থেকে একটা ডিম দৃ-হাতে তুলে মুখে পুরে সঙ্গে-সঙ্গে খেয়ে ফেলল। এরপর ডিমের বাটি থেকে আরও একটা ডিম তুলে নিল। তবে এবারে ডিমের সাদা অংশটা দৃ-হাতে ছাড়িয়ে, ছুঁড়ে ফেলে, শুধু হলুদ কুসুমটা মুখে পুরল। কুসুমটা খাওয়া শেষ হতেই আবার একটা ডিম তুলে নিয়ে সাদা অংশটা ছাড়িয়ে ভিতরের কুসুমটা মুখে পুরল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটা পওর মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একাকার করে ডিম আর হাঁসের মাংস খেয়ে শেষ করে ফেলল। ভাত-ডাল ছুয়েও দেখল না। ডিম ভূনা আর হাঁসের মাংস শেষ হতেই গোক্ষনির মত গৌ-গৌ শব্দ করে এবং হাতের ইশারা, ভাব-ভঙ্গিতে বোঝাতে চাইল-ও ধৰনের খাবার সে আরও খেতে চায়।

মরিয়ম বেগম স্তম্ভিত হয়ে ঢেয়ে রইলেন। ডিম ভূনার বাটিতে দশটা ডিম আর হাঁসের মাংসের বাটিতে পুরো একটা হাঁসের মাংস ছিল। সব মুহূর্তে খেয়ে শেষ করে এখন আবার খেতে চাইছে! এ কী রাক্ষস নাকি! অথচ কী লিকলিকে রোগা শরীর। গায়ের রঙ ফ্যাকাসে। তবে শরীরের তুলনায় পেটটা বড়। মাকড়সার যেমন বড় পেট থাকে তেমন।

রাত দশটা নাগাদ রমিজ মিয়া বাড়ি ফিরলেন।

মুখ-হাত ধূয়ে খেতে বসলেন। খেতে বসে শুধু ভাত আর ডাল দেখে বললেন, ‘আর কিছু রাঁধনি?’

মরিয়ম বেগম বললেন, ‘হাঁসের মাংস আর ডিম ভূনাও করেছিলাম। তা তোমার ওই পাগলিটা একাই সাবাড় করেছে।’

রমিজ মিয়া দরদ মাখা গলায় বললেন, ‘আহারে, বেচারির পেটে কী খিদেই না ছিল! আমাকে একটা ডিম ভেজে দাও।’

‘ডিম পাব কোথায়? ঘরে একটা ডিমও নেই।’

‘কী বলো! গতকালই না বললে, কতগুলো ডিম নাকি জমা হয়েছে? তোমার ওই ঘরে পালা দেশি হাঁস-মুরগির ডিম। আমাকে না কিছু ডিম দোকানে নিয়ে গিয়ে বেচতেও বললে।’

‘ছিল তো, চল্লিশ-পঞ্চাশটাৰ কম না। পাগলিটারে খাইয়ে-দাইয়ে আমার বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে চলে আসি। বিচুক্ষণ পর আবার ঝোঁজ নিতে যাই। গিয়ে দেখি, সে বিছানায় নেই। খাটের নীচে থেকে মদু চপচপ আওয়াজ কানে আসে। নুয়ে খাটের নীচে উঁকি মেরে দেখি, সেখানে পাগলিটা। কী করছে জানো?! আমি যে সাজিটার মধ্যে ডিমগুলো জমিয়েছিলাম সেটা দেখি তার সামনে। অক্ষত ভঙ্গিতে কুণ্ডলি পাকিয়ে আধশোয়া অবস্থায় একটার পর একটা ডিম ভেঙে-ভেঙে খাচ্ছে। ডিমের সাদা সেই বোঁড়ে ফেলে শুধু হড়হড়ে কুসুমটা গিলছে। হলুদ কুসুমের ধারা তার দু-ঠেক্টের কোনা বেয়ে গড়াচ্ছে। থুতনিতেও মেথেছে। গা শুলিয়ে খোঁচার মত দৃশ্য।’

‘কী বলো! অতগুলো ডিম সব ওভাবে কাঁচা খেয়ে ফেলেছে?’

‘সব খেয়ে ফেলেছে! খাওয়া শেষে, হাতে, ঠোঁটে, থুতনিতে-যেসব জায়গায় কুসুম লেগেছিল সেসবও আছুল দিয়ে যুক্ত-যুক্ত এনে চেটেপুটে খেয়েছে।’

রমিজ মিয়া নিজের ঘরে ঘুমাতে এসেছেন। টুচ মেরে খাটের নীচে পাঠাটাকে দেখে নিলেন। পাঠাটা বসে-বসে জাবার কাটছে। তাঁকে দেখে ভ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা করে একবার ডেকে উঠল।

খাটের নীচে পাঁঠা নিয়ে ঘুমান বলে
মরিয়ম বেগম এখন আর তাঁর সঙ্গে ঘুমান না।

আলাদা ঘরে থাকেন। মরিয়ম বেগম
পাঁঠার গায়ের গন্ধ একদমই সহ্য করতে পারেন
না। রমিজ মিয়ার এই ‘পাঁঠা চিকিৎসা’ শহেরের
কারণে তাঁদের দু’জনের মধ্যে প্রায়ই
ঝগড়াবাটি, মন কষাকষি হয়। ঝগড়ার মুহূর্তে
মরিয়ম বেগম তাঁকে নানান ভঙ্গসনা করেন।
রমিজ মিয়ার গা থেকেও মাকি আজকাল পাঁঠা-
পাঁঠা গন্ধ আসে। এই ঘরে যে দুটো প্রাণী
থাকে, দুটোই পাঁঠা। একটা খাটের উপরে
থাকে, অন্যটা খাটের নীচে। দুটোর উচিত এক
সঙ্গে গলাগলি করে ঘুমানো।

প্রথম দিকে রমিজ মিয়াও পাঁঠার গন্ধ সহ্য
করতে পারতেন না। ধীরে-ধীরে সয়ে গেছে।
বরং আজকাল পাঁঠার গায়ের গন্ধ ছাড়া তিনি
ঘুমাতে পারেন না। এর মধ্যে একদিন পাঁঠাটা
খাটের নীচে প্রস্তাব-পায়খানা করে একেবারে
ভরিয়ে ফেলেছিল। বোধহয় সেদিন পাঁঠাটার
ভায়রিয়া হয়েছিল। দুর্ঘস্থ টেকা দায়। ওই
অবস্থা দেখে মরিয়ম বেগম তাঁকে সেই রাতে
মরিয়ম বেগমের ঘরে ঘুমাতে নিয়ে যান। তিনি
অবশ্য মরিয়ম বেগমের ঘরে যেতে চাননি।
মরিয়ম বেগম মুখ বামটা দিয়ে বলেন, ‘এক
বাত পাঁঠার সঙ্গে না ঘুমিয়ে মানুষের সঙ্গে
ঘুমালে এমনকী ক্ষতি হবে?’ তখন বাধ্য হয়ে
মরিয়ম বেগমের ঘরে ঘুমাতে যান। কিন্তু সারা
রাতে এক ফোটাও ঘূম হয় না তাঁর। মরিয়ম
বেগমের গা থেকে কেমন বেটকা গন্ধ পান।
শেষ রাতের দিকে নিজের কামরায় ফিরে
বালিশে মাথা রাখতেই ঘূম চলে আসে। কী
সুন্দর মনমাতানো পাঁঠার গায়ের গন্ধ! সেই
সঙ্গে প্রস্তাব-পায়খানার গন্ধ মিলে গঢ়ের
নেশাটা সেদিন আরও বাড়িয়ে দেয়।
কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি গভীর ঘূমে তলিয়ে
যান। সকালে ঘূম ভাঙ্গে একটা দুঃখপুর দেখে।
সপ্নে তিনি নিজেকে একটা পাঁঠা ঝুঁপে দেখতে
পান। তাঁকে যেন মা-কালীর মূর্তির সামনে বলি
দেওয়া হচ্ছে। তাঁকে বলি দিচ্ছেন মরিয়ম
বেগম। বলি হ্বার ঠিক আগ মুহূর্তে মূর্তির
দিকে তাকিয়ে দেখেন, মূর্তিও মরিয়ম
বেগমের-মা-কালীর নয়!

রমিজ মিয়া শোবার জন্য বিছানায় পা উঠিয়ে
বসলেন। তাঁর ঘরে মশারি খাটোনোর প্রয়োজন
হয় না। এই ঘরে মশা আসে না। বোধহয়
পাঁঠার গন্ধে।

বিছানায় বসে তিনি জোরে-জোরে বুক
তরে শাস নিচ্ছেন। শোবার আগে এমনটা তিনি
প্রতি রাতেই করেন। মূলত তিনি বুক ভরে
পাঁঠার গন্ধ নেন। এভাবে কয়েকবার নিম্নেই
চোখে ঘূম চলে আসে।

বিছানার পাশে টেবিলের উপর হ্যারিকেন
জলছে। হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনের আলো
কমিয়ে শুয়ে পড়বেন। তাঁদের গ্রামে এখন
পর্যন্ত ইলেক্ট্রিসিটি এসে পৌছ্যানি। তবে
গ্রামের বাজার পর্যন্ত ইলেক্ট্রিসিটি চলে
এসেছে। কিছু দিনের মধ্যে বোধহয় গ্রামেও
পৌছে যাবে।

‘এমন সময় তাঁর ঘরের ডেজানো দরজা
ঠেলে মরিয়ম বেগম তুকলেন। মরিয়ম বেগমকে
দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, ‘এত রাতে
তুমি পাঁঠার ঘরে?’

মরিয়ম বেগম এসে তাঁর পাশে বসতে-
বসতে ভীত গলায় বললেন, ‘আমার কেমন
ভয়-ভয় লাগছে! আজ আমি তোমার সঙ্গে
ঘুমাব।’

রমিজ মিয়া অবাক-হওয়া গলায় বললেন,
‘কেন, ভয় লাগছে কেন?’

মরিয়ম বেগম ফিসফিস করে বললেন,
‘ওই পাগলিটাকে ভয় লাগছে।’

রমিজ মিয়া বিরক্ত-হওয়া গলায় বলে
উঠলেন, ‘কী যে বলো! ওই রোগা-পাতলা-
দুর্বল যেয়েটা তোমার কী করবে? ওর গায়ে
তো ঠিক মতন হাঁটা-চলা করার শক্তিকুণ্ডল
নেই।’

মরিয়ম বেগম চিন্তিত গলায় বললেন,
‘আমার কেমন জানি যনে হচ্ছে, ওই যেয়েটা
স্বাভাবিক কেউ তো না-ই! পাগল, মাথা
ঝারাপ।’

‘রাতে দোকান থেকে ফেরার পর তুমি
আর যেয়েটাকে দেখেছ?’

‘না, কেন বলো তো?’

‘গোসলের পর আমার একটা লাল শাড়ি
পরিয়ে, চুল আঁচড়ে দেবার পর মেয়েটাকে
দেখে তো আমি তাজ্বর হয়ে গেছি! মেয়েটা
ঠিকই ভীষণ রোগ-পাতলা কিন্তু ওর চেহারা
তো খুবই সুন্দর! আচর্ষ রকমের সুন্দর! কয়েক
দিন ঠিকমত খাওয়া-পরা জুটলে এই মেয়ে তো
পরীর চেয়েও রূপবর্তী হয়ে উঠবে। ওর
সৌন্দর্য আমার কেমন অস্বাভাবিক লাগছে!
রাস্তার একটা পাগলি কেন এত সুন্দর হবে?’

রমিজ মিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে
বললেন, ‘অমন একটা মেয়ে যদি আমাদের
ধাকত!!!’

তিনি

পাগলি মেয়েটা রমিজ মিয়ার বাড়িতে প্রায় এক
মাস হয় আছে। এতদিনে রমিজ মিয়া এবং
মরিয়ম বেগম মেয়েটার আচরণে অনেকটাই
অভ্যন্ত হয়ে উঠেছেন। এ ছাড়া মেয়েটাও এখন
বেশ কিছুটা সভা হয়ে উঠেছে। মেয়েটার
অস্বাভাবিকভাবে মধ্যে লক্ষণীয় যা, তা
হলো—সে খেতে পছন্দ করে। সরাক্ষণ শুধু
খেতে চায়। অবশ্য সে সব ধরনের খাবার খায়
না। যে কোনও ধরনের মাংস, ডিমের কুসুম,
গরু-খাসির কলিজা, মগজ, চর্বি...এসব খাবার
খেতে পছন্দ করে। রমিজ মিয়া রোজ-রোজ
অনেকগুলো ডিম, মাংস, কলিজা, মগজ,
মাখন...এসব বাজার করে আনেন। মরিয়ম
বেগম স্বতন্ত্রে সেগুলো রাখা করে মেয়েটাকে
খাওয়ান। মেয়েটা অবশ্য রাখা করার আগে
কাঁচাই সব খেয়ে ফেলতে চায়।

রমিজ মিয়া আর মরিয়ম বেগম, দু’জনের
মনেই মেয়েটার প্রতি এক ধরনের তীব্র
মায়া জন্ম নিয়েছে। মেয়েটার কোনও
অস্বাভাবিকভাই এখন আর তাঁদের কাছে
অস্বাভাবিক মনে হয় না। মেয়েটার বেশি-বেশি
খাওয়ার কারণ তারা ধরে নিয়েছেন, মেয়েটা
খেতু খুবই রোগ-পাতলা—তাই বেশি-বেশি
খেয়ে তার শরীরের পুষ্টির ঘাটতি প্রৱণ করছে।
যখন ঘাটতি প্রৱণ হয়ে যাবে তখন আর এত
বাবে না।

এই মধ্যে মেয়েটার শরীর অনেকটাই
সেরে উঠেছে। তাকে আজকাল অঙ্গরার মত

রূপবর্তী লাগে।

রমিজ মিয়া আর মরিয়ম বেগম আজকাল
মেয়েটার জড়নো গলায় বলা অস্পষ্ট কথা
কিছু কিছু বুঝতে পারেন। মেয়েটাকে তার
নাম-ধার-পরিচয় জিজ্ঞেস করলে এলোমেলো
ছাড়া-ছাড়া যা বলে তা হলো—তার বাড়ি নদীর
পাশ-ঘেঁষা এক গ্রামে। গ্রামের মানুষ নদীর পানিই
উৎস সেই নদী। গ্রামের মানুষ নদীর পানিই
নাওয়া-খাওয়া সহ সব কাজে ব্যাহার করে।
তাদের গ্রামে খুব বজ্রপাতে
প্রায়ই লোক মারা যায়। তার বাবা বনজ গাছ-
গাছালির শিকড়-বাকড়, লতা-পাতা দিয়ে ওষুধ
বানায়। দূর-দূরাত থেকে লোকজন তার বাবার
কাছে চিকিৎসা নিতে আসে। তার বাবার
বানানো ওষুধে যে কোনও রোগই সেরে যায়।
তাদের গ্রামে অনেক পুরোনো একটা কালী
মন্দির আছে। সেই মন্দিরের মূর্তিটা
কঢ়িপাথরের...

তবে সে গ্রামের নাম, বাবার নাম, এসব
কিছুই বলতে পারেন। মেয়েটার মুখে ওসব
শব্দে রমিজ মিয়ার একটা গ্রামের কথাই বার-
বার মনে হয়। তা হলো—তাঁদের গ্রাম থেকে বহু
দূরে চিত্তা নদীর ওপাড়ে শেখপুর থেকে কয়েক
গ্রাম ছাড়িয়ে বজ্রখুপুর নামে এক গ্রামের
কথা। সেই গ্রামে নাকি বজ্রপাতে খুব লোকজন
মারা যায়। তাই গ্রামের নাম হয়ে গেছে
বজ্রখুপুর। গবেষকরা বলেছেন, ওখানকার
মাটিতে লোহ জাতীয় উপাদান বেশি বলে নাকি
বজ্রপাতে বেশি আঘাত হানে। শুনেছেন স্থানে
একটা কালী মন্দিরও আছে। খুব জাগ্রত
মন্দির। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। জনশ্রুতি
রয়েছে মা-কালী ক্ষিণ হয়ে শুধুমাত্র পাপিষ্ঠদের
উপরই বজ্রাঘাত করে শাস্তি দেন।

রমিজ মিয়া একদিন সেই গ্রামে খোঁজ
নিতে যান। সেদিন ছিল সেই গ্রামের হাটবার।
হাটে দুকে তিনি একে-ওকে ধরে জিজ্ঞেস
করেন, ‘আপনাদের গ্রামে কোনও নামকরা বড়
কবিরাজ আছেন? যার ওষুধ খেলে যে কোনও
রোগ সেরে যায়?’

কেউ কেউ বলে, ‘অনেক আগে ছিল,
এখন নেই।’

তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, ‘মাসখানিক

আগে সেই কবিরাজের কোনও মেয়ে কি নিখোঝ হয়েছে?’

এই প্রশ্নে কিছুটা বিরক্ত-হওয়া গলায় জবাব মেলে, ‘কী যে বলেন! এটা ঠিক যে ভবেশ কর নামে এক নামকরা কবিরাজ ছিলেন একসময়। তিনি তো মারা গেছেন প্রায় বছর বিশেক আগে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে-মেয়েরা সপরিবার ইঙ্গিয়া চলে যায়। মাসখানিক আগে তাঁর মেয়ে এই গ্রাম থেকে নিখোঝ হবে কীভাবে?’

তখন তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, ‘আচ্ছা, মাসখানিক আগে কি আপনাদের গ্রামের পাগলি ধরনের কোনও মেয়ে নিখোঝ হয়েছে?’

‘না, হয়নি।’

অনেককে জিজ্ঞেস করার পর এক সময় রমিজ মিয়া নিশ্চিত হয়ে যান, পাগলি মেয়েটা যে গ্রামের বর্ণনা দিয়েছে এটা আসলে সেই গ্রাম নয়। শুধু-শুধু একে-ওকে জিজ্ঞেস করে লোকজনদের বিরক্ত করছেন। হাট খোলার একটা ঘিষ্ঠির দোকান থেকে এক হাঁড়ি রসগোল্লা কিনে ফিরে আসার কথা ভাবেন। পাগলি মেয়েটা ঘিষ্ঠি, রসগোল্লা, সদেশ... এসব খেতেও খুব পছন্দ করে।

রসগোল্লা কেনার পর দাম মিটিয়ে দিতে গিয়ে ঘিষ্ঠির দোকানের ম্যানেজারকে কী মনে করে যেন আবার জিজ্ঞেস করে ফেলেন, ‘আপনাদের গ্রামে কি কোনও নামকরা কবিরাজ আছেন?’

দোকানের বৃক্ষ ম্যানেজার কৌতুহলী গলায় উল্টো প্রশ্ন করেন, ‘কেন বলুন তো?’

তিনি আসল কারণ না বলে, ঘুরিয়ে বলেন, ‘আমার খুব অ্যাজমার সমস্যা রয়েছে। লোকমুখে শুনেছি, আপনাদের গ্রামে নাকি নামকরা এক কবিরাজ আছেন। তাই অনেক দূর থেকে সেই কবিরাজের চিকিৎসা নিতে এসেছিলাম।’

ম্যানেজার ভদ্রলোক বলেন, ‘ছিলেন একজন। এখন নেই। বছর কুড়ি আগে তিনি মারা গেছেন। তাঁর চিকিৎসার হাত খুব ভাল ছিল। যে কোনও রোগই ভাল করে দিতে পারতেন।’

রমিজ মিয়া বলেন, ‘অনেকের কাছেই কবিরাজের বৈঁজ করে এই একই কথা শুনেছি। ছিলেন একজন, এখন নেই-বছর কুড়ি আগে মারা গেছেন। তাঁর ছেলে-মেয়েরাও নাকি সব তাঁর মৃত্যুর পর ইঙ্গিয়া চলে যায়। কিন্তু আমি যাকে খুজছি...’

রমিজ মিয়ার বলা শেষ হবার আগেই ম্যানেজার লোকটা বলতে থাকেন, ‘ওনার ছেলে-মেয়েরা সবাই-ই ইঙ্গিয়া চলে গেছে, এটা ঠিক নয়। ভুল কথা। ওনার এক ছেলে ঢাকায় থাকে। ঢাকায় বাড়ি-গাড়ি আছে। ডাক্তার। ঢাকা ন্যাশনাল হাসপাতালের বড় ডাক্তার। এ ছাড়া কবিরাজের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ঘরে যে মেয়েটা হয়েছিল সে-ও হয়তো এই দেশেই থাকে। সেই মেয়েটা বিশ-একুশ বছর বয়সে নিখোঝ হয়ে যায়। সবার ধারণা, সে কোনও মুসলমান ছেলের সঙ্গে পালিয়ে শিয়েছে। তাই আর বাড়ির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেনি। সেই মেয়েটাও নিশ্চয়ই তার মুসলমান স্বামীর সঙ্গে বাংলাদেশে বাস করে। হিন্দুদের প্রতি আপনাদের ধারণা ঠিক না। সবাই-ই যে ইঙ্গিয়া চলে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে তা কিন্তু নয়।’

রমিজ মিয়া আগ্রহী গলায় জানতে চান, ‘কবিরাজের সেই বিশ-একুশ বছর বয়স্কা মেয়েটা কবে নাগাদ নিখোঝ হয়? মাসখানিক আগে নাকি?’

ম্যানেজার বলতে লাগেন, ‘আরে নাহ! বছর পঁচিশের কম হবে না। তখন কবিরাজও জীবিত ছিলেন। সেই মেয়েটা বড়ই অস্তুত ছিল...’

‘বছর পঁচিশের কম হবে না,’ এটা শুনে সঙ্গ-সঙ্গে রমিজ মিয়া সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। বছর পঁচিশ আগে যে মেয়ে নিখোঝ হয়েছে, সেই মেয়ে তো আর কোনওভাবেই তাঁর বাড়ির পাগলি মেয়েটা হতে পারে না। ম্যানেজার ভদ্রলোক বলেই যাচ্ছিলেন। বয়স্করা পুরানো দিনের গল্প করতে পছন্দ করেন। ভদ্রতাবশত রমিজ মিয়াকে বাধ্য হয়ে সেসব শৰ্মতে হয়েছে।

‘...মেয়েটার চাল-চলন, কথা-বার্তা-আচরণ সবই অস্তুত ছিল। মেয়েটা সব সময়

কেমন চৃপচাপ গ়ষ্টীর হয়ে থাকত ? ঘষ্টোর পর ঘষ্টো একই জায়গায় পাখরের মূর্তির মত বসে থাকত। তার মধ্যে এমন সব অস্তুত রহস্যময় ক্ষমতা ছিল যা কোনও সাধারণ মানুষের থাকে না। যেমন সে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারত। কবে বড় হবে, কবে বৃষ্টি হবে, কবে নদীতে বান ডাকবে—সব আগে আগেই বলে দিত। গ্রামের কেউ মারা যাবার আগেও বলে দিত। তার ভবিষ্যৎ বর্ণনা কখনও ভুল প্রমাণ হয়নি। চোখ বন্ধ করে বহু দূরের মানুষ সম্পর্কেও সব কিছু বলে দিতে পারত। দূরের মানুষটা কী করছে, কী ভাবছে, কেমন আছে, কোথায় আছে, তার কোনও বিপদ হয়েছে কিনা—সব!

‘পশ্চ-পাখিদের সঙ্গে কথা বলতে পারত।’
পশ্চ-পাখিরাও তার কথা বুত, সে-ও পশ্চ-পাখিদের কথা বুত। মাঝে-মাঝে সে তার মত করে কুকুর, বিড়াল, হাঁস-মুরগিকে পরিচালনা করত।

‘ধরুন, গাছের মগডালে একটা আম খুলছে। তার সেই আমটা থেতে ইচ্ছে করছে। সে নীচে দাঁড়িয়ে আমটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আমটা এমনি-এমনি বৌঠা ছিঁড়ে নীচে পড়বে। এভাবে সে নারকেল গাছের ডাবের কাঁদির দিকে তাকিয়ে থেকে একটার পর একটা ডাব পেড়ে ফেলত।

‘সে রেঞ্জে গেলে, তার আশপাশে যদি তখন কোনও কাচের জিনিস-পত্র থাকত তা এমনি-এমনি বিকট শব্দ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। আর যার উপর রাগত তার প্রচও মাথা যন্ত্রণা হত এবং নাক দিয়ে রাঙ্গ বেরকুলে শুরু করত। তাই ভয়েও কেউ কখনও তাকে খেপাত না।

‘এছাড়া সে পানির নীচে ডুব দিয়ে ঘট্টোর পর ঘষ্টো কাটিয়ে দিতে পারত। অনেকে নাকি তাকে শূন্যে ডেসে উঠতেও দেখেছে।

অক্ষকারেও নাকি সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পেত। বলা যায় তার কারণেই তার বাবার কবিরাজ হিসেবে অত নাম-ডাক হয়েছিল। যে কোনও রোগীকে দেখে, সে তার বাবাকে বলে দিত কী শুধু দিতে হবে। কোন-কোন গাছের শিকড়-বাকড়, লতা-পাতা দিয়ে শুধু তৈরি করতে হবে। সেই সব শিকড়-বাকড়, লতা-পাতা কোথায় পাওয়া যাবে তাও বলে দিত।

‘মেয়েটার জন্মের আগেও একটা রহস্যময় ঘটনা ঘটে। সে তখন তার মায়ের পেটে। এক দিন বজ্রসহ প্রচও বড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। তার মা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বড়-বৃষ্টি দেখছিলেন। জানালায় ছিল লোহার শিক। মহিলা লোহার শিক ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ একটা বাজ তাঁর উপর আঘাত হানে। তিনি ছিটকে পড়েন। কীভাবে যেন বেঁচে যান। তিনি দিন অজ্ঞান অবস্থায় থেকে তাঁর স্বামীর কবিরাজি চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেন। তবে এর পর থেকে তাঁর মধ্যে মানসিক বিকারহস্তা দেখা দেয়। উন্ন্যট আচরণ করতে থাকেন। হাঁস-মুরগি, কুকুর, বিড়াল, ছাগল...এসব ধরে-ধরে পেট্টো চিরে কলিজাটা বের করে থেয়ে ফেলেন। অবস্থা এমন হয় যে এক সময় তাঁকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। মেয়েটার জন্মের সময় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর কবিরাজ আবার দ্বিতীয় বিয়ে করেন...’

চার

মাঝে বাত।

রমিজ মিয়ার হাঁপানির টান উঠেছে। সেই সঙ্গে প্রচও জুর। জুরে গা পুড়ে যাচ্ছে। হস-হস করে টেনে-টেনে অনেক কষ্টে শ্বাস নিচ্ছেন। মনে হচ্ছে এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন।

আজ রাতে তিনি দোকান থেকে বাসায় ফিরেছেন বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে। ভুলে ছাতা

আল আমিন বুক সাপ্লাই

শ্রোঃ মোঃ আলী আকবর

সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন-পুরানো সব বই এবং

রহস্যপত্রিকা সরবরাহ করা হয়।

মোবাইল: ০১৯২৩৭০২৪৫১, ০১৯২৭১১২৪৮০

নিয়ে বের হননি। তাতেই ঠাণ্ডা লেগে এই অবস্থা।

মরিয়ম বেগম গরম সরিষার তেল রমিজ মিয়ার বুকে মালিশ করে দিচ্ছেন। কিন্তু হাঁপানির প্রকোপ তাতে একটও কমছে না। বরং যেন বেড়ে যাচ্ছে। তিনি মুখ হাঁ করে খাবি-খাওয়া মাছের মত করছেন।

মরিয়ম বেগমের খুব অস্ত্রিল লাগছে। এত রাতে ডাঙ্গার ডেকে আনার উপায়ও নেই। তার ওপর বাইরে সাংঘাতিক ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না! খাটের নীচে পাঁঠাটা মাঝে মাঝে ভ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা করে ডেকে উঠছে।

পাগলি মেয়েটা পাশের ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। ঘুম থেকে জেগে উঠে রমিজ মিয়াকে দেখতে এসেছে। রমিজ মিয়ার অবস্থা দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

রমিজ মিয়ার শাসকষ্ট শুরু হবার পর মরিয়ম বেগম ইচ্ছে করেই পাগলি মেয়েটাকে জাগাননি। পাগলিকে জাগিয়ে কী হবে! শুধু-শুধু ঝামেলা বাড়বে।

মেয়েটা কিছুক্ষণ রমিজ মিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকার পর ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। তাই দেখে মরিয়ম বেগমও উঠে মেয়েটার পিছু-পিছু গেলেন। পাগলি আবার কী পাগলামি করার জন্য ছুটে গেল তা দেখার জন্য। তেমন কিছু করলে বাধা দেবেন।

মেয়েটা সোজা সদর দরজা খুলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। মরিয়ম বেগম পিছন থেকে অনেক ডাকলেন, ‘এই মেয়ে, তুই এত রাতে কোথায় যাচ্ছিস?! এই মেয়ে, এই...’

মেয়েটার কানে যেন মরিয়ম বেগমের ডাক চুকলাই না। সে চোখের পলকে বাইরে ঝড়-বৃষ্টির মাঝে অঙ্ককারে হারিয়ে গেল।

মরিয়ম বেগম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দরজা বন্ধ করে আবার এসে রমিজ মিয়ার পাশে বসলেন। এ ছাড়া তার কী-ই বা করার আছে? তিনি তো আর পাগলিকে আটকাতে এই ঝড়-বৃষ্টির মাঝে পিছু-পিছু ধাওয়া করতে পারেন ন। রাত্তার একটা পাগলি, যা খুশি তাই করক-যেখানে ইচ্ছে যাক! তাতে তার কী যায়-আসে!

রমিজ মিয়া এখন টেনে-টেনে হস-হস করে শ্বাস নেবার সঙ্গে-সঙ্গে গৌ-গৌ শব্দ করছেন। ঠোটের কোনা বেয়ে লালা গড়িয়ে নামছে। মরিয়ম বেগমের ডয় লাগছে, লোকটা বোধহয় আজ বাতেই মারা যাবে! রমিজ মিয়া মারা গেলে তাঁর কী উপায় হবে?! এত বড় পৃথিবীতে তাঁর আপনজন বলতে এই একজন! সত্ত্বানাদিও নেই! কাকে নিয়ে থাকবেন তিনি?! মরিয়ম বেগমের চোখ ভিজে উঠতে লাগল।

ঘটাখানিক পেরিয়ে গেছে। রমিজ মিয়ার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। হঁপ-হঁপ করে দম আটকে-আটকে অতি কষ্টে শ্বাস নিচ্ছেন। কোনও ঝঁপ-জ্বান নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোধহয় চিরতরে শ্বাস নেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

মরিয়ম বেগম আকুল হয়ে কেঁদে-কেঁদে বুক তাসাচ্ছেন। কে যেন বাইরে থেকে সদর দরজায় দুম-দুম শব্দ করছে। কে এসেছে? পাগলি কি আবার ফিরে এসেছে? মরিয়ম বেগমের ইচ্ছে করছে না উঠে গিয়ে দরজা খুলতে। তাঁর মন বলছে, তিনি রমিজ মিয়ার পাশ থেকে সরলেই রমিজ মিয়া মারা যাবেন!

দরজায় দুম-দুম শব্দ বেড়েই চলছে। যেন দরজা ভেঙে ফেলতে চাইছে। প্রবল অনিছসত্ত্বেও এক সময় বাধ্য হয়ে মরিয়ম বেগম চোখ মুছতে-মুছতে গিয়ে দরজা খুললেন।

দরজার সামনে পাগলি দাঁড়ানো। ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজে তার চেহারা একেবারে বাড়ো কাকের মত বিধ্বস্ত।

দরজা খুলে পাগলিকে দেখেই মরিয়ম বেগম ঠাস-ঠাস করে সজোরে কতগুলো ঢড় বিসিয়ে দিলেন মেয়েটার দু'গালে।

মেয়েটা তাতে কিছু মনে করল বলে মনে হলো না। সে তার জড়ানো গলায় হাউমাউ করে কিছু বেরাতে চাইছে। হাত বাড়িয়ে ধরেছে। দুই হাতের মুঠো ভর্তি কতগুলো বুনো শিকড়-বাকড় আর লতা-পাতা।

পাগলি মেয়েটা কী বলছে তা মরিয়ম বেগম বুঝতে পারলেন। মেয়েটা তাকে এই শিকড়-বাকড়-লতা পাতার রস করে রমিজ মিয়াকে খাওয়াতে বলছে।

প্রথমে মরিয়ম বেগম রাজি হতে চাননি। পাগলি, কোথা থেকে কী সব শিকড়-বাকড় নিয়ে এসেছে তা খাওয়ালে পরে কিনা রমিজ মিয়ার অবস্থা আরও খারাপ হয়। মেয়েটা কান্দতে-কান্দতে হাত জোড় করে, অনুরোধ করতে থাকে। মরিয়ম বেগম ঠিক ভেবে পান না কী করবেন। ওদিকে রমিজ মিয়ার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। বলা যায় এখন নাভিখাস উঠেছে। হঠাৎ মরিয়ম বেগমের মনে হয়, পাগল, মাথা খারাপ ধরনের মধ্যে কখনও-কখনও অধ্যাত্মিক ক্ষমতা দেখা যায়। এদের দেওয়া কিছু অবহেলায় ফেলে দিতে নেই। দেখাই যাক না পাগলির আনা শিকড়-বাকড়-লতা-পাতার রস করে খাইয়ে কী অবস্থা হয়।

পাগলির আনা শিকড়-বাকড়-লতা-পাতার রস করে খাওয়ানোর পর আশ্র্যজনকভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে রমিজ মিয়ার হাঁপানির টান কমে গেল। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

মরিয়ম বেগম কৃতজ্ঞ চোখে পাগলির দিকে তাকালেন। মেয়েটা অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি উঠে গিয়ে মেয়েটার মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, ‘মা, তোকে যে এতজ্জলো চড় মারলাম, খুব ব্যথা পেয়েছিস না?’

মেয়েটা বরাবরের মত ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। তার ফর্সা গাল দুটোতে চড় মারার দাগ পড়ে রয়েছে। মরিয়ম বেগম দু-হাত দিয়ে গাল দুটো চেপে ধরে বলতে লাগলেন, ‘কী করব বল, মা! তোর চাচার অবস্থা দেখে আমার মাথা ঠিক ছিল না! তার মধ্যে এই গভীর রাতে তুই কিছু না বলে বাইরে চলে গেলি। খুব রাগ লাগছিল! তখন তো আর বুঝিনি, তুই তোর চাচাজানের জন্য গাছ-গাছড়ার শিকড়-বাকড় আনতে গিয়েছিস। আমাকে ক্ষমা করে দে। আমার ভুল হয়ে গেছে!’

মেয়েটার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। দু-চোখ ছাপিয়ে দর-দর করে চোখের পানি ঝরতে লাগল। মরিয়ম বেগম মেয়েটার দু-চোখ তাঁর শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে দিতে-দিতে

ধরা গলায় বললেন, ‘কে বলেছে তুই পাগলি! তুই মোটেও পাগলি নস! তোর চাচাজান সুষ্ঠ হয়ে উঠলে তোকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে বড় ভাঙ্গার দেখাতে বলব। তোকে আমরা সুষ্ঠ করে তুলব। আমাদের কোনও ছেলে-পুলে নেই! এখন থেকে তুই-ই আমাদের মেয়ে। তুই আমাকে এখন থেকে মা বলে ডাকবি। ডাক না ‘মা’ বলে। আমি জীবনেও কোনও দিন কারও মুখে মা ডাক শুনিন!!!’

মেয়েটা স্পষ্ট করে মা বলে ডেকে উঠল। সব সময়ের মত মোটেও জড়নো গলায় বলেনি। মরিয়ম বেগম যুগপৎ আনন্দিত এবং অবাক হলেন। আনন্দে কেঁদে ফেললেন। কান্দতে-কান্দতে বললেন, ‘আবার ডাক তো, মা! আবার ডাক্বক!’

মেয়েটা আবার ডাকল, ‘মা’

মরিয়ম বেগম আবেগে আপুত্ত হয়ে পাগলিকে জড়িয়ে ধরলেন। মাথায়-পিঠে সঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। এক সময় আশ্র্য-হওয়া গলায় বললেন, ‘মা, তোর গায়ে দেখি এখনও তেজা শাড়ি! যা গিয়ে শিগুণির পাটে নে।’ এই বলে জড়িয়ে ধরা অবস্থা থেকে ছেড়ে দিলেন।

মেয়েটা ছাড়া পেতেই কিছু মনে পড়ল এমন ভঙ্গিতে কোথারে হাতড়ে শাড়ির ট্যাক থেকে আবার কিছু লালচে রঙের শিকড় বের করল। শিকড়গুলো মরিয়ম বেগমের দিকে বাঢ়িয়ে ধরে বরাবরের মত জড়নো গলায় বলল, ‘মা, এগুলো আপনার জন্য এনেছি। আপনি এগুলো রস করে খান।’

মরিয়ম বেগম শিকড়গুলো হাতে নিলেন। মুখে বললেন, ‘তুই যখন দিয়েছিস, অবশ্যই আমি খাব। আমি জানি, নিশ্চয়ই এতে আমার ভাল হবে।’

একটু বেলা করে রমিজ মিয়ার ঘূম ভাঙ্গল। বাড়-বৃষ্টির রাতের পর রৌদ্রোজ্জ্বল ঝকঝকে সকাল।

রমিজ মিয়া বিছানা থেকে উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙ্গলেন। তাঁর গায়ে মোটেও জুর নেই। নেই সামান্যতম শাসকষ্ট। একেবারে ঝরবারে-তরতরে লাগছে শরীরটা। যাদের

অ্যাজমার সমস্যা থাকে তাদের সব সময়ই
বুকে হালকা চাপ-চাপ অনুভব হয়। তা-ও
নেই! মনে হচ্ছে যেন তাঁর অ্যাজমা বলে কিছুই
নেই। সৃষ্টি-সবল একজন পুরুষ। মনের ভিতর
কেমন তারুণ্যের ফুর্তি-ফুর্তি ভাব জাগছে।

রামিজ মিয়া নিম্ন ডালের মাজন দিয়ে দাঁত
মাজতে-মাজতে বাড়ির খোলা বারান্দায় এসে
দাঁড়ালেন। উঠনে মরিয়ম বেগম গোসলের পর
ডেজা কাপড় রোদে মেলে দিচ্ছেন। মরিয়ম
বেগমের গায়ে জলপাই রঙের শাড়ি-ব্রাউজ। এ
কী, মরিয়ম বেগমকে আজ এত সুন্দর লাগছে
কেন?! বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে
গোসলের পর মরিয়ম বেগমকে দেখে তিনি
যেমন মুঝ হয়ে যেতেন, তেমনি বিমোহিত হয়ে
গেলেন। মন্ত্রমন্ত্রের মত তাকিয়ে রইলেন। যেন
সেই প্রথম জীবনের দিনগুলো আবার ফিরে
এসেছে!

মরিয়ম বেগমের চোখ পড়ল তাঁর শারীর
দিকে। চোখ পড়তেই বলে উঠলেন, ‘শরীর
এখন কেমন ঠেকছে?’

‘ভাল। খুব ভাল। তোমাকে দেখে শরীর
এখন আরও ভাল লাগছে। একটু কাছে এসো
না।’

মরিয়ম বেগম লজ্জা-পাওয়া গলায়
বললেন, ‘বুড়ো বয়সে ভীমরাত্তিতে ধরল
নাকি?’

মরিয়ম বেগম মুখে ওকথা বললেও
ভিতরে-ভিতরে খুব খুশি হচ্ছেন। কী জানি,
পাগলি মেয়েটার দেওয়া শিকড়ের রস খাওয়ার
পর থেকেই তাঁর ভিতর কেমন কিশোরী-
কিশোরী ভাব চলে এসেছে!

রামিজ মিয়া এগিয়ে আসছেন। মরিয়ম
বেগমের খুব লজ্জা লাগছে। বিয়ের পর পর
প্রথম দিকে যেমন লজ্জা লাগত তেমন!

পাঁচ

রামিজ মিয়ার সুবের দিন। তাঁর স্ত্রী মরিয়ম
বেগম সন্তানসন্তুষ্ট। এই বয়সে গর্ভধারণ করার
কথা নয়। কী করে যেন আচর্জনকভাবে
অসম্ভব ব্যাপারটা ঘটেছে। বোধহয় পাগলি
মেয়েটার দেওয়া ওষধি গাছের শিকড়ের রস
খাওয়ার কারণে। নিচয়ই ওই মেয়েটার ওপর

জিনের আছর আছে! জিনের মাধ্যমেই সে
হয়তো ওই ওষধি শিকড় এনে দিয়েছে। রামিজ
মিয়া আর মরিয়ম বেগমের এত দিনের স্বপ্ন
প্রবর্গ হতে যাচ্ছে। তাঁরা এখন পাগলি
মেয়েটাকে আগের চেয়েও বেশি পছন্দ করেন।

পাগলি মেয়েটা এখন আর আগের মত
তত্ত্ব খায় না। সে খাওয়া-দাওয়া একদমই
কমিয়ে দিয়েছে। তাঁর শরীরের পৃষ্ঠির ঘাটতি
বোধহয় পূরণ হয়ে গেছে। তাঁর রোগা-পাতলা
শরীর এখন পুরোপুরিই সেবে উঠেছে। সে
এখন স্বাস্থ্যবর্তী, লাবণ্যময়ী, অপরূপ রূপবর্তী
এক তরুণী। সারা পৃথিবী খুঁজে বোধহয় তাঁর
চেয়ে সুন্দরী পাওয়া যাবে না! এদিকে গর্ভধারণ
করার পর থেকে মরিয়ম বেগমের খাওয়া-
দাওয়া খুবই বেড়ে গেছে। তিনি আজকাল
সারাক্ষণ পাগলি মেয়েটার পছন্দের খাবার
মাংস, ডিম, কলিজা, মগজ...এসব খেতে
থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন, এই খাওয়া তাঁর
জন্য নয়, তাঁর পেটের বাচ্চাটার জন্য।

পাগলি মেয়েটাকে আজকাল আর পাগলি
বলাও ঠিক হচ্ছে না। সে পুরোপুরি সভ্য-শাস্তি
হয়ে গেছে। আজকাল কথাও বলে স্পষ্ট রয়ে।
কথা বলার সময় জিভ জড়িয়ে যাবার সমস্যা
আর নেই। তবে খুব কম কথা বলে। সারাক্ষণ
চৃপ্তচাপ খিয়ে মেরে কোথাও বসে থাকে। অবশ্য
নতুন করে আর একটা অস্বাভাবিকতা তাঁর
মধ্যে দেখা দিয়েছে। সে হাতের কাছে হেঁড়ো
কাগজ, গাছের পাতা, খড়কুটো যা পায় তাই
মুখের লালা দিয়ে জুড়ে-জুড়ে পাখির বাসাৰ
মত কিছু একটা বানাতে চায়। মাঝে-মাঝে
যাব রাতে তাঁকে ঘরে পাওয়া যায় না। ফজরের
আয়ানের আগে-আগে ফিরে আসে। তখনও
তাঁর হাতে-মুখে ময়লা, ঝুল, খড়কুটো, শুকনো
ঘাস, লতা-পাতার টুকরো লেগে থাকতে দেখা
যায়।

গভীর রাতে সে যে বাইরে যায়, এই
ব্যাপারটা মরিয়ম বেগমের চোখে কয়েকবার
ধরা পড়েছে। মরিয়ম বেগম আজকাল রামিজ
মিয়ার সঙ্গে এক বিছানায় দ্যমান। রামিজ মিয়ার
খাটের নীচে এখন আর পাঁচা রাখা হয় না।
তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর আর কোনও দিনও
অ্যাজমার সমস্যা হবে না।

মরিয়ম বেগম রাতে পানি খাওয়ার জন্য যখন ওটেন তখন একবার পাগলির শোবার ঘর থেকেও ঘুরে যান। মেয়েটাকে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই খুব ভালবেসে ফেলেছেন। কিছুতেই মেয়েটাকে হারাতে চান না।

রাতে খোঁজ নিতে এসে মরিয়ম বেগম যখন মেয়েটাকে বিছানায় দেখতে পান না তখন তাঁর বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। আর বুবি মেয়েটা ফিরবে না! তিনি বসে-বসে মেয়েটার ফেরার অপেক্ষা করেন। ব্যাপারটা তিনি রমিজ মিয়াকেও জানিয়েছেন। রমিজ মিয়া বলেছেন, ‘ওর ব্যাপারে এত মাথা ঘামানোর দরকার নেই। ও স্বাভাবিক কোনও মেয়ে নয়! জিনের আছের থাকা মেয়ে! এমনও হতে পারে ও নিজেই একটা পরী! আমাদের সংসারে ও আশীর্বাদ হয়ে এসেছে! এই নিয়েই আমরা তুষ্ট থাকি।’

সন্ধ্যা রাত।

রমিজ মিয়ার দোকানে মোমের আলো। ইলেকট্রিসিটি নেই। বিকেল থেকে তারী বৃষ্টি হচ্ছে। একটু বড়-বৃষ্টি হলেই ইলেকট্রিসিটি একেবারে নেই হয়ে যাব। পরী বিদ্যুৎ-এর এই-ই দশা! দোকানে কোনও কাস্টমারও নেই।

তবে রমিজ মিয়া দোকানে একা নন। তাঁর সঙ্গে হাজী সলিমউল্লাহ হাই স্কুলের সায়েস শিক্ষক জালাল উদ্দিন রয়েছেন। জালাল উদ্দিনের সঙ্গে রমিজ মিয়ার ছোটবেলা থেকেই বন্ধু। তাঁরা একে অপরকে ‘তুমি’ বলে সমৌন্দন করেন।

রমিজ মিয়া ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে, লেখা-পড়া বাদ দেন। অথচ জালাল উদ্দিন ঢাকা ভার্সিটি থেকে প্রাণীবিজ্ঞানের উপর সর্বোচ্চ ডিপ্লি নিয়ে বের হন।

কুমিল্লায় সেবা ও প্রজাপতি প্রকাশন-এর গল্প, উপন্যাস, ওয়েস্টার্ন, ক্লাসিক, অনুবাদ,

• তিন গোয়েন্দা, কিশোর হরর, মাসুদ রানা ও ধাবতীয় রিপ্রিজ্ট বই বিক্রেতা।

হাসান ইমাম রেলওয়ে বুকস্টল, কুমিল্লা।

প্রোঃ মোঃ কবেল ইমাম

মোবাইল: ০১৬৭১৩৪৩৪১৭

জালাল উদ্দিন খুবই জ্ঞানী লোক। অনেক পড়াশোনা তাঁর। কে জানে কী কারণে এই গ্রামের স্কুলে পড়ে রয়েছেন! চিরকুমার। সারাঙ্গশ পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে তাঁর ভাল লাগে। ঘর ভার্টি মোটা-মোটা বিজ্ঞানের বই। এ ছাড়া বিভিন্ন বিদেশি পত্রিকাও সংগ্রহ করেন। সেসব পত্রিকার সায়েস জার্নালগুলোর প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশি। নিজেও মাঝে-মাঝে দেশি-বিদেশি পত্রিকায় ফিচার লেখেন।

জালাল উদ্দিন প্রতি সন্ধ্যায়ই রমিজ মিয়ার দোকানে আসেন। আড়ত দিতে নয়, খবরের কাগজ পড়তে। রমিজ মিয়া প্রতিদিন দুটো করে খবরের কাগজ রাখেন। তাঁর নিজের তেমন খবরের কাগজ পড়ার আস্তিন নেই। জালাল উদ্দিনের জন্যই রাখেন। জালাল উদ্দিনকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। জ্ঞানী মানুষ, তাঁর জ্ঞানী-জ্ঞানী কথাবার্তা শুনতে ভাল লাগে। অনেক কিছু জানা যায়।

রমিজ মিয়া এমনিতে কারও সঙ্গে বাস্তিগত আলাপ করেন না। তবে জালাল উদ্দিনের সঙ্গে সব কথাই বলেন। পাগলি মেয়েটাকে কোথায়-কীভাবে পেয়েছেন, মেয়েটার আচার-ব্যবহার, মেয়েটার দেওয়া শিকড়-বাকড়-লতা-পাতার রস খেয়ে তাঁর অ্যাজমা চিরতরে ভাল হয়ে গেছে, তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে-গুরু থেকে এসবই জানিয়ে আসছেন। পাগলি মেয়েটাকে ইদানীং তাঁর যে পরী বলে সন্দেহ হয় তাও বলেছেন।

জালাল উদ্দিনের মতে জিন-পরী বলতে বাস্তবে কিছুই নেই। সবই গল্পগাথা। জিন-পরীর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তবে তিনি ভিতরে-ভিতরে পাগলি মেয়েটাকে নিয়ে অন্য কিছু ভাবছেন। মেয়েটাকে তিনিও স্বাভাবিক মানুষ মনে করছেন না। কিছু একটা ব্যাপার

আছে! একদিন তিনি রমিজ মিয়ার বাড়ি গিয়েছিলেন মেয়েটাকে দেখতে। মেয়েটাকে দেখে তিনি চমকে যান। অমন নিষ্ঠুর সুন্দরী সাধারণত খুব কমই দেখা যায়। গা থেকে যেন উজ্জ্বল দৃতি ছড়াচ্ছে! চোখে চোখ পড়তেই তাঁর কেমন অস্ত্রিত হয়। মনে হয় মেয়েটা যেন তাঁর মাথার ভিতর ঢুকে গেছে! খোলা বইয়ের মত তাঁকে পড়ে ফেলছে! তিনি যে মেয়েটাকে অতিমানবী পর্যায়ের কিছু সন্দেহ করছেন, এটাও বুঝে ফেলেছে! তাঁর মাথার ভিতরে ভোতা এক ধরনের যন্ত্রণা শুরু হয়। চোখ সরিয়ে নেবার আগে দেখেন, মেয়েটার ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির রেখা।

আজও পাগলি মেয়েটাকে নিয়ে কথা হচ্ছে
রমিজ মিয়া আর জালাল উদ্দিনের মধ্যে।

রমিজ মিয়া যেই বললেন, পাগলি মেয়েটা আজকাল কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। সারাক্ষণ মুখের লালা লাগিয়ে-লাগিয়ে খড়কুটো, ছেঁড়া কাগজ, গাছের পাতা, শুকনো ঘাসের টুকরো জুড়ে-জুড়ে পাখির বাসার মত কী যেন বানাতে চায়। এরপর থেকেই জালাল উদ্দিন কেমন কিম্ব মেরে গেছেন।

অনেকক্ষণ পর জালাল উদ্দিন মুখ ঝুঁকলেন, ‘বজ্রাখুপুর প্রামের সেই কবিরাজের মেয়েটা কেবে নাগাদ জানি নির্বোজ হয়েছিল?’

রমিজ মিয়া অবাক হয়ে বললেন, ‘সেটা জেনে কী করবে?! পঁচিশ বছর আগে মনে হয়।’

‘ও, আচ্ছা। সেই মেয়েটা তাঁর মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় তো তাঁর মায়ের উপর একবার বজ্রাপাত হয়েছিল, তাই না?’

‘হ্যাঁ। মহিলা কীভাবে যেন বেঁচে গিয়েছিলেন।’

‘সেই মেয়েটাই নাকি তাঁর কবিরাজ বাবাকে বলে দিত, কোন্ রেগীকে কোন্ গাছের শিকড়-বাকড়, রস দিয়ে ওষুধ বানিয়ে দিতে হবে। তা কি তোমার খেয়াল আছে?’

‘হ্যাঁ, আছে।’

‘তোমাকে এবং তোমার স্ত্রীকে ওষুধি গাছের শিকড়-বাকড় এনে দিয়েছে তোমার বাড়ির পাগলি মেয়েটা। এতে তুমি কোনও মিল

ঞেজে পাওনি?’

‘না তো! যাথা খারাপ, পাগলদের মধ্যে অনেক সময় এধরনের ওষুধি গাছ-গাছড়ার শিকড়-বাকড় জোগাড় করে দেবার ক্ষমতা দেখা যায়। এটা তাঁরা কীভাবে করে জানি না। অনেকে বলে জিনের মাধ্যমে করে। তুমি কি বলতে চাচ্ছ, পঁচিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া কবিরাজের সেই মেয়েটাই এই পাগলি মেয়েটা! সেটা কোনও দিনও সন্তুর?! সেই মেয়েটা হারিয়ে গিয়েছিল বিশ-একুশ বছর বয়সে। পঁচিশ বছর পরও তাঁর বয়স বিশ-একুশ থাকবে, তা কী করে হয়?!’

‘তোমার-আমার ক্ষেত্রে সন্তুর নয়। কিন্তু আমি যা ভাবছি, সে যদি তাই হয়, তা হলে সন্তুর।’

‘তুমি কী ভাবছ?’

‘চলো, আগে যাচাই করে দেখি। তারপর বলছি আমি কী সন্দেহ করছি।’

রমিজ মিয়া আশ্চর্য-হওয়া গলায় বললেন, ‘কোথায় যাব?’

‘মেয়েটাকে তুমি যেখান থেকে পেয়েছ সেখানে। মানে, পরিত্যক্ত জুট মিলটায়। সেখানে গিয়ে খুঁজে দেখি, আমার সন্দেহ মিলে যাব কিনা।’

রমিজ মিয়া আর জালাল উদ্দিন পরিত্যক্ত জুট মিলের ভিতরে। তাঁদের দু'জনের হাতে বড়-বড় দুটো টর্চ। টর্চের আলো ফেলে-ফেলে তাঁরা খোলা, লম্বা জুট মিলের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ধূলো-ময়লা, মাকড়সার ঝুল আর ভাপসা গন্ধ ছাড়া কিছুই তাঁদের চোখে পড়ছে না।

তাঁরা জুট মিলের একেবারে ভিতরের দিকে শেষ মাথায় চলে এসেছেন। সেখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর মেবেতে একটা লোহার শেডের পাটাতনের মত দেখতে পেলেন। দু'জনে মিলে পাটাতনটা তুলে ফেললেন। দেখা গেল একটা সিড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে।

তাঁরা বুঝতে পারলেন মেবের নীচের ওই ঘরটা জুট মিলের গুদাম ঘর হিসেবে ব্যবহার হত।

তাঁরা সিডি ধরে নীচে নেমে গেলেন। বেশ বড়সড় ফাঁকা একটা কামরা। সেতেসেতে ভেজা-ভেজা গন্ধ। কেমন দম বৰ্দ্ধ-দম বৰ্দ্ধ পরিবেশ।

কয়েক পা এগোতেই তাঁদের টর্চের আলোতে ধৰা পড়ল, সিলিং থেকে নামা মাকড়সার ঝুলৱৰ মত এক শুচ্ছ আঁশযুক্ত কিছুর মাথায় কোলবালিশের মত বিশ্বাল একটা পেটলা ঝুলছে।

তাঁরা দু'জন সেদিকে এগিয়ে গেলেন। পেটলাটা খড়কুটো, ছেঁড়া পাটোর আঁশ আৱ নাৱকেল-সুপাৰি জাতীয় গাছেৰ পাতা ঢিৰে-ঢিৰে লালা জাতীয় কিছু লাগিয়ে বাবুই পাখিৰ বাসাৰ মত ঠাসবুনটৈ তৈৰি হয়েছে। দানব আকৃতিৰ রেশম পোকাৰ ঘাঁটিৰ সঙ্গেও তুলনা কৰা যায়। পেটলার এক মাথা ডিমেৰ খোসাৰ মত ভাঙ। ভাঙ অংশটা মেৰেতে পড়ে রয়েছে। ভিতৰটা ফাঁপা। দেখৈ বোৰা যাচ্ছে এৱ ভিতৰে কিছু ছিল। মাথাটা ভেড়ে ভিতৰ থেকে বেৰ হয়ে গেছে।

রমিজ মিরা বিশ্বিত গলায় বলে উঠলেন, ‘এটা কী?!'

জালাল উদ্দিন বিজ্ঞেৰ মত বলতে লাগলেন, ‘এটা ঘুমবাড়ি। এই ঘুম বাড়িৰ মধ্যেই তোমাৰ বাড়িৰ পাগলি মেয়েটা পঁচিশ বছৰ ধৰে ঘুমিয়ে ছিল। এই ঘুমকে বলে হাইবাৰনেশন। সাপ, ব্যাঙ, ক্যাটফিশ... কানাডা-উত্তৰ আমেരিকায় গ্ৰিজলি ভালুকৰা এভাৱে শীতেৰ সময় শীতঘুম দেয়। ওৱা অবশ্য এমন ঘুমবাড়ি বানায় না। কোনও গৰ্তে-টৰ্টে আশুষ নেয়। উন্নত-বৃক্ষিমান প্ৰাণীৰ কাজ-কৰ্ম উন্নত হবে এটাই ব্যাতীবিক।’

রমিজ মিরার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। তাঁৰ কাছে জালাল উদ্দিনেৰ কথা অবিশ্বাস্য লাগছে।

তিনি বিশ্বয়ে বিশৃঢ়-হওয়া গলায় বললেন, ‘ওই মেয়েটা কেন পঁচিশ বছৰ ধৰে ঘুমিয়ে কাটাৰে?! সেটা কি কোনও মানুষ কৰতে পাৰে?’

‘পাৰে। অস্বাভাৱিক ক্ষমতা সম্পন্ন Homo Superior হলৈ পাৰে। Homo Superior ইছে Homo Sapiens-এৰ উন্নত প্ৰজাতি। আমাৰা সাধাৰণ মানুষৰা হচ্ছি Homo Sapiens। মিউটেশনেৰ মাধ্যমে সাধাৰণ মানুৰেৰ ডি.এন.এ পৱিবৰ্তিত হয়ে Homo Superior তৈৰি হৰাৰ কথা। পাৰমার্থিক রেডিয়েশন অখৰা যে কোনও ধৰনেৰ রেডিয়েশনেৰ প্ৰভাৱে ডি.এন.এ পৱিবৰ্তন হতে পাৰে। ওই মেয়েটা যখন তাৰ মায়েৰ পেটে তখন তাৰ মায়েৰ উপৰ বজ্ঞপাত হয়েছিল। বজ্ঞপাতেৰ রেডিয়েশনেৰ প্ৰভাৱেই মেয়েটো হয়তো Homo Superior হয়ে জন্মেছিল।’

রমিজ মিরা বসে-যাওয়া গলায় পশু কৰলেন, ‘সে যা-ই হোক, অন্য কিছু তো নয়-মানুষই তো। আমাকে এটা বোৰ্তাৰ, পঁচিশ বছৰ ধৰে ঘুমিয়ে কাটাৰে কেলেন?’

জালাল উদ্দিন আৰাৰ বিজ্ঞেৰ মত বলতে লাগলেন, ‘বৃক্ষিমান উন্নত প্ৰজাতিৰ মানুষৰা কখনওই আমাদেৱ মত জাগতিক কাজে নিজেকে নিঃশেষ কৰবৈ না। তাৰা আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য-সবকিছু কম ব্যৱহাৰ কৰবৈ। এমনকী নিজেদেৱ আয়ু পৰ্যন্ত। হাইবাৰনেশনেৰ মাধ্যমে তাৰা এটা কৰে। তাৰা এক-একজন হাজাৰ-হাজাৰ বছৰ ধৰে বেঁচে থাকবৈ।’

রমিজ মিরা আৰাৰ পশু কৰলেন, ‘ওই মেয়েটোৰ মত উন্নত প্ৰজাতিৰ মানুষ আৱ ক'জন আছে পৃথিবীতে?’

‘আমাৰ জানা মতে এখন পৰ্যন্ত পৃথিবীৰ কোথাও Homo Superior জন্ম নেয়নি। হতে

ক্যামিলি বুক সেন্টার

এম এস প্লাজা, রাজলক্ষ্মী, সেন্ট্রু-৩, রোড-২
উত্তরা, ঢাকা।

এখানে সেৱা প্ৰকাশনী ও প্ৰজাপতি প্ৰকাশনেৰ নতুন ও সমষ্টি রিপ্ৰিণ্ট বই পাওয়া যায়।
মোবাইল: ০১৮৩২২৫৭৪৬৮, ০১৭৩০১৬৫৯০৫

পারে তোমার বাড়ির ওই পাগলি মেয়েটাই পৃথিবীর প্রথম Homo Superior। আমি ওই মেয়েটার কথা বিদেশি পত্রিকায় চিঠি লিখে জানাব। মেয়েটার কথা জানার পর জেনেটিক এঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে হইচই পড়ে যাবে। তারা মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মেয়েটার ডি.এন.এ-র সিক্কোয়েসগুলো জেনে ফেলবে। মেয়েটাকে চোখে-চোখে রাখতে হবে। মেয়েটা খাওয়া-দাওয়া করিয়ে দিয়েছে, এর মানে ওর আবার শুশ্র কোনও স্থানে হাইবারনেশনে যাবার সময় হয়ে এসেছে। হাইবারনেশনে খাকার মত পর্যাণ চর্বি গায়ে জমিয়ে ফেলেছে। হাইবারনেশনে যাবার জন্যই এতদিন বেশি-বেশি খেয়ে গায়ে চর্বি জমিয়েছে। ওকে হারিয়ে ফেললে বিদেশি পত্রিকায় চিঠি লিখে জানিয়ে কিন্তু কিছুই করা যাবে না।'

ছয়

সকাল থেকে পাগলি মেয়েটাকে ঝুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রমিজ মিয়া আর মরিয়ম বেগম সমস্ত বাড়ি তন্ত্রজ্ঞ করে ঝুঁজেছেন। কোথাও নেই মেয়েটা। মেয়েটার জন্য তাঁদের খুব খারাপ লাগছে! মন কেমন করছে। বুক ফেটে কান্না পাচ্ছে! তাঁরা দুঃজনেই মেয়েটাকে বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছেন!

রমিজ মিয়া আর মরিয়ম বেগম ঝুঁজতে-ঝুঁজতে এক পর্যায়ে তাঁদের বাড়ির পিছনের পরিয়ত্ব গোয়ালঘরটায় এসে ঢুকেছেন। গোয়ালঘরের মাঝ বরাবর আড়ার সাথে খড়কুটো, ছেঁড়া কাগজ, শুকনো ঘাস, লতা-পাতা দিয়ে বানানো বিশাল আকৃতির কোলাবালিশের মত একটা পেটলা ঝুলেছে।

মরিয়ম বেগম সাংস্কৃতিক আচর্য হয়ে অঙ্কুর গলায় বলে উঠলেন, 'এটা কী?!!'

রমিজ মিয়া ঘোরালাগা মানুষের মত বলতে লাগলেন, 'এটা সুমবাড়ি!!! এমনই একটা ফাঁকা সুমবাড়ি গতরাতে জালাল আমাকে জুট খিলের মাটির নীচের গুদাম ঘরেও দেখিয়ে এলেছে। দেখিয়ে বলেছিল, ওই সুমবাড়িটার মধ্যেই পাগলি মেয়েটা গত পঁচিশ বছর ধরে সুমিয়ে ছিল! মেয়েটা নাকি নতুন উন্নত

প্রজাতির মানুষ! আমাদের মত সাধারণ মানুষ নয়। আমি তখন জালালের কথা বিশ্বাস করিনি। এখন ব্রহ্মতে পারাছি জালাল যা বলেছে, তা ঠিক। মেয়েটা এখন এই সুমবাড়িটার ভিতরে! জালাল আমাকে এমনটাই বলেছিল যে, মেয়েটা এখন আবার কেনও শুন্ত জয়গায় সুমবাড়ি বানিয়ে নেবে। জালালকে কি এই সুমবাড়ির কথা জানানো কি ঠিক হবে? জালাল জানতে পারলে, চিঠি লিখে পৃথিবীর বড়-বড় বিজ্ঞানীদের এই সুমবাড়ির কথা জানিয়ে দেবে। সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হবে। সুমবাড়ি থেকে মেয়েটাকে বের করে গবেষণার জন্য নিয়ে যাবে। কিছু বলছ না কেন, জালালকে কি জানাব?'

মরিয়ম বেগম বিম বিম মেরে রয়েছেন। তাঁর মাথার ভিতর কেউ কথা বলছে। কথা বলছে তাঁর পেটের ভিতরের অনাগত বাচ্চাটা। এর আগেও তাঁর এমনটা কয়েকবার মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, পেটের ভিতরে বাচ্চাটা তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'এই, তুই ছেলে, না মেয়ে?'

জবাব দেয়, 'ছেলে।'

এরপর থেকে তিনি নিশ্চিত হয়ে যান তাঁর ছেলেই হবে।

এখন আবার বাচ্চাটা পেটের ভিতর থেকে কথা বলছে। স্পষ্ট শব্দতে পাছেন, 'মা, এই সুমবাড়ির কথা কাউকে জানিয়ো না। কাউকে জানিয়ো না। ভুলেও কাউকে জানিয়ো না...সুমবাড়ির ভিতরের ওই মেয়েটার মত আমিও একজন নতুন প্রজাতির মানব। আমি এখন তোমার পেটের ভিতরের সুমবাড়িতে। কিছু দিনের মধ্যেই তোমার পেটের ভিতরের এই সুমবাড়ি থেকে আমি বের হয়ে জন্ম নেব। ওই মেয়েটাও আবার পঁচিশ বছর পর সুমবাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে আসবে। তখন আমার সঙ্গে ওই মেয়েটার বিয়ে হবে। আমাদের খেকেই ধীরে-ধীরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে নতুন প্রজাতির উন্নত মানব সম্প্রদায়। ততদিন আমাদের দুঃজনকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের। সুমবাড়ির কথা ভুলেও কাউকে জানিয়ো না...' ■

জানা-অজানা

ব্রিয়ার্ড বা হিমবংশু

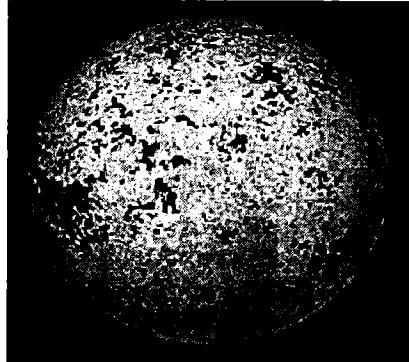
মধ্য অক্ষাংশ ও উচ্চ অক্ষাংশের দেশগুলোতে শীতকালে প্রবাহিত এক ধরনের হিমশীতল প্রবল বায়ুপ্রবাহ। এই বায়ুপ্রবাহের ফলে প্রবল তুষারপাত হয়ে থাকে এবং দৃষ্টি গোচরতার সূচক শূন্যে নেমে যায়। উভর আমেরিকার সমতল ভূমিতে এই বায়ুপ্রবাহকে ব্রিয়ার্ড বলে।

**এক দৃষ্টিতে কোনও কিছুর দিকে
তাকিয়ে থাকলে চোখ দিয়ে পানি
পড়ে কেন?**

সাধারণত বাথা পেলে চোখ দিয়ে পানি পড়ে, আমরা একে বলি কান্না। মনে বাথা পেলে বা মনের দুর্ব্বেও কান্না আসে। আবেগ-অনুভূতির কারণেও চোখে পানি আসে। তবে একে কান্না বলা যায় না। চোখের সুরক্ষার জন্যও পানি আসতে পারে। যেমন, ধূলোবালি বা বাইরের কেন বস্তুগুলা চোখে ঢুকলে পানি আসে। এটি চোখের য়য়লা ধূয়ে বাইরে বের করে দেয়ার একটি পদ্ধতি। কোন কিছুর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখে চাপ পড়ে। এসময় চোখের ভেতরের অংশ আর্দ্র বা ভেজা-ভেজা রাখার জন্য চোখে পানি আসে। এতে দৃষ্টি ধরে রাখা সহজ হয়। কোনও কিছুর দিকে একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে নাত্তের উপর চাপ পড়ে, তখন অঙ্গুষ্ঠি থেকে পানি বেরোয়। চোখের উপরের পাতার ভেতরে থাকে টিয়ার গ্ল্যাও বা ল্যাকরামাল গ্ল্যাও। ওখান থেকে চোখে পানি নেমে আসে। বেশি পানি থাকলে চোখের দুই কোনার দুটি ছেষ ছিদ্র পথ দিয়ে তা অঞ্চ হিসেবে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

**অতিরিক্ত ভয়ে অজ্ঞান হওয়ার
কারণ কী?**

ভয়ের কোনও ঘটনা ঘটলে তাকে সামাল দেয়া যায় পালিয়ে অথবা সেই অবস্থার মুরোমুরি হয়ে। যখন এ দুটোর কোনওটাই সম্ভব হয় না;



তখন তয় আরও বেড়ে যায়। এই অবস্থায় আমাদের অবচেতন মন মস্তিষ্কের স্নায়কেন্দ্রগুলোকে দমন করে অনুভূতিগুলোকে লঙ্ঘ করে। এ সময় মস্তিষ্কে বক্সের জোগানও কমে যায়। এরই ফলে আমরা অতিরিক্ত ভয় পেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

**গ্যালাক্সি ও ধূমকেতুর মধ্যে কোনটি
সৌরজগতের বস্ত নয়?**

সূর্য একটি তারা। এরকম অনেক তারা নিয়ে এক-একটি গ্যালাক্সি গঠিত। গ্যালাক্সির তারাগুলো পারস্পরিক মহাকর্ষবলের প্রভাবে আবর্তিত হয়। একটি গ্যালাক্সি থেকে অন্য গ্যালাক্সি অনেক দূরে থাকে, মাঝামাঝি মহাশূন্য। সৌরজগৎ হলো সূর্য ও তার মহাকর্ষবলের আওতাধীন আটটি গ্রহ ও তাদের উপগ্রহের সমষ্টিয়ে গঠিত এলাকা। সৌরজগৎ যে গ্যালাক্সিতে রয়েছে তাকে বলে ছায়াপথ। এটি প্রায় একলাখ আলোকবর্ষ চওড়া। এর ভেতরে প্রায় ২০ হাজার কোটি তারা রয়েছে। ধূমকেতুগুলো সৌরজগতের বাইরে কোথাও সৃষ্টি হয়ে ঘুরতে-মুরতে সৌরজগতের মধ্যে চলে আসে। এর কঙ্কপথ মেশ বিস্তৃত। হালিলির ধূমকেতু প্রতি ৮০ বছর পরপর প্রথিবীর কাছ দিয়ে ঘূরে-যায়। সুতরাং ধূমকেতু আমাদের সৌরজগতের বাইরের বস্ত। আর ছায়াপথ নামের গ্যালাক্সির ভেতরে সৌরজগতের অবস্থান। ■

সঞ্চারে: শাহরীন সোনিয়া

ଶେଷ ଚାଲ

ମୂଳ ■ କରେଟା ପ୍ଲାଭକ୍ଷା
ରୂପାନ୍ତର ■ ତାରକ ରାୟ

'ଦେଖ
ସାର୍ଟିଫିକେଟ
ଆମି
ଦେଖେଛି,' ଫିଲ୍ମ
ବଳଣ ।
'ଓତେ ହାଟ
ଅୟାଟାକେର
କଥାଇ
ଲେଖା
ଛିଲ ।'



ତେଲକ ମେଯାର ଯେ ଟୋବିଲେ ଜୀବନେର ଶେଷ ଦାବା ଖେଳେଛିଲେନ ସେଟୋଯ ଧୁଲୋ ପଡ଼େ ଆଛେ । ହାତିର ଦାଁତେର ଦାବାର ଗୁଡ଼ିଗୁଲୋଯ ଧୁଲୋର ପାତ୍ତଳା କ୍ର ପଡ଼େଛେ । ଅୟାଶ୍ଟ୍ରେତେ ମିଗାରେଟେର ଏକଟା ଗୋଡ଼ ଏମନତାବେ ଛାଇୟେର ଉପର ପଡ଼େ ଆଛେ ଯେନ ଓଟାର କବର ହେବାରେ ।

ଆର ଡେଲଫ ଓ ଶୀଘ୍ର ଧୁଲୋଯ ପରିଣତ ହେବେ, ଭାବଳ ଭେରା । ହାତ ଦିଯେ ଦୁଚୋଖ ଢାକଳ । ଯେ କମ୍ବେ ଡେଲଫ ମାରା ଗେଛେ ଓଟାତେ ଯେତେ ପାରାହେ ନା । ଲିଙ୍ଗିଙ୍କରେ ଦୌଡ଼ିଯେ ଓର ମନେ ହଚ୍ଛେ ପ୍ରତୋକ କୋନା ଥେକେ ଡେଲଫ ଓର ଦିକେ ନଜର ରାଖାହେ ।

ଶ୍ଵାମୀୟ ପୁଲିଶ ସେଶନେର ଡିଟୋକଟିଭ ଫିଲ୍ମ ଓକେ ଓଇ କମ୍ବେର ବ୍ୟାପାରେ ଶୁନିଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିମେହେ । 'ଓଥାନେ ଯାବେନ ନା, ମିସେସ ମେଯାର । କୋନାଓ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରବେନ ନା । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ନା ହେବ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବ କିଛି ଜାଯଗା ମତ ଥାକା ଉଚିତ । ତଦନ୍ତେର ଜନ୍ୟ ଏଟା ଖୁବଇ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।'

ତଦନ୍ତ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ବଡ଼ି ଆହୁତ ଶବ୍ଦ । ଏସବ ଦିଯେ ଏକଟା କଥାଇ ବୋଝାହେ, ଡେଲଫିର ହଠାତ୍ ଘୃତ୍ୟାତେ ପୁଲିଶ ପୁରୋପୁରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାୟ ।

ଭେରା ନିଶ୍ଚିତ, ଡାକ୍ତାରେର ସାର୍ଟିଫିକେଟେ ଲେଖା ଥାକବେ ଡେଲଫିର ହାଟ-ଅୟାଟାକେ ଘୃତ୍ୟ ହେବାରେ । ଆର ରମେହେ ତଦନ୍ତେର ବ୍ୟାପାର! ହାସ୍ୟକର! କୋନାଓ କିଛିଇ ବେରୋବେ ନା । ଶୁଧୁମାତ୍ର ରହିଟିନ ଓସର୍କ ।

গেইমরমে ভেরা পেছন ফিরে দাঁড়াল। ও লধা, আকর্ষণীয় দেহের অধিকারিণী। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। রাগলে ওর ধূসুর চোখের দৃষ্টি কঠিন আর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর অন্যসময় থাকে নরম, স্থির। সবসময় ওর হাঁটার গতি থাকে ধীর, নিষ্ঠজ। কিন্তু এখন প্রায় দোড়ে আয়নার কাছে চলে গেল।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখল। না, কোনও পরিবর্তন নেই ওর মধ্যে। একই রকম দেখাচ্ছে ওকে। হয়তো চেহারা একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, কিন্তু উভে কোনও নার্তাসমেস কিংবা ভয়ের ছাপ নেই। একজন বিধবাকে যেমন দেখানোর কথা ওকে তেমনি দেখাচ্ছে।

ক্লান্ত। অসুস্থী। কারণ, ডেলফিকে কয়েক দিন আগে কবর দেয়া হয়েছে।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে ওকে আর কার্লকে অনেক সহজ করতে হচ্ছে। ডেলফি যেদিন মারা গেছে, সেদিন থেকে কার্ল ফিরে আসেনি। কারণ, কার্ল ডেলফির সঙ্গে দাবা খেলত। ব্যবহার কার্লকে নার্তাস দেখাত।

ভেরা আশা করছে, কার্ল নিজেকে সামলাতে পারবে। অনেক সময় একটু আঘাতেই কার্ল নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এখন কিছুতেই ভুল করা চলবে না।

অল্লদিন পরেই ওদের বন্ধুরা দেখা করতে আসবে। ওরা কেক, ক্যাপি এমনকী ফুলও আনবে। হয়তো কার্ডও খেলবে। এখন আধুনিক মৃগ। বিনোদন একজন বিধবাকে দুঃখ ভুলতে সাহায্য করবে।

কার্লও আসবে। ও ফোন করে বলেছে আজ রাতে আসবে। কার্ল সুদৰ্শন, সুপুরুষ। ডেলফি ওর মত কথমও ছিল না। এমনকী ওর চেয়ে ভাল দাবাও খেলতে পারত না। স্পার্কহিলে ডেলফি দাবা খেলায় একমাত্র চ্যাম্পিয়ন ছিল ব্যদিন স্না কার্ল এই শহরে এল।

কার্লের সঙ্গে প্রথম দেখা হবার দিনটা ভেরার মনে পড়ে গেল। জারগাটা ছিল শহরের গ্যাস স্টেশন। নিজের গাড়ি ঠিক করানোর জন্য ভেরা সেদিন ওখানে গিয়েছিল।

কাজে যাবার পথে কার্ল ওকে দেখে হেসেছিল। ভেরাও হেসেছিল। হঠাতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল ও।

‘তুমি এখানে থাক?’ কার্ল জিজ্ঞেস করে। ভেরা মাথা বৌকায়। কথা বলতে ভয় পাচ্ছিল। কার্লের কালো চোখের দৃষ্টিতে ভেরার সেন্টৰ্সের প্রশংসা সরাসরি দেখা যাচ্ছিল। ভেরার মনের ভিতরে একটা কথাই বেজে উঠেছিল, এটা সাধারণ কোনও বস্তুত নয়। কিন্তু প্রচণ্ড উভেজনা ওর মনের কথাকে উড়িয়ে দেয়।

‘আশা করি টাউন ফেস্টিভেলের সময় আমাদের দেখা হবে,’ কার্ল আত্মে করে বলে।

‘আমরা খুব একটা বের হই না,’ ভেরা বলে। ‘আমার স্বামী দাবা খেলতে খুবই পছন্দ করে।’ হঠাতেই ও জানতে পারে কার্লও দাবা খেলতে পারে। আর এভাবে ওদের দু’জনের সম্পর্ক শুরু হয়।

কার্ল যেদিন প্রথম এক বাক্স ক্যাপি ওর জন্য নিয়ে এসেছিল, কার্লের হাতের নরম এক স্পর্শ ওর হাতকে যেন পুঁজিয়ে দিচ্ছিল। তারপর সে ডেলফির সঙ্গে দাবা খেলতে গেইমরমে চলে গিয়েছিল।

আজ রাতে কার্ল আবার আসবে। প্রথমবারের মত ওরা মিলিত হবে যেখানে ডেলফি থাকবে না।

ভেরার হাত কাঁপছে। হঠাতে ভয় লাগল ওর। দোড়ে লিভিংরমে চলে এল। আশা করছে কার্ল তাড়াতাড়ি এসে পড়বে। তা হলে দু’জনে ড্রিংক করতে পারবে।

সদর দরজার ঘণ্টি তাঁক্ষ শব্দে বেজে উঠল। কিন্তু কার্ল না। প্রথমবারের মত ওর অনুভূতি ব্যর্থ হলো। এটা একটা সতর্ক বার্তা! কোনও কিছুই সহজভাবে হচ্ছে না।

ডিটেকটিভ ক্লিন সদর দরজার টোকাটে দাঁড়িয়ে আছে। আগারটেকার যখন পুলিশ স্টেশনে ফোন করেছিল, ক্লিন তখন এই বাড়িতে একবার এসেছিল। মনে হচ্ছিল, ডেলফির মত কেউ হঠাতে যারা গেলে, ডাঙ্কার তাড়াতাড়ি আসতে না পারলে পুলিশকে ডাকা

হয়।

ত্বরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্লিনের দিকে তাকাল। মনের মধ্যে বরফ শীতল এক অতৎক অনুভব করল ও। ডিটেকটিভকে লিভিংরুমে নিয়ে এল। ওর প্রত্যেকটি নড়াচড়া ফ্লিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে, এটা অনুভব করতে পারল।

‘কেমন আছেন?’ ফ্লিন জিজ্ঞেস করল।

‘ভাল। আগের চাইতে একটু ভাল। এত দ্রুত সব কিন্তু ঘটে গেল ভাবতে পারছি না। মনের মধ্যে একটা কথাই বার বার খোঁচাচ্ছে, সাথে সাথে ডাঙ্কার এল না। তা ছাড়া আপনি আসার আগ পর্যন্ত আশারটেকার ওকে ছয়েও দেখেনি। ওর রুমের ভেতরে তাকাতে পারছি না। প্রতিটা মিনিটে ধুলোর ত্বর পুর হচ্ছে! রুমটা আমি কখন পরিষ্কার করতে পারব?’

‘কাজ হয়ে গেলে পারবেন,’ ফ্লিন শান্ত কষ্টে বলল। ‘সিগারেট চলবে?’

ত্বরা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে। তাই সিগারেট নিতে গিয়ে ওর হাত কাঁপল না। ডিটেকটিভের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

‘আপনার স্বামীর মৃত্যুতে আমি সন্তুষ্ট না,’ ফ্লিন আন্তে করে বলল। ‘আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন। শেবার দাবা খেলার সময় কী ঘটেছিল আমাকে আবার বলুন, প্রিজ।’

‘ডেলফ আমাদের বন্ধু কার্ল সমারসের সাথে দাবা খেলছিল।’

ফ্লিন মাথা ঝাঁকাল।

‘দাবা একটা শান্ত খেলা। খেলোয়াড়েরা শান্তভাবে বনে ঘটার পর ঘটা ধরে খেলে। অবশ্য এ খেলার সম্পর্কে কিছুই জানি না, কিন্তু এটা একটা ভাল শখ,’ ত্বরা বলল।

‘এটা শান্ত খেলা?’ ফ্লিন নরম কষ্টে জিজ্ঞেস করল। ‘না, এমন হতে পারে না, বিশেষ করে খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে। ওরা তো মনে মনে তীব্র উত্তেজিত থাকে। একজন খেলোয়াড় যখন চাল দেয়, ওর হাট তখন দ্রুত চলে। ব্রাড প্রেশার হাই হয়ে যায়।’

ত্বরা ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

‘হ্যা, আপনি ঠিক বলেছেন। মনে হয় এই কথাই ডেলফিকে পরীক্ষা করে ডাঙ্কার

বলেছেন। হাট অ্যাটাক। তা ছাড়া ওর হাটের কানিশন এয়ানিতেও ভাল ছিল না।’

‘ডেথ সার্টিফিকেট আমি দেখেছি,’ ফ্লিন বলল। ‘ওতে হাট অ্যাটাকের কথাই লেখা ছিল। আপনি বলেছিলেন শেষ চালটা দিয়েই ডেলফি চেয়ারে ঢলে পড়ে যান?’

ফ্লিন যেভাবে তাকিয়ে আছে, ত্বরার সেটা পছন্দ হলো না।

‘হ্যা,’ ত্বরা বলল। ‘ডেলফি শেষ চাল দিয়েছিল। আপনি আমার সাথে এমন করছেন কেন? এসব প্রশ্ন তো ঘটনার দিনই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?’

‘উত্তেজিত হবেন না,’ ফ্লিন বলল। ‘আপনি তো একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন, তাই না?’

‘হ্যা। আর কোনও সন্দেহ থাকলে কার্লের সাথে সেটা মিলিয়ে নিতে পারেন। মনে হয় ও এসে পড়েছে।’

কার্ল এসেছে। ও দ্রুত এল। বিপদ দেখলে চিতার মত নিঃশব্দ, সতর্ক পদক্ষেপে এগোয়। ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ত্বরার উপর নিরুদ্ধ।

ফ্লিন ওকে দেখল। সহসা ঘুরে দাঁড়াল। একটু বিজ্ঞা শোধ করছে।

‘বসুন, মি. সমারস,’ ফ্লিন কার্লকে বলল। ‘মিসেস মেয়ার আবারও আমাকে বললেন কীভাবে তাঁর স্বামী মারা যান। উনি বললেন, ডেলফি দাবার একটা চাল দিয়ে চেয়ারে হেলান দেন। তারপর মেবেতে ওনার শরীর ঢলে পড়ে। আপনি নিচয়ই একই কথা বলবেন?’

কার্ল মাথা নাড়ল। ‘অবশ্যই।’

ফ্লিন উঠে দাঁড়াল। ‘আমি দাবা খেলোয়াড় হিসেবে ওর খুব সুন্ম শুনেছিলাম। আপনি কি আমার সাথে একটু গেইমকর্মে আসবেন?’

কার্ল সায় জানাল। হঠাৎ সদর দরজা খুলে একজন পুলিশ সার্জেন্ট আর দু’জন কলস্টেবল ঘরে ঢুকল। ওরা কার্লের দিকে এগিয়ে এল।

কার্ল ঘুরে দাঁড়াল। ওর দাঁচি গেইমকর্মের দিকে। ওর গালের পেশি তির তির করে

প্রকাশিত হয়েছে

নোবেল বিজয়ী কথাসাহিত্যিক সল বেলো-র অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস হেগুরসন দ্য রেইন কিং রূপান্তর: বাবুল আলম



আফ্রিকায় এলাম। কেন এলাম? চট করে সে উত্তর দিতে পারব না। তবে টাকার কথা দিয়ে আরম্ভ করতে পারি। আমি ধীনী। বাবার কাছ থেকে পাই তিরিশ লাখ ডলার। কিন্তু আমার চালচলন ভবযুরের মত।

...জীবনের অর্থ খুঁজতে আফ্রিকায় এল হেগুরসন। তারপর জড়িয়ে পড়ল নানা ধরনের রোমাঞ্চকর ঘটনায়। বন্দি হলো আদিবাসীদের হাতে। শেষ পর্যন্ত কি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারল সে? সংগ্রহে রাখার মত একটি বই। প্রাঞ্জল অনুবাদ। টানটান উত্তেজনায় ঠাসা।

দাম ■ সাতান্ন টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৮ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

কাপছে। ডেলফি যে রুমে মারা গেছে সেদিকে এগোল। ওর ঠিক পিছনেই ফিল।

ভেরা দুঃহাত দিয়ে গাল ঘষল। কিছু একটা গড়বড় আছে, ভাবল। ও কি ভুল কিছু বলেছে? প্ল্যান মত কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু ডাঙ্কারের সাটিফিকেটে তো লেখা হাট অ্যাটাক। নাহ, চিন্তা কিছু নেই। ও রুমের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কনস্টেবল দু'জনের নজর ওর দিকে।

তারপর কার্ল গেইমরুম থেকে বেরিয়ে এল। ওর চেহারা ফ্যাকাসে।

'তুমি দাবার গুটিগুলো ধরেছ! বোকা! গাধা! সবকিছু বরবাদ করে দিয়েছে!'

'চুপ করো!' ভেরা চিংকার করে বলল।

ফিল ভেরার দিকে ঘুরে তাকাল। 'সব শেষ। এমনকী কার্লও বলেছে ওটা ডেলফির শেষ চাল ছিল না! আমরা আপনার স্বামীর অটোপিসি করেছিলাম। ওনার পাকস্থলীতে বিষের অস্তিত্ব পেয়েছি। সবৰত দাবা খেলার সময়ই উনি মারা যান। টেবিলের ওপর ওনার শরীর পড়ে যায়। কার্ল যখন ওনার মৃতদেহটা লিভিংরুমে নিয়ে আসে, আপনি তখন দাবার গুটিগুলো ঠিক মত ছাকে রাখছিলেন। যাতে সবাই বুঝতে পারে উনি, নিজের চাল দিয়ে ফেলেছেন।'

ভেরাকে হতভম্ব দেখাচ্ছে। 'কিন্তু এতে কী প্রমাণ হয়? ডাঙ্কার তো এ সম্পর্কে কিছু বলেনি।'

ফিল হাসল। 'ওই ডাঙ্কার দাবা খেলে না, কিন্তু আমি খেলি। ছকের ওপর গুটিগুলো দেখেই আমি বুবাতে পারি আপনি যিখ্যা কথা বলেছেন। বলেছেন ওটা ডেলফির শেষ চাল ছিল। আমি আপনার স্বামীর লাশ অটোপিসি করার কথা বলি। কিন্তু আপনাদের একজনের কাছ থেকে স্বীকারোত্তি আদায় করা দরকার ছিল। ভাবলাম, কার্লকে দাবার ছকটা দেখালে নিশ্চয়ই বড় ধরনের ধাক্কা থাবে। আর তাতে ওর মুখ দিয়ে সত্যটা বেরিয়ে আসবে। কার্ল আমাদের সম্প্রৱণ হবার মত অনেক কিছুই বলেছে। ও-ও বোকা হয়ে গেছে দুটো কালো বিশপকে সাদার ঘরে দেখে।'

কাজী সারওয়ার হোসেন



মেষ

২১ মার্চ-২০ এপ্রিল

সুতা, কাপড় কিংবা তৈরি
পেশাকের ব্যবসায়ে হাত দিলে
সুফল পেতে পারেন।

বৈদেশিক যোগাযোগ শুভ। এ
মাসে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা
আছে। বেকারদের কেউ কেউ
নতুন কাজের স্থান পাবেন।
পাওলা আদায়ের জন্য মাসের
শুরু থেকেই উদ্যোগ নিন।

ভেঙে যাওয়া প্রেমের সম্পর্ক
জোড়া লাগতে পারে। সম্ভাব্য
ক্ষেত্রে বিয়ের কথা বার্তা
পাকাপাকি হতে পারে; মাসের
মাঝামাঝি সময়ে বিদেশ যাত্রার
সুযোগ আসতে পারে।
আনন্দভ্রমণের জন্য মাসটি
শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ১,
৭, ১৫, ১৮, ২৪, ৩০।



ব্য

২১ এপ্রিল-২১ মে

যে কোনও নতুন ব্যবসায়ে হাত
দেওয়ার জন্য মাসটি শুভ।

পাওলা আদায়ের জন্য মাসের
দ্বিতীয় সপ্তাহে উদ্যোগ নিন।
প্রেমের ক্ষেত্রে আগের ব্যর্ধাতা
ঘূচে গিয়ে সম্ভাবনার নতুন সূর্য
উক্তি দিতে পারে। বেকারদের
কেউ কেউ এ মাসে প্রত্যাশার
চেয়েও ভাল চাকরি পাবেন।
সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি
পাবেন। মাঝলা-মোকদ্দমার
বায় আপনার অনুচ্ছুলে যেতে
পারে। আপনি একজন
সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে এ
মাসে একাধিক অনুষ্ঠানের প্রস্তাৱ
পেতে পারেন। বিশেষ শুভ

তারিখ: ৫, ৮, ১৫, ১৯, ২৩,
২৭।



মিথুন

২২ মে-২১ জুন

বেকারদের কারও কারও জন্য
মাসটি সাফল্যের বার্তা বয়ে
আনতে পারে। প্রেমের বিষয়েতে
অভিনবকারের সম্মতি পাবেন।
যারা চাকরিয়ে পরিবর্তন
চাচ্ছেন তাদের জন্য মাসটি
বিশেষ শুভ। কলকাতা,
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কিংবা ধাতব
পদার্থের ব্যবসায়ে হাত
দেওয়ার জন্য মাসটি শুভ।
সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি
পাবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কারও
কারও কারও আটকে থাকা
পদোন্নতির বিষয়টি মাসের
শেষ সপ্তাহে নিষ্পত্তি হতে
পারে। শিল্পকলা কিংবা
সাহিত্যকর্মের জন্য সম্মাননা
পেতে পারেন। প্রেম ও রোমান্স
শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫,
৮, ১৩, ১৮, ২৩, ৩০।



কক্ষটি

২২ জুন-২২ জুনাই

বেকারদের কেউ কেউ মাসের
দ্বিতীয় সপ্তাহে ভাল কাজের
স্থান পাবেন। পাওলা
আদায়ের জন্য মাসের শুরু
থেকেই উদ্যোগ নিন। ছাত্র-
ছাত্রীদের কারও কারও বিদেশে
অধ্যয়নের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হতে
পারে। এমন কারও সঙ্গে
প্রেমের সূচনা হতে পারে যার
সামাজিক অবস্থান আপনার
চেয়ে উচুতে। যে কোনও
জলজ প্রণালী কিংবা তরল
পদার্থের ব্যবসায়ে হাত দিলে
সুফল পেতে পারেন। বুকিপৰ্ণ

পেশায় নিয়োজিতদের কেউ
কেউ পুরস্কৃত হতে পারেন।
দূরের যাত্রা শুভ। বিশেষ শুভ
তারিখ: ২, ৮, ১৩, ১৯, ২৫,
২৯।



সিংহ

২৩ জুনাই-২৩ আগস্ট

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম,
ইলেক্ট্রনিক দ্ব্যান্ডি কিংবা
ধাতব পদার্থের ব্যবসায়ে হাত
দিলে সুফল পেতে পারেন। এ
মাসে সার্বিকভাবে আপনার
আয় বৃদ্ধি পেতে পারে।
পারিবারিক ঘন্টের অবসান
হবে। বেকারদের কেউ কেউ
মাসের শেষ সপ্তাহে চাকরি
পেতে পারেন। তীব্র ভ্রমণের
জন্য মাসটি শুভ। চাকরিতে
কারও কারও আটকে থাকা
পদোন্নতির বিষয়টি মাসের
শেষ সপ্তাহে নিষ্পত্তি হতে
পারে। শিল্পকলা কিংবা
সাহিত্যকর্মের জন্য সম্মাননা
পেতে পারেন। প্রেম ও রোমান্স
শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ১,
৭, ১৬, ২০, ২৫, ৩১।



কন্যা

২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর

এ মাসে কর্মসূলে একাধিক
সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে
সক্ষম হবেন। পারিবারিক
ঘন্টের অবসান হবে। ব্যবসায়ে
নতুন বিনিয়োগ আশার সম্ভাবনা
করতে পারে। প্রেমিক-
প্রেমিকার জন্য মাসটি বিশেষ
শুভ। পাওলা আদায়ের জন্য
মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে উদ্যোগ
নিন। আপনি একজন
সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে
এক্ষেত্রে সম্মাননা পেতে

পারেন। তীর্থ ভ্রমণের জন্য মাসটি শুভ। বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। যাবতীয়ে কেলকাটা শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫, ৯, ১৪, ১৯, ২৩, ২৭।



তুলা

২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর

মাসের শুরুতেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করবে। এ মাসে কর্মসূলে একাধিক সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন। পাওলা আদায়ের জন্য মাসের দ্বিতীয় সঙ্গাহ থেকে উদ্যোগ নিন। বেকারদের কারও কারও বিদেশ যাত্রার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃক্ষি পেতে পারে। পরিবারিক সমস্যার সমাধানে আপনার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে থাকলে আবারও চেষ্টা করুন— কারণ এ মাসে ভাগ্য সুগন্ধি থাকতে পারে। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ৮, ১৪, ১৮, ২৪, ৩০।



বৃষ্টিক

২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর

মাসের শুরুতেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করবে। বেকারদের কেউ কেউ মাসের যাবামাখি সময়ে তাঙ্গ অব্যবহৃত বিদেশ যাত্রার সুযোগ পেতে পারেন। পরিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। এ মাসে অতিথি আপ্যায়নে ব্যয় বৃক্ষি পেতে পারে। পেশাগত দ্বন্দ্বের অবসান হবে। শিক্ষা ক্ষিংবা পর্বেশণার জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে থাকলে আবারও চেষ্টা করুন—এ মাসের যে কোনও

সময় নতুন সম্পর্কে অড়িয়ে পড়তে পারেন। দূরের যাত্রা শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫, ১০, ১৫, ১৮, ২৩, ৩০।



ধনু

২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর

ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুরুষের নেওয়ার সুযোগ পাবেন। এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃক্ষি পেতে পারে। প্রেমের ব্যাপারে মাসের যাবামাখি সময়ে কোনও নতুন ঘটনা ঘটতে পারে। চাকরিতে কারও কারও মাসের শেষ সঙ্গাহে পদাধুরুর সঙ্ঘাবনা আছে। পাওলা টাকা আদায়ের জন্য মাসের দ্বিতীয় সঙ্গাহে উদ্যোগ নিন। এ মাসে যায়লা-মোকদ্দমার রায় আপনার অনুকূল যেতে পারে। দূরের যাত্রার সতর্ক থাকুন। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ৯, ১৪, ১৯, ২৩, ৩১।



মকর

২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি

এ মাসে কর্মসূলে একাধিক সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন। পাওলা আদায়ের জন্য মাসের শুরু থেকেই উদ্যোগ নিন। সঠিক্য ক্ষেত্রে বিয়ের আলোচনায় অংগগতি হবে। এ মাসে কোনও আইনি লড়াইয়ের ফলাফল আপনার অনুকূল যেতে পারে। বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে মাসের যাবামাখি সময়ে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। প্রেমবিষয়ক জটিলতার অবসান হতে পারে। এ মাসে আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা কঠিন হতে পারে। রাজনীতিতে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করা সহজ হবে। বিশেষ শুভ তারিখ: ১, ৮, ১৪,

২৩, ২৬, ৩১।



২১ জানু-১৮ ফেব্রুয়ারি

ফটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগের যাধ্যমে লাভবান হতে পারেন। পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রাখার স্বার্থে অন্যের মতামতকে ঝুঁক্তি দিতে হবে। বেকারদের কেউ কেউ মাসের যাবামাখি সময়ে বিদেশ যাত্রার সুযোগ পেতে পারেন। এ মাসে একাধিক প্রেমের প্রত্বাব পেতে পারেন। জিজিভা সংক্রান্ত বিবেচের নিষ্পত্তি হতে পারে। যারা চাকরি পরিবর্তনে আগ্রহী, তাদের কেউ কেউ এ মাসে একাধিক সুবোগ পাবেন। তীর্থ ভ্রমণের জন্য মাসটি শুভ। বাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে থেকে দূরে থাকুন। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫, ৮, ১৩, ১৯, ২২, ২৪।



মীন

১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ

যে কোনও তরল পদার্থ কিংবা জলজ প্রাণীর ব্যবসায়ে হাত দিতে পারেন। চাকরিতে কারও কারও আটকে থাকা পদেন্তির বিষয়টি এ মাসে নিষ্পত্তি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ বিদেশে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন। যৌথ বিনিয়োগ শুভ। প্রেমের ব্যাপারে এ মাসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। দূরে কোথাও অমেরে জন্য মাসটি শুভ। বেকারদের কেউ কেউ মাসের শেষ সঙ্গাহে চাকরি পেতে পারেন। সুজনশীল কর্মকাণ্ডে বিদেশ যাত্রা হতে পারে। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ৭, ১৪, ১৭, ২১, ২৭।

আপনার প্রশ্ন ও সমাধান

আবদুল আলীম

চাটমোহর, পাবনা।

● জন্ম: ১২-১-৭৪।

যবসায়ে কিছুদিন ধরে কেবলই
লোকসান হচ্ছে, প্রতিকার
কী?

●● ডান হাতের তজনীতে ৭-

৮ রতি ওজনের সিলেনোজ

গোমেদ (রূপোয়) পরলে
উপকার পেতে পারেন।

শীর আবদুস সাত্তার

প্রীপুর, মাঞ্জরা।

● জন্ম: ৫-৮-৮৪। ভবিষ্যতে

আমার অর্ধভাগ্য কেমন হতে
পারে?

●● ৩২ বছরের পর থেকে
ভাগ্যের চাকা স্বৰতে পারে।

শ্রাবণী

নন্দীগাম, বগুড়া।

● জন্ম: ১৫-৩-৯০। যাকে

ভালবাসি তার জন্ম তারিখ
২৪-৮-৮৪, এক্ষেত্রে ফলাফল
কী হতে পারে?

●● এই সম্পর্ক বিয়েতে

গড়তে পারে।

মাহুজুজ বেগম

কবির হাট, নোয়াখালী।

● জন্ম: ৮-৮-৮৫।

●● বিয়েতে কিছুটা সমস্যা

আছে। তবে আগামী দু'বছরের
মধ্যে বিয়ের ভাল সুযোগ
আসতে পারে।

শারীরীন সুলতানা

পটিয়া, চট্টগ্রাম।

● জন্ম: ১৮-৯-৮০। শারীরিক
সৃষ্টির জন্য কী পাথর পরা
উচিত?

●● ৭-৮ রতি ওজনের রক্ত

প্রবাল (সোনায়) পরলে
উপকার পেতে পারেন।

শাহক আহমেদ

সিলেনোজি, ঢাকা।

● জন্ম: ১৭-২-৮২। আমার
সারিক উন্নতির জন্য কী পাথর
পরা উচিত?

●● ডান হাতের মধ্যমায়
কমপক্ষে ৬ রতি ওজনের
ইন্সুলোজি (রূপোয়) পরলে
উপকার পেতে পারেন।

শাহজালান ইসলাম

ফুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

● জন্ম: ১৯-৭-৮৯। যাকে
ভালবাসি তার জন্ম তারিখ ৯-
১-৮৬। এ এক্ষেত্রে ফলাফল কী
হতে পারে?

● এই সম্পর্ক সাফল্যে মুখ
না-ও দেখতে পারে।

ইলিয়াস

লোহাগড়া, চট্টগ্রাম।

● জন্ম: ২৭-২-৮৪। আমার
জন্য কী যবসা উপযোগী হতে
পারে?

●● খাদ্যদ্রব্য, তৈরি পোশাক
কিংবা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের
যবসায়ে হাত দিলে সুফল
পেতে পারেন।

ছবি

হেমনা, কমিশ্নো।

● জন্ম: ২৬-১১-৮০।

●● স্বামীর সঙ্গে স্থায়ী
বনিবনার সম্ভাবনা নেই। বললেই
চলে; এ ছাড়া আপনার দ্বিতীয়
বিয়ের বিষয়টিকেও একদম
উত্তিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

শাহনা ফেরদৌস

গীর রোড, ঢাকা।

● জন্ম: ১-১০-৯৩। আমি কি
সঙ্গীতে সুনাম অর্জন করতে
পারব?

●● এখন থেকে দু'বছরের
মধ্যে সাধারণা আছে।

শুশ্রাবিক

মজমপুর, কুটিয়া।

● জন্ম: ২৭-১২-৯৩। আমার

কারও সঙ্গেই বক্তৃত হামী হয়
না, এর কারণ কী? প্রতিকারই
বা কী?

●● আপনি অভিষ্ঠ রংগচটা
ব্রহ্মবের, অন্যের সঙ্গে সহজে
মানিয়ে চলতে পারেন না। ৬-
৭ রতি ওজনের রক্ত প্রবাল
ডান হাতের কনিষ্ঠায় (রূপোয়)
পরলে উপকার পেতে
পারেন।

অনন্তা

কাঁচবুলি, ময়মনসিংহ।

● জন্ম: ১৬-৮-৯০। ভবিষ্যতে
আমার অর্ধভাগ্য কেমন হতে
পারে?

●● ২৮ বছরের পর থেকে
সচলনতার সূচনা হতে পারে।

আবিক আমান

আগাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

● জন্ম: ৪-২-৯০। ভবিষ্যতে
আমি কি উচ্চশিক্ষার জন্য
বিদেশ যাবার সুযোগ পাব?

●● চেষ্টা চালিয়ে গেলে
আগামী বছরের শ্বেষাংশে
এক্ষেত্রে সুযোগ আসতে
পারে।

নুসরাত ইসলামিন (তিশা)

মহাখালী, ঢাকা।

● জন্ম: ১১-২-৯২। ভবিষ্যতে
লেখালেখি করে প্রতিষ্ঠা পেতে
চাই...

●● আপনি কল্পনাপ্রবণ, তাই
চর্চা চালিয়ে গেলে এক্ষেত্রে
প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব হতে
পারে।

আয়েশা আক্তার

পাংশা, বাজবাড়ি।

● জন্ম: ৮-১১-৯৫। আগামী
বছর এইচএসসি দেব;
পরীক্ষার ফলাফল কেমন হতে
পারে?

●● এ+ পাওয়ার জোর
সম্ভাবনা আছে।■

এ বিভাগে চিঠির উন্নত পেতে হলে ইংরেজিতে সঠিক জন্ম তারিখ,
পুরো চিকানা ও এক কপি ছবি সহ লিখতে হবে।

ନିୟତିର ଟାନେ

ରକ୍ତ ସିଦ୍ଧିକ

ବାଜେର

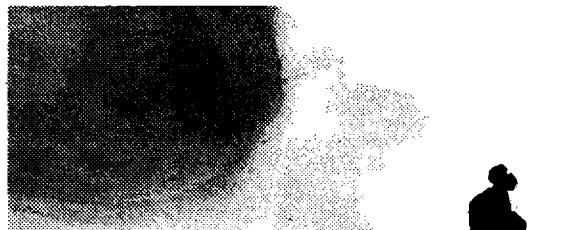
ଶଦେ

ଶିବାନୀ

ସୋଫା

ଥେକେ

ଉଠେ



ଜିସାନକେ

ପିଛନ

ଥେକେ

ଜଡ଼ିଯେ

ଧରନ ।



ତଠାଁ କରେ ହାତ ଥେକେ ଦଢ଼ିଟା ଛୁଟେ ଗେଲ ଫାଲାନୀର । ଛାଡ଼ା ପେଯେଇ ଯେଣ ଛାଗଲଟା ମନେର ଆନନ୍ଦେ ଲାଫାତେ-ଲାଫତେ ଦିଶୁଣ ପଥ ଅତିତ୍ରମ କରତେ ଲାଗଲ । ଛାଗଲଟାର ସାଥେ କିଛୁତେଇ ପେରେ ଉଠେଇ ଫାଲାନୀ । କୀ କରେ ପାରବି ! ଜୀଣ-ଶୀର୍ଷ ଶରୀରେ ଅପୁଷ୍ଟିର ଚିହ୍ନ ଯେନ ଚିଂକାର କରେ ବଲଛେ-କିଛୁତେଇ ତୁହି ପାରବି ନା, ଫାଲାନୀ । ଓହ ଛାଗଲଟାର ସାଥେ ଦୌଡ଼େ ପାରବି ନା । ଛାଗଲଟାର ସାଥେ ଦୌଡ଼େ ହାର ମେନେ ରାତର ପାଶେ ଧପାସ କରେ ବସେ ପଡ଼ିଲ ଫାଲାନୀ । ମେଖାନେ ବସେଇ ମେ ଦେଖତେ ପେଲ ଛାଗଲଟା ରାତ୍ରା ଥେକେ ପାଶେର ଜଙ୍ଗଲେ ନେମେ ଗେଲ । ଫାଲାନୀର ବୁକଟା ଧଡ଼ାସ କରେ ଉଠିଲ । ତାର ତାର ହାତ-ପାଠା ହେଁ ଯେତେ ଲାଗଲ । ଆଜ ଯଦି ମେ ଏହି ଛାଗଲଟା ନା ନିଯେ ଫେରେ ତା ହଲେ ତାର ମା ତାକେ ଆଶ୍ରମ ରାଖବେ ନା । ତାକେ ମେରେ ବର୍ଜକ୍ତ ତୋ, କରବେଇ, ଏମନକୀ ତିନଦିନ ନା ଖାଇୟେ ରାଖବେ । ଏମନ ନାଜିର ଅନେକ ଆହେ । ଫାଲାନୀର ମା ଖୁବଇ ବଦମେଜାଜୀ । ଅଭାବେର ସଂସାର । ସାତ ଭାଇ-ବୋନ ତାରା । ତେବେ ବହୁରେର ଫାଲାନୀ ସବାର ବଡ଼ । ଫାଲାନୀର ବାବା ଗେଲ ବହୁର ସାପେର କାମଡେ ମାରା ଗେଛେ, ତାଦେର ସବାଇକେ ଅଭାବେର ଦରିଆୟ ଭାସିଯେ ଦିଯେ । ଫାଲାନୀର ମା ପ୍ରାଗାତ୍ମ ପରିଶ୍ରମ କରେ କମଳଗଞ୍ଜରେ ଏକଟା ଚା-ବାଗାନେ । ସାରାଦିନ ବାଗାନେ କାଜ କରେ ଆର ରାତେ ଚା-ବାଗାନେର ମ୍ୟାନେଜାରେର ବାଂଲୋଯ ରାତେର ରାନ୍ନା କରେ ଦେଇ । ମ୍ୟାନେଜାରେର ବୁଟଟା ବୁବ ଭାଲ । ଦରିଆ ଦିଲ । ପ୍ରତିଦିନ ରାତେ ରାନ୍ନା କରେ ଫେରାର ସମୟ ଫାଲାନୀର ମାକେ ତିନଜନେ ପେଟ ପ୍ରରେ ଥେତେ ପାରବେ ଏମନ ଆଦାଜ ବାବାର ଦିଯେ ଦେଇ । ମେହିଁ ଖାବାର ନିଯେ ରାତ ଦଶଟାର ଦିକେ ବାଡ଼ି ଫେରେ ଫାଲାନୀର ମା । ପ୍ରାୟ ସମୟ ବାଡ଼ି ଫିରେ ଦେଖେ ତାର ଛୋଟ-ଛୋଟ ଛେଲେ-ମେଯେତୁଳୋ ନା ଥେଯେଇ ସୁମିଯେ ପଡ଼େଛେ । ଶୁଦ୍ଧ ଫାଲାନୀ ବସେ-ବସେ ବିମାଯ । ଘର ତୁଳେଇ ମୁଖ

ঝামটা দিয়ে ফালানীকে বলে, ‘সবে আছিস কেন বে? ওদেরকে ডেকে সবাই মিলে থা। খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর। তোর বাপ তো মরে বেঁচেছে। আমাকে রেখে গেছে দোষখের আঙ্গনে!’ আটটা মুখের আহার জোগাড় করা আর আঙ্গনে পোড়া একই কথা। ফালানীর বাপটা মরে যাবার পর থেকে তার মায়ের মুখের ভাষা বদলে গেছে। ভালু কথা তার মুখ দিয়ে বের হয়-ই না। যতক্ষণ ঘরে থাকে শুধু খিংতি করে। বেশিরভাগই ফালানীকে উদ্দেশ্য করে। যেন সব দোষ ফালানী। সব কথা সে চুপচাপ হজম করে। কোনদিন যদি মুখ ফক্ষে কিছু বলে ফেলে তা হলে পিঠে পড়ে চেলাকাঠের বাড়ি। তার মা এটটা পাষাণ ছিল না। সাপের কামড়ে তার বাপ মরে যাওয়ার পর থেকে মায়ের মায়া-দয়া কমে গেছে। আর থাকবেই বা কোথেকে! দিন-রাত ভূতের মত খাটনি করে কার মুখ থেকেই বা রসের কথা বেরোয়? দুঃবছর আগের কথা, একদিন সন্ধ্যায় ফালানীর বাপ কাজ থেকে ফেরার সময় একটা ছাগলের বাচ্চা কোলে করে নিয়ে আসে। বাচ্চাটা ফালানীর হাতে দিয়ে বলে, ‘এইটা তোকে দিলাম। যত্ন করে পেলে বড় করবি। দুঃসময়ে কাজে দেবে।’ সেই থেকে ছাগলটার দায়-দায়িত্ব ফালানীর একার। সেই ছাগলটাকে আজ হারাতে বসেছে সে। মা বাড়ি ফেরার আগে তাকে ছাগল নিয়ে ফিরতে হবে। যেনিকে ছাগলটা গেছে ফালানী উঠে সেনিকে হাঁটতে শুরু করল। ছাগলটা বনের ভিতর দুকে গেছে। এনিকে দ্রুত দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। সন্ধ্যা হবার আগেই ছাগলটাকে খুঁজে বাড়ি ফিরতে হবে। ফালানী বনের কতখানি গভীরে ঢলে এসেছে টেরই পায়নি। হাঁটি কিছু একটার মধ্যে পা আটকে ধপাস করে পড়ে গেল। পড়েই মাথা ঝুকে গেল। শক্ত কিছুর সাথে। তারপর জ্ঞান হারাল। কতক্ষণ পর জ্ঞান ফিরল ফালানী বলতে পারবে না। চোখ মেলে প্রথমেই যা দেখল-ছেউ একটা ঘৰ, চারদিকে ছনের বেড়া। ঘরের এক পাশে একটা আলগা দরজা। তার মাথার কাছে একটা প্রদীপ তিম-তিম করে জ্বলছে। একটা কাঠের চারপায়া চৌকি, তাতে পরিকল্পন বিছানা পাতা। ফালানী মনে কঢ়ার চেষ্টা করছে সে এখানে কীভাবে এল। খুঁট করে

একটা শব্দ হতেই তার ভাবনায় হেদ পড়ল। ঘরের দরজা দিয়ে একজন জটাধারী ঢুকল। কালো একটা আলখিয়া পরনে। দাঢ়ি, গোফ, ঢুলে সারামুখ একাকার। শুধু চোখ দুটি অন্যরকম। অনেকে উজ্জ্বল। মনে হয় যেন সেখান থেকে আলো বের হচ্ছে। ঘরে ঢুকেই জটাধারী যতটুবু সন্তুষ্ম মোলায়েম গলায় বলল, ‘চোখ মেলেছ, বাছা? তোমার কোন ভয় নেই। নাও, এই ওষুধটুকু খাও। তোমার সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।’

কেন জানি জটাধারীকে দেখে ফালানীর কোন ভয় হলো না। সে বিছানা থেকে উঠে বসল। বলল, ‘আমি এখানে কেমনে আইলাম?’ জবাবে জটাধারী বলল, ‘তুমি আগে ওষুধটুকু খাও, তারপর তোমাকে সব বলছি।’ ফালানী মন্ত্রমুহূরের মত জটাধারীর হাত থেকে ওষুধের পাত্রটা নিল। মাটির একটা পাত্র। তাতে কালচে সবুজ তরল। ফালানী সবুজকু তরল মুখে ঢেলে দিয়ে জটাধারীর আদেশ পালন করল। জটাধারী বলল, ‘এবার তুমি ঘামও, বাছা। কাল সকালে উঠে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।’ ফালানীর চোখের পাতা ধীরে-ধীরে বারী হয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ফালানী যখন ঘুমিয়ে ছিল তখন তার মুখের দিকে একদম্পিতে তাকিয়ে ছিল জটাধারী। আর ভাবছিল, শয়তান এবার তার মুখের পানে তাকিয়েছে। এবার আর কেউ তার অমরত্ব ঠেকাতে পারবে না। এই মেরেটির বয়স বারো কি তেরো হবে। এই মেহেই পাইলবে তাকে অমরত্ব এনে দিতে। অবশ্য তার জন্য তাকে আরও কমপক্ষে ছয় বছর অপেক্ষা করতে হবে। সে যে শয়তানের উপাসনা করে তার আদেশ-অমরত্ব পেতে হলে কুমারী মায়ের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ২১ ঘণ্টার মধ্যে বলি দিতে হবে, মা-কালীর পায়ের নীচে। আর তার রক্ত তাকে জিভ দিয়ে চেটে-চেটে পান করতে হবে। লোভে তার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। এই মেরেটিকে যত্ন করে লালন-পালন করতে হবে, যতদিন না সঠিক সময় আসে। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ফালানীর মনে হলো যেন এখানেই তার বাড়ি-ঘর। পিছনের কথা সে সব ঢুলে গেল। ঘর থেকে বের হয়ে সে সোজা জটাধারীর কাছে

গিয়ে বলল, 'বাবা, আমার খুব খিদা পাইসে।' জটাধারী চোখ মেলে মুক্তি হেসে বলল, 'যাও, ওখানে একটা কুমা আছে। সেখান থেকে পানি তুলে খুব-হাত ধূয়ে আসো। এখানে ফলাহার তৈরি আছে। এখন থেকে ভূমি এইসব বাবার খাবে।'

এভাবে ফালানীর দিন, মাস, বছর কাটছিল। সে তার নামটাও ভুলে গেছে। জটাধারী বাবা তার নাম দিয়েছে শিবানী। ধীরে-ধীরে শিবানী বড় হচ্ছে। আর তার রূপ বয়সের সাথে যেন খুলছে। যেন হাতে গড়া কোন দেবীমূর্তি। জটাধারীর হিসাবমতে কাল শিবানীর আঠারো বছর পূর্ণ হবে। সে কারণে জটাধারী বাবা যজ্ঞের আয়োজন করে। সেদিন তারা দু'জনেই উপোস থাকে। বড় একটা মাটির পাত্রে আঙুল জ্বলে তাতে ধূপ, ধূনো আর ধি ঢেলে ধ্যান করে সারাদিন। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই ধ্যান ভাঙে দু'জনার। তারপর শিবানী গোসল করে ফলাহার করে। জটাধারী বাবা শিবানীর জন্য মাটির এক পাত্রে তরল একটা পানীয় খেতে দেয়। সেটা খাওয়ার পর শিবানীর অন্যরকম অনুভূতি হতে থাকে।

সন্ধ্যা থেকেই ঝাড়ো হাওয়া বইছে। থেকে-থেকে বিজলী চমকাচ্ছে। সেই সাথে গুঁড়ি-গুঁড়ি বষ্টি। স্প্লিড মিটার ৮০তে তুলে বাইক চালাচ্ছে জিসান। যে করেই হোক, তাকে শহরে পৌছতে হবে। খুব জরুরি, তাই তাকে প্রতিংশ্পট থেকে এই দূর্ঘেস্থের রাতে শহরে যেতে হবে। দূর থেকে হেডলাইটের আলোতে সে দেখতে পেল রাস্তার পাশে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ষষ্ঠি ইন্দ্রিয় জিসানকে সতর্ক করে দিল। তারপরেও কেন যেন স্বতাব বিরক্ত কাজটা করল আজ। গতি কমিয়ে বাইকটা থামাল যানুষটার সামনে। হেলমেট খুলে মানুষটার দিকে তাকাল। আরে একি! এ তো একটা সাক্ষাং দেবীমূর্তি! শুধু চোখের পাতা নড়ছে বলে জ্যাত মনে হচ্ছে। জিসানের এই ব্যক্তিশ বছরের জীবনে এত অপরূপ নারী কখনও দেখিন সে। পাঁচ বছর হলো সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করছে মিডিয়াতে। আজ পর্যন্ত এত-এত সুন্দরী নায়িকা দেখেছে! এখন মনে হচ্ছে তারা কেউ এই দেবীর নথের।

রূপও রাখে না। মেয়েটাই প্রথম কথা বলল, 'আমাকে একটু লিফ্ট দেবেন?' কিছুটা বিশ্বাস নিয়ে জিসান প্রশ্ন করল, 'এই দূর্ঘেস্থের রাতে নির্জন রাস্তায় আপনি একা-একা দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

মেয়েটা খানিকটা কানুর সুরে বলল: তাদের কলেজ থেকে একটা দল এসেছিল পিকনিকে এই বনে। বিকেলের দিকে একা হাঁটতে-হাঁটতে সে বনের অনেক ভেতরে চলে যায়। তারপর পথ হারিয়ে ফেলে। পথ খুঁজে আসতে-আসতে তার অনেক সময় লেগে যায়। তাকে খুঁজে না পেয়ে হয়তো তারা সবাই চলে গেছে।

'আমি কিছুক্ষণ যাবৎ এখানে দাঁড়িয়ে আছি। যদি কোন লিফ্ট পাই সে আশায়। আপনি আমাকে শহরে নামিয়ে দিলেই আমি যেতে পারব।'

জিসান আবারও প্রশ্ন করল, 'আপনার সাথে কোন ফোন নেই?'

মেয়েটি বলল, 'আছে। তবে চার্জ ফুরিয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। বাইকের পেছনে বসতে পারবেন?'

'পারব,' বলল মেয়েটি। 'ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ধন্যবাদ পরে দেবেন। আগে তো আপনাকে শোছে দিই। আপনার নামটা জানা হলো না। আমি জিসান। জিসান প্রধান।'

মেয়েটা বাইকের পেছনে উঠে বসতে-বসতে বলল, 'আমার নাম শিবানী।'

জিসান ভাবল, শিবানী! হিন্দু না মুসলিম? যাই হোক, তাতে আমার কী আসে যায়! তাকে শহরে নামিয়ে দেয়ার পর আমার কাজ শেষ।

শহরে পৌছতে বেশ রাত হয়ে গেল।

বাড়ি-বৃষ্টির রাত বলে কোথাও ইলেক্ট্রিসিটি নেই। দু'জনেই বাইক থেকে নেমে দাঁড়াল। জিসান জানতে চাইল, 'এখন আপনি কোথায় যাবেন, শিবানী?'

শিবানী একটু দৃঢ়বী গলায় বলল, 'এত রাতে আমি কী করে বাড়ি যাব? এখন থেকে আমার বাড়ি দু'ঘণ্টার পথ। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তা হলে আজ রাতটা আপনার বাড়িতে থেকে যাই। কাল সকালেই চলে যাব।'

জিসান অবাক হয়ে শিবানীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছে—একটা মেঝে অচেনা একটা ছেলের সাথে... তার তত্ত্ব করছে না!

মুখে বলল, ‘এখানে আমার বাড়ি নেই। আমি ঢাকায় থাকি। শুটিঙ্গের জন্য এখানে এসেছি। সামনের হোটেলটায় উঠব। আমার কোনো সমস্যা নেই। যদি আপনার সমস্যা না থাকে তবে একটা কথা, হোটেলে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে রূম বুক করতে হবে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে।’

শিবানী বলল, ‘আমার কোন আপত্তি নেই। আজকের রাতটা আমার যেমন করে হোক কাটাতে হবে।’

‘ঠিক আছে, চলুন।’

হোটেলে চুকে রিসেপশনিস্টের সাথে কথা বলে টপ ফ্লোরের একটা রুমের চাবি নিয়ে ম্যানেজারকে প্রশ্ন করল জিসান, ‘আজ আর মনে হয় ইলেক্ট্রিসিটি আসবে না। আপনাদের জেনারেটরের ব্যবস্থা নেই?’

জবাবে ম্যানেজার বলল, ‘আছে, স্যর। সক্ষ্য থেকে ইলেক্ট্রিসিটি না থাকায় জেনারেটর চলছিল। একটু আগে সেটারও তেল ফুরিয়ে গেছে। সবি, স্যর, আজ রাতটা ঘোমবাতি দিয়েই চালিয়ে নিতে হবে। আমি রুমবয়কে দিয়ে ঘোমবাতি আর পানি পাঠিয়ে দিছি। আর কিছু লাগবে, স্যর?’

‘না, আপাতত না।’ বলেই জিসান সিড়ি ডেঙ্গে উপরে উঠতে লাগল। শিবানী জিসানকে অনুসরণ করল। প্রতি তলাতেই ঘোমবাতি জ্বালানো রয়েছে। টপফ্লোরে উঠে তালা খুলে রুমে চুকল জিসান। পিছনে শিবানী। রুমটা অঙ্ককার। চোখে একটু অঙ্ককার সয়ে আসতেই রুমবয় পানির বেতল আর তিনটা ঘোমবাতি নিয়ে এল। রুমবয় জিসানকে প্রশ্ন করল, ‘স্যর, রুম পরিষ্কার করে দেব?’

‘দরকার নেই। আমরাই করে নেব। তুমি যাও। কিছু লাগলে জানাব।’

রুমবয় চলে যেতেই জিসান দরজা বন্ধ করে দিল। রুমের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল—একটা ভাবল বেড, সিলেন্স দুটি সোফা, একটা সেটার টেবিল, একটা কাবাড় ও একটা বড় বেলজিয়ামের আয়না দেয়ালে বসানো। বিছানাটা মোটামুটি পরিষ্কারই আছে। জিসান

সটান বিছানায় শয়ে পড়ল। শয়ে সিলিঙ্গের দিকে তাকিয়ে ভাবছে—রাতটা কেমন যাবে? অসাধারণ এক রূপসী তার সাথে, কী করে তার শুম হবে?

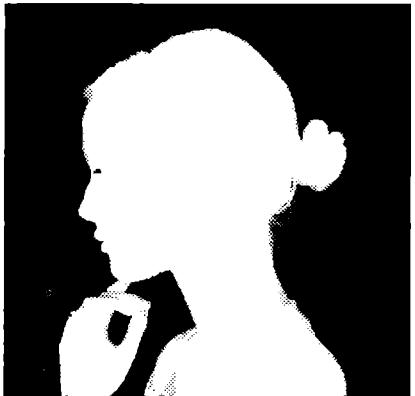
শিবানীর কথায় ফিরে তাকাল, মেয়েটি বলছিল, ‘আপনি ঘুমান, আমি সোফায় বসে রাতটা পার করে দেব।’

জিসান শোয়া থেকে উঠে বসল। বলল, ‘সবি, আপনাকে কিছু না বলে আমি শয়ে পড়লাম। আসলে সারাদিন অনেক খামেলা গেছে কিনা, তাই খুব ক্লান্ত ছিলাম। আপনি বিছানায় শয়ে পড়ুন, আমি সোফায় ঘুমাই। যেখানে—সেখানে শয়ে ঘুমানোর অভ্যাস আছে আমার।’ এই বলে জিসান জানালার পাশে এসে বসল। পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে বেশ অঙ্ককার। কোথাও তেমন কোনো আলো নেই। এখনও ঘাড়ে হাওয়া বইছে। মাঝে-মাঝে বিজলী চমকাচ্ছে। পুঁতি-পুঁতি বৃষ্টি ভারী বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বৃষ্টির পানি বাতাসের সাথে জানালা দিয়ে এসে জিসানকে ডিজিয়ে দিচ্ছে। বৃষ্টি খুব একটা পছন্দ করে না জিসান। তবে আজ কেন যেন খুব ভাল লাগছে। হঠাতে করে বিকট শব্দে আশগাপে কোথাও বাজ পড়ল। বাজের শব্দে শিবানী সোফা থেকে উঠে জিসানকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরে খরখর করে কাপছে। কিংকর্তব্যবিহৃত জিসান! কতক্ষণ এভাবে কেটেছে দু'জনের কেউ বলতে পারবে না। এক সময় জিসান অন্তর্ভুক্ত করল শিখিল হয়ে আসছে শিবানীর জড়িয়ে ধরা হাত। প্রোপুরি ছেড়ে দিতেই শুরে দাঁড়াল জিসান। বাতাসে রুমের জ্বালানো ঘোমবাতি কখন নিতে গেছে কেউ টের পায়নি। হঠাতে বিদ্যুৎ চমকানো আলোতে এক ঝলক দেখল শিবানীকে জিসান। তার টানা-টানা কাজল কালো চোখ দৃঢ়িতে দু'ফোটা পানি জমে আছে। আর পাতলা গোলাপি ঠোট দুটো তিরতির করে কাপছে। পরনে গাঢ় সবুজ শাড়ি। সবুজ ঝঙ্গের টিপ কপালে। যথেষ্ট! জিসানের মনের শিতর তোলপাড় চলছে। ডয়ঙ্কর সুন্দর এক রাত। অপূর্ব সুন্দরী তার সামনে। প্রকৃতির এই অম্বল্য উপহার, কেমন করে মুখ কিনিয়ে নেবে বর্তমান থেকে। কোন রকম কথা-বাত্তাৰ ভিতর দিয়ে গেল না তারা। ঘোমবাতি জ্বালানোর প্রয়োজন

মনে করল না। জানালা বক্স করার দরকারও মনে করল না। নিয়তির টানে একে অপরের কাছে আসাকেও অঙ্গীকার করল না। মুক্তির সীমা ছাড়িয়ে গভীর থেকে আরও গভীরে তলিয়ে যেতে লাগল। তারপর কখন যে ঝুঁটিয়ে পড়েছে বলতে পারবে না তারা। অভ্যাস অন্যায়ী সকাল সাতটায় ঘূম ভঙ্গল জিসানের। বিছানা ছেড়ে বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে এসে বিছানায় চোখ গেল। ধৰ্মধরে সাদা বিছানার ওপর কিছু একটা চকচক করছে। কী ওটা? উপড় হয়ে হাতে নিল। একটা নৃশুর। সোনার কিলা কে জানে? নৃপুরটা হাতে নিতেই গতরাতের সব কথা এক-এক করে জিসানের মনে পড়তে লাগল। আরে, তাই তো! শিবানী মেয়েটা গেল কই! কুম সংলগ্ন বারান্দায় উকি দিল। সেখানেও নেই। কোথায় গেল মেয়েটি? যাওয়ার আগে একটু বলেও গেল না। কেন এসেছিল! কী তার উদ্দেশ্য ছিল! কিছুই বুঝতে পারছে মা জিসান। শুধু স্বপ্নময় রাতের আবেশ এখনও তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এত ভাববার সময় নেই। ফার্স্ট আওয়ারে ব্যাংকে যেতে হবে। তারপর আবার ছুটতে হবে শুটিং স্পটে।

সে ঘটনার ঠিক নয় মাস পর সকালে ঘূম থেকে ওঠার পর জিসানের খুব অস্তি লাগতে লাগল। মনের ভিতর কোথায় যেন খচচ করছে। কোন কিছু ভাল লাগছে না। কিছু একটা তাকে টানছে। কী, কোথায়, কেন কিছুই জানে না জিসান। শুধু এতকুঠ জানে, আজ আর কোন কাজে মন বসবে না। বাইকের পেট পুরে তেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। সিলেটের উদ্দেশ্য। সর্বোচ্চ স্প্রিড ভুলে দুপুর তিনটা নাগাদ সিলেটের কমলগঞ্জে পৌছল। কীসের টানে সে এখানে এসেছে জানে না। বাইকটা ঠিক সেই জায়গুর থামাল, যেখান থেকে শিবানীকে বাইকে তুলেছিল। রাত্তাৰ পাশেই বন। বনের দিকে তাকিয়ে তার ভিতরটায় কেমন যেন একটা কষ্ট হচ্ছে। বনটা যেন তাকে টানছে। বাইকটা নামিয়ে বনের ভেতর একটা গাছের আড়লে রাখল। লক করল। তারপর হাঁটা দিল বনের ভিতরে। হাঁটছে তো হাঁটছেই। পথ যেন আর ফুরায় না। হঠাৎ করে একটা নবজাতক শিশুর কান্নার আওয়াজ তার কানে ভেসে এল।

জিসান চমকে উঠল। এত গভীর বনের ভিতর থেকে শিশুর কান্নার আওয়াজ কোথা থেকে আসবে! কান্নার উৎস ধরে হাঁটতে শুরু করল সে। হাঁট করেই যেন তোজবাজির মত বনের ভিতর একটা ঘর ঢোকে পড়ল। একরকম নিঃশব্দে জিসান ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে যা দেখল তাতে তার মনে হলো বুকের ভিতরটা যেন খালি হয়ে যাচ্ছে। ধৰ্মধরে সাদা বিছানায় শিবানীর নিথর দেহটা পড়ে আছে। তখনও তার মুখের অভিব্যক্তিতে কষ্টের ছাপ সুস্পষ্ট। মারা যাওয়ার আগে অনেক কষ্ট পেয়েছে শিবানী। কিন্তু কেন? ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে নজর পড়ল শিবানীর পায়ের কাছে। রক্তে মাখাখাখি তার দুটি পা। তারই মাঝে শিবানীর বাম পায়ের নৃপুরটা বিকমিকিয়ে উঠল। অবিকল একটা নৃপুর এখনও জিসানের পকেটে সময়ে রাখ। আর এক মুহূর্ত দাঢ়াল না সে। সাথে-সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগল কোথা থেকে কান্নার শব্দটা আসছে। একটু দূরে একটা জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখল। কান্নার শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। জিসানের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সাবধান করে দিল। এবার আর ভুল করল না সে। সেলফোনটা বের করে পুলিশকে ফোন করল। পুলিশকে সবকিছু বর্ণনা করে অপেক্ষা করতে লাগল। আধ ঘণ্টা পর পুলিশ এসে নবজাতক শিশুটাকে উদ্ধার করল কালীমূর্তির সামনে থেকে, আর ঘেঁঠার করল শয়তানের উপাসক জটাধারী বাবাকে। বাবো-তেরো বছরের শিবানীকে সে নিজের স্বার্থের জন্য যত্ন করে বড় করেছে। এবং তাকে সম্মোহিত করে রেখেছে, যেন শিছনের সব কথা ভুলে যায়। শিবানীর গর্ভের স্তনান বলি দিয়ে কালীমাঙ্কে খুশি করে সে অমরত্ব লাভ করতে চেয়েছিল। পুলিশের পিটুনি থেঁয়ে এসব স্বীকার করে জটাধারী বাবা। তার তো অমরত্ব লাভ হলোই না, বরং মৃত্যু তার খুব কাছেই হয়তো। শিশুটাকে পরম যত্নে বুকে ভুলে নিল জিসান। তার বুকের ভিতরের তোলপাড় থেমে গেল। পকেট থেকে নৃপুরটা বের করে শিশুটির সামনে তলে ধরে বলল, ‘এখন থেকে এই নৃপুরের মালিক তুই বে, আমার সোনাপাখি।’ ■



হায়রে, জীবন!

অনেক ভাল ঘর থেকে বিয়ের
প্রস্তাৱ আসে কিন্তু মোটা অংকেৰ
যৌতুকেৰ কাৱণে বিয়ে হয় না।

ফরিদপুৰ সরকাৰি রাজেন্দ্ৰ কলেজ-এৰ ইতিহাস ২য় বৰ্ষেৰ ছাত্ৰী। অন্য মেয়েদেৰ মত আমিও এক বুক স্পণ্টনীয়ে বড় হই। কিন্তু সবাৰ সব স্পণ্ট কি পূৰণ হয়? হয় না। এৱজন্য ভাল কপাল থাকা চাই। একটা কথা আছে 'যা চাই তা ভুল কৰে চাই আৰ যা পাই তা চাই না।' আমাৰ পাৰিবাৰিক আৰ্থিক অবস্থা বেশি ভাল না। এক পৰ্যায়ে পড়া-লেখা বৰ্ক হয়ে যাওয়াৰ পথে। এমন সময় পাৰিবাৰ থেকে আমাকে বিয়ে দেওয়াৰ জন্য অস্থিৰ হয়ে ওঠে। অনেক ভাল ঘৰ থেকে বিয়েৰ প্ৰস্তাৱ আসে কিন্তু মোটা অংকেৰ যৌতুকেৰ কাৱণে বিয়ে হয় না। পৰে একটা বিয়েৰ প্ৰস্তাৱ আসে, ছেলে বিদেশে থাকে। মোটা অংকেৰ টাকা-পয়সা আছে, বেশি সুনামও আছে। তাৰা এক টাকাও যৌতুক নেৰে না বৱং তাৰা আমাকে সব দিয়ে ভুলে নেৰে। এখনে একটা কথা বলি, ছেলেৰ একটু দোষ আছে, ছেলেটা বিবাহিত, একটা মেয়েও আছে। যাৰ কাৱণে আমাৰ প্ৰতি তাৰা এতটা সহানুভূতিশীল। মা-বাৰা অনেক কষ্ট কৰে বড় কৰেছে আমাদেৱকে, যাৰ কাৱণে তাদেৱ মনে কষ্ট দিতে পাৰিনি। আৱও অনেক কথা ভোবে, জীবনেৰ সব স্পণ্ট বিসৰ্জন দিয়ে তাদেৱ কথা রাখলাম। যাহোক, ২৩-১২-১৩ তাৰিখে আমাৰ শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। আজ ৯ মাস আমাৰ বিয়ে হয়েছে। কিন্তু নতুন পৰিবেশে সব কিছু এলোমেলো মনে হয়। সবাৰ সাথে মিশতে স্বৰ কষ্ট হয়, আবাৰ এদেৱ অনেক বিষয় মেনে নিতে পাৰি না। আমাৰ স্বামী স্বৰ ভাল মাৰুষ। তিনি আমাকে অনেক ভালবাসেন। তাৰ একটা দিক আমাৰ স্বৰ ভাল লাগে, আমাৰ মনেৰ কষ্ট বা যে কোন সমস্যা বলাৰ আগেই বুবাতে পাৱেন। ভাবেই আছি মোটামুটি। আৱও অনেক কথা না-ই বা বললাম। কিন্তু কতটুকু ভাল আছি আমি, আমাৰ এই প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ কেউ দিতে পাৱে না। আমাৰ উত্তৰ শুধু আমি জানি। আজ নিজেকে বড় বেশি অসহায় মনে হয়। হাউ-মাউ কৰে কাঁদলে মনেৰ কষ্ট-দুঃখ দূৰ হবে। কিন্তু পাৰি না। কেন পাৰি না? জানি না আমি। এটাই কি জীবন? তিলে-তিলে নিজেকে শেষ কৰে দেওয়া!

(নাম-ঠিকানা নেই)

জীবন সায়াহে

রংবেল কান্তি নাথ

অপারেশনের

পরে

সারা

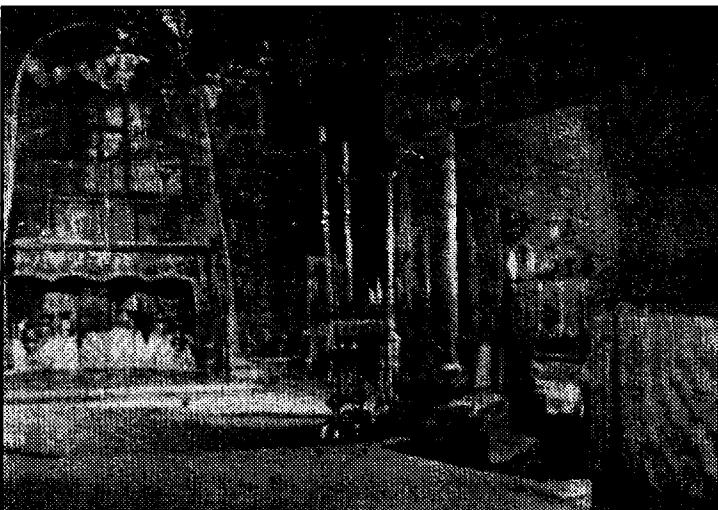
শরীরে

প্যারালাইসিস

হয়ে

গেল

বাখের।



যোহান সেবাস্তিয়ান বাখ ছিলেন লিপজিগের সেন্ট টমাস চার্চ সংলগ্ন সেন্ট টমাস স্কুলের কক্ষার মাস্টার। দীর্ঘকাল সারাদিন পরিশ্রম করার পর বাতি জ্বলে রাতের বেলায় গান আর স্বরলিপি রচনা করার ফলে একটা সময়ে তাঁর চোখের অসুব হয়েছিল। ডাঙ্কারদের বজ্য হিল, চোখে অঙ্গোপচার করতে হবে। সেটা ১৭৪৮ সালে, শীতকাল।

চোখের অসুব হওয়ার পরে, লিপজিগ শহরের অনামী এই কক্ষার মাস্টারটিকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। একজন কক্ষার মাস্টারের অর্গান বাজানোর অধিকার ছিল না। দিনের বেলায় তাঁর সেই সুযোগও ছিল না। আবার রাতের বেলা অর্গান বাজালে অনেকেই ঘুমের অসুবিধা হত। অথচ বাবের জীবনে সুরই ছিল একমাত্র জীবনী শক্তি।

ফলে অকল্পনীয় মানসিক কষ্টে তাঁকে দিন যাপন করতে হচ্ছিল। তবন তাঁর বয়স ৬৫, প্রথমা ঝী ছিলেন না। দ্বিতীয়া ঝী আঘাতে ছিলেন সর্বক্ষণের সঙ্গীনী। অথচ তাঁর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ছিল বিশজ্ঞের মত। অবশ্য তাঁদের বশে দশজন আগেই মারা গেছিল।

তবু বেঁচে ছিল বাকি দশজন। এবং তাঁদের কেউ কেউ হিস প্রতিষ্ঠিত। এরকম এক মানসিক এবং শারীরিক যত্নশার মধ্যে যার চোখে অঙ্গোপচার করতে কাজ হচ্ছে বাধ্য হলেন তিনি।

অঙ্গোপচারের দিন ঠিক হলো। আগের দিন রাতে বাখ সাজ্বাতিক কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন, তাঁকে একটু অর্গান বাজাতে দেওয়া হোক। বাখকে নিয়ে ইতোমধ্যেই চার্চে বেশ অশান্তি

হচ্ছিল। কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন, অর্থ অন্য কোথাও যাওয়ার সংস্থান ছিল না।

অগত্যা চার্টের দয়ায় থাকার জায়গাটুকু অস্ত ছিল। ফলে চার্টের হাতে তোলা হয়ে থাকার জন্য খুব সাবধানে সবার মন জুগিয়েই থাকতে হচ্ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে রাতে অর্গান বাজিয়ে অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালে যে বাসস্থান আছে, তা-ও হয়তো চলে যাবে।

বাখের কাকুতি-মিনতিতে তাই অ্যানা খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তা ছাড়া পরের দিনই অপারেশন। কে জানে, অপারেশনের পরে আবার নতুন কোনও বিপত্তি হয় কি না! হয়তো ক্ষতি হতে পারে। ডাঙ্গররা সেরকমই ভয় দেখিয়ে গেছে।

অনেক ভোবে-চিন্তে অ্যানা শেষমেশ মনস্থির করে ফেললেন। না, তাঁর স্বামী জীবনের সায়াহে কেবল শুধু একটু অর্গান বাজাতে চেয়েছেন মাত্র। আর কিছু নয়। সেটার ব্যবস্থা তাঁকে করতেই হবে।

রাত গভীর হলো। অ্যানা ধীরে-ধীরে বাখকে নিয়ে ফিরে এলেন চার্টের বড় হলঘরে। বিশাল অর্গান সামনে। শিশুর মত বাখ সেটাকে জড়িয়ে ধরলেন। চোখ ফেঁটে জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর তিনি বাজাতে লাগলেন। অল্প সময়, খুব অল্পস্মৃতি মাত্র। তারপর বাজনা শেষ করে অ্যানাকে বললেন, ‘ঠিক আছে, অ্যানা। এবার আমি এন্ট্রেট।’

ততক্ষণে বাজনা শুনে ছুটতে-ছুটতে চলে এসেছেন চার্টের ডিভেল্টের, কিউটেরেটের ইউনিলিক। তিনি ভয়ঙ্কর চিকিৎসা-চেম্পেচি করতে লাগলেন। এর আগেও অর্গান বাজানোর অপরাধে তাঁর কাছে বারবার অপমানিত হয়েছিলেন বাখ।

আজ যেন সেসবই চূড়ান্ত আকার ধারণ করল। বাতের অক্ষকারে লুকিয়ে অ্যানা আজ চোরের মত নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রিয় যোহানকে।

কাল তাঁর চোখের অপারেশন। কে জানে,

ফল কী হয়! তাই যোহানের শিশুর মত শেষ আবদার তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু ইউনিলিকের প্রত্যেকটি কথায় চার্ট থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ধমক মুখ বুজে সহ্য করতে হয় তাঁকে।

তবু তো যোহান একটুক্ষণ হলেও তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছেন! শান্ত হয়েছে তাঁর মন। এবার অপারেশনের জন্য তিনি প্রস্তুত। চোরের মত মুখ নিচু করে নিজের ঘরে ফিরে এলেন অ্যানা, যোহানকে সঙ্গে নিয়ে।

প্রের দিন চোখের অপারেশন হলো। কিন্তু অপারেশনের পরে সারা শরীরে প্যারালাইসিস হয়ে গেল বাখের। দু'বছর অসহ্য শারীরিক যত্নণা সহ্য করে অবশেষে বাখ মারা গেলেন, ২৮ জুলাই, ১৭৫০ সালে। অ্যানা মারা গেলেন, তারও দশ বছর পরে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৭৬০ সালে।

বাখ মারা গেলেন। সংগ্রামের একটা অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো। মৃত্যুর সময়ে তাঁর শেষ কথা ছিল, ‘হে দৈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।’

সেই জন কবরখানায় তাঁকে সমাহিত করা হলো। কয়েক বছর পর, একটা নতুন রাস্তা তৈরি করার প্রয়োজনে সেই কবরখানা গেল ভেঙে। সেই ডামাডোলে বাখের সমাধিটিও সরানো হলো আর সেটা হারিয়েও গেল চিরতরে।

মানুষের মন থেকে দূরে সরে গেলেও তোলেননি তাঁকে দৈশ্বর, যাঁর কাছে তিনি সমর্পণ করেছিলেন নিজেকে। এবং তাঁর সৃষ্টি সংগীতের অম্ল্য পারুলিপিগুলো।

তিনশো বছর পরে ভূগোল-ইতিহাস আর দেশকালের সীমানা পেরিয়ে সারা পৃথিবীতে বাখ যেভাবে গৃহীত হয়েছেন, যেভাবে সমাদৃত হয়েছেন-সত্যি কথা যে, তাঁর এক শতাব্দিও তিনি জীববৃক্ষশায় পাননি।

এখন তাঁকে সর্বসময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত শিল্পীর মর্যাদা দিতে বিধা করবেন এমন মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। ■

କୁଖ୍ୟାତ ୫୫ଟି ସ୍ଟଟନା

ସାଲମାନ ମୋହାମ୍ମଦ

ମେଥାନେ ତୁତେର ମମି ଛିଲ, ତାର ଦରଜାୟ ପାଥରେ
ଓପର ଖୋଲାଇ ଛିଲ: 'ବାଦଶାର ଶାନ୍ତି ଯେ ବିନଷ୍ଟ
କରବେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆସବେ ଦ୍ରୁତ'।

ଏକ

ମିଶରେର ଫେରାଉନ ତୁତେର ମମିକଙ୍କେ

ପ୍ରବେଶକାରୀଦେର ମୃତ୍ୟୁ

ପ୍ରାଚୀନକାଳେର ମିଶରେର ବାଦଶାଦେର ବଳା ହ୍ୟ
ଫାରାଓ ବା ଫେରାଉନ । ଫେରାଉନଦେର ମୃତ୍ୟୁର ପର
ମମି କରେ ରାଖା ହତ ପିରାମିଡ଼େର ଭେତର ।
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁଦେହର ପୁନର୍ଜୀବନ ସଥନ ସ୍ଟଟବେ,
ତଥନ ତାଦେର ଯାତେ କୋନେଓ ଅସୁବିଧାୟ ପଡ଼ିତେ
ନା ହ୍ୟ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା । କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକକାଳେ
ମାନସ ଏକଟାର ପର ଏକଟା ପିରାମିଡ଼େ ଢୁକେ
ମମିସହ ଅଲଙ୍କାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରୁଷ୍ୟସାମ୍ରମ୍ଭୀ
ନିଯେ ଯାଏ ।

୧୯୨୨ ସାଲ । ଇଞ୍ଜାନେର ଏକ ରାଜ୍ୟପୁତ୍ର
ଲର୍ଡ କାରନାରଭନ ଫେରାଉନ ତୁତେର ମମିକଙ୍କ
ଦେଖିତେ ଯାନ । ...ପିରାମିଡ଼ଟିର ଦରଜା ଭେତେ
ଫେଲାର ପର ଭେତରେ ମେଥାନେ ତୁତେର ମମି ଛିଲ,
ତାର ଦରଜାୟ ପାଥରେର ଓପର ଖୋଲାଇ ଛିଲ:
'ବାଦଶାର ଶାନ୍ତି ଯେ ବିନଷ୍ଟ କରବେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ
ଆସବେ ଦ୍ରୁତ' ।

ଏରପର କୀ ଥେକେ କୀ ହଲୋ!

କଥେକ ହୃଦାର ମଧ୍ୟେ ଲର୍ଡ କାରନାରଭନ
'ରହସ୍ୟମ ପତଙ୍ଗ ଦଂଶନେ' ମାରା ଯାନ ।

୧୯୨୯ ସାଲେର ମଧ୍ୟେ ଫେରାଉନ ତୁତେର
ସମାଧି ଭାଙ୍ଗର ସଦେ ଜଡ଼ିତଦେର ୧୧ଜନ ମାରା
ପଡ଼େ । ଲେଣ୍ଡି ଏଲିଜାବେଥ କାରନାରଭନ ଛିଲେନ
ଫେରାଉନେର ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗକାରୀଦେର (ଶାନ୍ତିକେ
ଅବମୂଳ୍ୟନକାରୀଦେର) ଅନ୍ୟତମ । ତାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ହ୍ୟ ଅଞ୍ଜାତ ପତଙ୍ଗ ଦଂଶନେ । ସମାଧିତେ
ପ୍ରବେଶକାରୀ ୨୧ଜନ ସବାଇ ୧୯୩୫ ସାଲ ନାଗାଦ
(ମାନେ, ୧୩ ବହର ସମୟେର ମଧ୍ୟେ) କୋନେଓ-ନା-
କୋନେଓ ଅପରାତମ ମାରା ଯାଏ ।

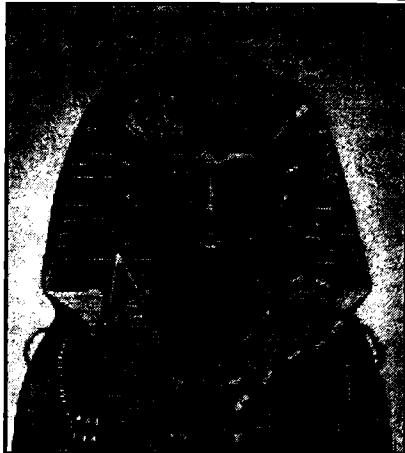
କୀ ମାରାତକ ରହସ୍ୟ!

କୀ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହସ୍ୟ!

ଦୁଇ

କେନେଡ଼ି ପରିବାରେ ମୃତ୍ୟୁ

ମାର୍କିନ୍ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରେ ଅତି ବିଖ୍ୟାତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଲୀ



ଏକଟି ପରିବାର-କେନେଡ଼ି ପରିବାର । ଉନବିଂଶ
ଶତାବ୍ଦୀର ଆୟାରଲ୍ୟାଓ ଅବସ୍ଥାଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ବିଶଳ
ଫାର୍ମିଂ ହାଉସ, ଫାର୍ମିଂ ଏରିଆର ମାଲିକ ଛିଲେନ
କେନେଡ଼ିରା । ୧୮୪୬ ସାଲ । ଯାଦୁଭିକ୍ଷେର ସମୟେ
ଏକ ମା ଅନାହାରେ ମୃତ୍ୟୋଯ ସନ୍ତାନକେ ବାଚାତେ
କେନେଡ଼ିଗୁହେ ଶସଦାନା ଡିକ୍ଷା ଚାଯ । କିନ୍ତୁ ଓେଇ
ମାକେ ମେରେ ଧରେ ତାଡ଼ିଯେ ଦେଯା ହ୍ୟ, ତଥନ
ଅସହ୍ୟ-କୁଦ୍ରାତ ମହିଳା ଏହି ଅଭିଶାପ ଦେଯେ:
'କେନେଡ଼ି ପରିବାରେ ଦୃଷ୍ଟିଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁକ
ବାରବାର ।'

ଆର ଅଭିଶାପ ଯେନ ପାଶେଇ ଦାଙ୍ଗିଯେ ଛିଲ ।
ଫଳ ହଲୋ ସୁବ ଦ୍ରୁତ । ବର୍ଗିଚାରୀଦେର ଏକ
ବିଦ୍ରୋହେର ଫଳେ, କେନେଡ଼ିରା ମେଥାନ ଥେକେ
ଉତ୍କାତ ହଲେ... ଏରପର, ଏକେର ପର ଏକ
ଦୂର୍ଟିନା ତାଦେର ଓପର ହାନା ଦିତେ ଥାକଲ ।
ତାଦେର ପରିବାରେର ଏକଜନ ପ୍ଯାଟ୍ରିକ ଇଉଏସ୍‌ଏ-
ଟେ ଚଲେ ଆସେନ ସୌଭାଗ୍ୟର ପୌଜେ । କିନ୍ତୁ
ତିନି ମାରା ଯାନ କଲେରାଯ, ତାର ପୁତ୍ର ଜନ
କପର୍ଦିକହିନ ଅବସ୍ଥା ମାରା ଯାଏ ।

ପ୍ଯାଟ୍ରିକର ପ୍ରସୌତ୍ର ଏବଂ ଜନେର ପୌଜେ ଜୋ
କେନେଡ଼ି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ ବୈମାନିକ । ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ
ବିଧିତ ହ୍ୟେ ତିନି ମାରା ଯାନ । ଏର ଚାର ବହର
ପରେ, ଜୋ-ର ବୋଲ କ୍ୟାଥଲିନ୍ଓ ଏକ ବିମାନ
ଦୂର୍ଘଟନାୟ ମାରା ପଡ଼େନ ।

୧୯୬୩ ସାଲ ।

ମାର୍କିନ୍ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ୟ John F.
kennedy (ଜୋ-ର ଏକ ଛୋଟ ଭାଇ) ଡାଲାସେ
ଆତତାଯାର ଶୁଳିତେ ନିହତ ହନ ।

১৯৬৮ মারা যান প্রেসিডেন্ট পদপ্রাপ্তী
রবার্ট কেনেডি আতঙ্কয়ীর গুলিতেই।

১৯৬৯ সাল।

তাঁদের কনিষ্ঠভাই টেডি কেনেডি
চাম্পাকুইডকের অ্যাঞ্জিলেটে মৃত্যুর কাছ থেকে
ফিরে আসেন, কিন্তু তাঁর সেকেন্টারি ম্যারি জো
কোপেরন মারা যান।

কী মারাত্মক রহস্য!

কী অবিশ্বাস্য রহস্য!

তিনি

জগৎখ্যাত হীরক খণ্ড ‘হোপ’ এবং রহস্য

সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত। এক মন্দিরে
দেবমূর্তির চোখে ছিল ১১২-১/২ ক্যারেট
ওজনের অপূর্ব হীরক ‘হোপ’। পরে নামটি
দেয়া হয়। স্থানীয় প্রচলিত বিশ্বাস ছিল: কোনও
মানুষ হীরকটির অধিকারী হলে, দেবতা তাকে
ধৰ্ম করবেন।

এক ফরাসী বেনিয়া জিন ব্যাপ্টিস্ট
ট্যাভারনিয়ার, হীরকটি ছুরি করে নিয়ে যায়।
এবং বিক্রি করে ফ্রাঙ্গের রাজা চতুর্দশ লুই-এর
কাছে। পরে ট্যাভারনিয়ার মারা যায়
রহস্যজনকভাবে।

এদিকে, হীরক খণ্ডটি কেনার পর (!)
ফ্রাঙ্গের রাজবংশে নেমে আসে বিপর্যয়।
... হীরকটির সর্বশেষ রাজকীয় অধিকারী হলেন
রাণী ম্যারি এন্টোইনিতে। তিনি ফরাসী
বিপ্লবের সময় গিলোটিনে প্রাণ হারান।

পরবর্তীতে যে ব্যক্তি বা যে পরিবারই এই
হীরকের মালিক হয়েছেন, তিনি বা সেই
পরিবার একের পর এক দুর্ঘটনার শিকার
হয়েছেন। ... অভিশপ্ত হীরকখণ্ড জগৎখ্যাত
হীরকথণ্ড।

অভিশপ্ত হীরকটি শেষ পর্যন্ত নেয়া হয়
যুক্তরাষ্ট্রে।

কিনে নেন ধনাচ্য এডওয়ার্ড বি
ম্যাকলিন। কিছুদিন পর তাঁর মা এবং ১০
বছরের পুত্র মারা যায় গাঢ়ি দুর্ঘটনায়।
এডওয়ার্ডের এক কল্যাণ অভিবিক্ষ ঘূমের ওষুধ
গিলে মারা যায়। এডওয়ার্ডের জীবনের শেষ
দিনগুলো কাটে মানসিক হাসপাতালে।

হীরক খণ্ড হোপের মত আর কোনও
অলংকারের সাথে এত অপযাপতে মৃত্যুর ঘটনা
জড়িত নেই।

এই ‘হোপ’ খণ্ডটি এখন এই মুহূর্তে

রয়েছে: শ্বিথসনিয়ান ইনসিটিউটে।

কী মারাত্মক রহস্য!

কী অবিশ্বাস্য রহস্য!

চার

রোমানভ রাজবংশ নিয়ে রহস্যময় ঘটনা

রোমানভ বংশের রাজারা শুরু থেকেই
অভ্যাচারী। এদের বংশ রাশার বিপ্লবে উৎখাত
হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে জার মাইকেল এক
নিষ্পাপ বালককে মক্ষে নদীতে ডুবিয়ে মারার
নির্দেশ দিলে, বালকের শোকবিশ্বল মা এ বংশ
নির্বাণ হওয়ার অভিশাপ দেন।

তা দ্রুত ফলতে থাকে।

জারের ৫ সত্তানের ওজন মারা যায়।
একজন ছিল জন্ম থেকেই প্রতিবাহী, অন্যজন
ছিল বিকল্পস্ত। ১৯১৭ সালের বিপ্লবে রোমানভ
বংশের সর্বশেষ রাজা জার দ্বিতীয় নিকোলাস ও
তাঁর পরিবারকে হত্যা করা হয়েছিল।

কী মারাত্মক রহস্য!

কী অবিশ্বাস্য রহস্য!

পাঁচ

হ্যাপসবার্গ রাজবংশ-কে দিরে

রহস্যময় ঘটনা

হ্যাপসবার্গ রাজবংশ। তাঁরা ইউরোপের
বিভিন্ন দেশে ৯০০ বছর শাসন করেন। দশম
শতাব্দী, কাউন্ট হ্যাপসবার্গ এক রম্পাকে ধৰ্মণ
ও অস্তস্ত্রা করা শেষে দুর্গ থেকে নদীতে
নিষ্কেপ করেন। এ যুবতীর অভিশাপ পরবর্তী
৮০০ বছর এই পরিবারকে আক্রান্ত করে। এই
বংশে মৃত্যু আসে বড়বজ্জ, বিষপান, অজ্ঞাত
ব্যাধির ঝঁক নিয়ে। এদের খুব কম সদসাই
ছিলেন, যাঁদের রহস্যজনকভাবে বা অপযাতে
অপমৃত্যু হয়ন।

১৮৬৩ সাল।

ম্যাঞ্জিলিয়ান নামের এক হ্যাপসবার্গ
মেঞ্জিকোর রাজা হন, কিন্তু তিনি নিহত হন
বিদ্রোহীদের হাতে। এই বংশকে দিরে সবচেয়ে
বেদনবিদ্রুক ঘটনা হলো: যুগেস্ত্রাভিয়ার
সারায়েভোয় আর্ট ডিউক ফ্রাঙ্গিস ফার্নিনাও এবং
তাঁর স্ত্রীর হত্যাকাণ...

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় প্রথম
বিশ্বযুদ্ধ।

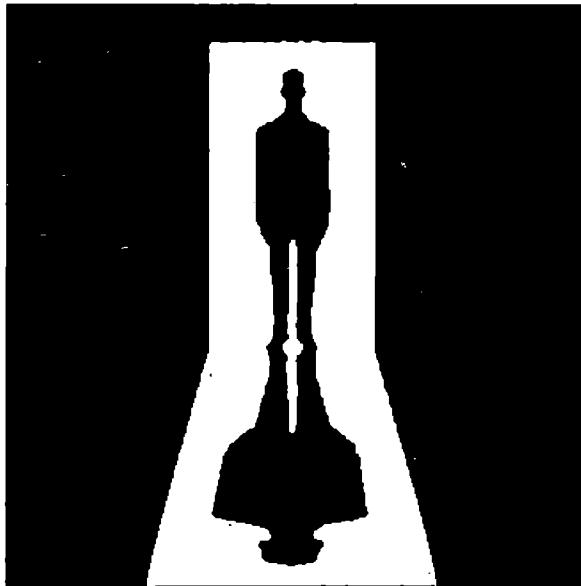
বহস্যের কি আর শেষ রয়েছে এই
পৃথিবীতে? ■

কিউপিড-ব্যালান্স

আবদুল গাফফার রনি

সার্চলাইট

জ্বেলে রাঙ্গুসে
প্রাণীগুলোকে
ভয় পাইয়ে
দিতে চান না
জামিল। তাই
ইনফারেড
ক্যামেরা
চালিয়ে দিয়ে
কঙ্কালগুলোর
ওপর নজর
রাখছেন।



টানা তিনদিন ল্যাবোরেটরি ছেড়ে বের হননি ড. জামিল। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভিনেত্র টিউবে সেখ লাগিয়ে পড়ে আছেন। অতিথি, সাংবাদিক কারও প্রবেশের অনুমতি নেই তাঁর দেড়শ' বছরের পুরোনো বাড়িতে। নাসার বিজ্ঞানীদেরও প্রবেশ নিষেধ। বেয়ারা জগমোহন পর্যন্ত চুক্তে সাহস পাচ্ছে না ল্যাবে। এমনকী প্রিয় কুকুর ভীমকেও শিকলবদ্ধী করতে বাধ্য হয়েছে জগমোহন। ল্যাবোরেটরিতে তিনে জ্যানো শুকনো খাবার আর পানি খেয়েই তিনটে দিন আর করেছেন জামিল।

অণুবীক্ষণের স্লাইডে কিউপিডের মাটি। তিন দিন শত চেষ্টা করেও কিউ নামের একধরনের ডাইরাস ছাড়া অন্য কোনও অণুজীবের সঙ্কান যেলেনি। মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় ড. জামিলের।

সম্প্রতি দশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে কিউপিড নামের এক হাতের সঙ্কান পেয়েছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। এইটা TLS-১০১ নামের এক নক্ষত্রের কক্ষপথে ঘূরছে। কিউপিডের সঙ্কান পাঠিয়েছে ডয়েজার-১১। ডয়েজারের তোলা ছবি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন, কিউপিডের পরিবেশ পথিকীর জুরাসিক যুগের মত। কিন্তু ডয়েজারের এইটুকু তথ্যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি নাসার কর্তৃপক্ষ। আরও তথ্য চান। কিন্তু নাসার বর্তমান প্রযুক্তি তা জানাতে অক্ষম। তাই বলে হাল ছেড়ে বসে থাকলে তো চলবে না। শরণাপন্ন হয়েছিলেন ড. জামিলের। জামিলের মহাকাশশান পজিভার্জ-১৯৭১ ক্ষুদ্রাকায়। কিন্তু প্রযুক্তিগত মানে ডয়েজার-ফিনিক্সের চেয়ে এক হাজার বছর এগিয়ে।

পঞ্জিরাজ-১৯৭১-এর লেজার টিউব, পাথভিউয়ার, রেডিও ডিটেক্টর অত্যন্ত শক্তিশালী। তবে তার সবচেয়ে বড় ক্ষমতা মহাশূণ্যের ওয়ার্মহোল খুঁজে বের করা। প্রয়োজনে ছেটখাট ওয়ার্মহোল তৈরির ব্যবস্থাও আছে তাতে। তাই নাসার কর্তৃব্যক্তিরা অনেক আশা নিয়ে জামিলের শরণপথ হয়েছিলেন। জামিলও তাঁদেরকে নিরাশ করেননি। জৈব রোবট বিদ্যুপতিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কিউপিড অভিযান। পৃথিবীর সময়ে তিনবছর সাইক্রিস্ট ঘট্টা উনপঞ্চাশ মিনিট তেরো সেকেণ্ডে পৌছে গিয়েছিলেন কিউপিড। পঞ্জিরাজ-১৯৭১-এর ভীতি গতি আর সৌভাগ্যক্রমে পেয়ে যাওয়া ও ওয়ার্মহোলের বদলিতে জামিলের সময় লেগেছিল মাত্র একান্নদিন সাতাশ ঘট্ট।

কিউপিড ল্যাঙ করেই নাসার বিজ্ঞানীদের অন্যান্যের সত্যতা পেলেন ড. জামিল। পরিবেশে স্মৃদু শীতের আমেজ। পৃথিবীর জুরাসিক যুগের মতই। অতএব মহাকাশযান থেকে না নেমে যতদূর সংস্করণ প্রাণীকরণ করলেন। বলা যায় না তিরানোসরাসের মত ভয়ঙ্কর ভাইনোসর থাকতে পারে। রোবোটিক চাকায় ভর করে কিউপিডের মাটিতে গড়িয়ে চলল পঞ্জিরাজ-১৯৭১।

ঘট্ট-মিনিট করে কয়েকদিন পেরিয়ে গেল। কিন্তু তিরানোসরাস দূরে থাক, একটা টিকটিকির দেখা পেলেন না। তৃতীয় দিনে স্পেসশিপকে একটা জলাশয়ের ধারে ভেড়ানোর নির্দেশ দিলেন জামিল। জলাশয়ের পানি পৰিষ্কা করে দেখতে চান কোন্ ধরনের প্রাণী এতে তৃষ্ণা মেটায়।

হঠাতে শ্রিডি স্পিকার থেকে বিদ্যুপতির কষ্ট ভেসে এল, 'স্যার, হাতি!'

মিনিটের চোখ রাখলেন জামিল। ভেসে উঠল জুরাসিক যুগের আসল পরিবেশ। রাজকীয় ভঙ্গিতে হেলেদুলে আসছে একদল রোমশ হাতি। সাইজে পৃথিবীর হাতির তুলনায় পাঁচগুণ একেকটা।

'ম্যামথ!' উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন জামিল। 'বিদ্যুপতি? সাবধান থেকো। আক্রমণ করলেই গেছি একেবারে!

'ওকে, স্যার!'

ম্যামথ আক্রমণ করেনি। নিরীহ ভঙ্গিতে পানি খেয়ে চলে গেছে। হাতি সাধারণত দল

বেঁধে চলে। কিউপিডের ম্যামথরাও তাই। সংখ্যায় কত, জামিল গোনার চেষ্টা করেও পারলেন না। হাঁকলেন বিদ্যুপতিকে, 'দলে কয়টা ম্যামথ আছে জানতে পারবে?'

'মূল প্রফেসরকে কমাও করছি, স্যার?' জবাব দিল বিদ্যুপতি।

মনিটের তাকিয়ে ছানাবড়া হয়ে গেল জামিলের চোখ। ১৫৩৭টা!

'বিদ্যুপতি!' আবারও হাঁকলেন জামিল। 'এবার ডাইনোসরদের জন্য প্রস্তুত হও। ওরা কিন্তু ম্যামথদের মত ভদ্রলোক নয়।'

'ওকে, স্যার!'

তারপর একে একে শুধু ম্যামথের পালের দেখাই পেলেন। জুরাসিক যুগের অন্য কোনও প্রাণীর টিকিও মিল না। বিদ্যুপতিকে সাথে নিয়ে স্পেসশিপ থেকে নেমে এলেন জামিল। চারদিকে সবুজ গাছপালা আর ম্যামথের পাল। পারি কিংবা ছেট কোনও পোকামাকড়ও নেই।

'বিদ্যুপতি! চলো, কিউপিডের বিপরীত দিকটা দেখে আসি। সে অঞ্চলে নিশ্চয়ই এখন গ্রীষ্মকাল।'

আধুনিক মধ্যে পঞ্জিরাজ-১৯৭১ ল্যাঙ করল কিউপিডের উল্লেপিতে। এ পাশটার চেহারা একেবারেই অন্যরকম। চারদিকে শুরু ম্যামথের স্তূপ। তবে যথারীতি অন্য প্রাণী অনুপস্থিত।

তাজব হয়ে গেলেন ড. জামিল।

ম্যামথগুলো মরল কীভাবে?

নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কোনও ভাইরাসের সংক্রমণ!

কিন্তু অন্য প্রাণী যদি না-ই থাকে, তো এই লাখ লাখ ম্যামথের মড়ার সংক্রান্ত করবে কারা?

শুধুই কি ব্যাকটেরিয়া?

কিন্তু এভাবে তো পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয় না।

স্পেসশিপ ছেড়ে আরেকবার মীচে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন জামিল।

বিদ্যুপতি শুনে আঁতকে উঠল। 'স্যার, ভুলে যাচ্ছেন ঘাতক এক ভাইরাস রয়েছে মীচে!'

'ভয় নেই, বিদ্যুপতি। প্রোটেকশন পোশাক পরে নামব। আশা করি কিছু হবে না।'

কিন্তু নেমেও লাত হলো না। শুধুমাত্র ক্লিড

নামের ঘাতক ভাইরাস ছাড়া অন্যকোনও অপূর্জীবের সঙ্গান মিলল না। এমনকী ম্যামথের মৃতদেহ পচাতে পারে এমন ব্যাকটেরিয়ারও অস্তিত্ব নেই কিউপিডের ব্যামওলে কিংবা মাটিতে।

‘তা হলে ম্যামথের লাখ লাখ শব্দেহ যায় কোথায়?’ আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন জামিল।

সারাদিন ধরে চেষ্টা করেও সমাধানে পৌছতে পারলেন না। এক সময় TLS-১০১ নক্ষত্র মুখ লুকাল দিগতে। নেমে এল সঙ্গ্য। আঁধার আচ্ছন্ন করল কিউপিডকে।

বিদ্যাপতিকে নিয়ে স্পেসশিপে ফিরে এলেন চিঞ্চাক্ষিট জামিল। রাতের খাবার খেয়ে আবারও মন্তিকের খেলায় মেতে উঠলেন। কখন যে ঘুমের কাছে হার মেঁনে ঢলে পড়েছেন, বলতে পারলেন না।

সকালে ঘূম থেকে উঠে আগে ঢোক বোলালেন মনিটরে। ভয়ন্ত এক দৃশ্য দেখে থ মেরে গেলেন জামিল। লাখ লাখ ম্যামথের মৃতদেহ একরাতেই সাবাড় করে ফেলেছে কোনও রাঙ্গসে প্রাণীর দল। TLS-১০১-এর আলোয় বিকিমিক করছে ম্যামথের কক্ষাল।

‘বিদ্যাপতি!’ কট্টেলরমের উদ্দেশ্যে ইঁক ছাড়লেন জামিল। ‘চলো, আবার নামতে হবে।’

‘স্যর, বিপদ হতে পারে। না নামাই ভাল।’

‘তুমি কি রাতে কিছু দেখেছিলে?’

‘না, স্যর, ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।’

‘ভয় নেই, বিদ্যাপতি। ম্যামথের দেহ যারাই সাবাড় করুক, তারা মনে হয় দিনে বেরোতে সাহস করবে না।’

ধীর পায়ে নেমে এলেন ড. জামিল, সাথে বিদ্যাপতি। হাড়গুলো নেড়েচেড়ে পর্যাক্ষা করলেন। এক টুকরো মাংসও লেগে নেই তাতে। বিরাট কোনও মাংসাশী জীবের পক্ষে হাড়ের গা থেকে এত যসণভাবে মাংস ছাড়িয়ে নেয়া অসম্ভব। নিচয় রাঙ্গসে প্রাণীগুলো ক্ষুধা মেটানোর পর কোনও ক্ষুদ্র প্রাণীর দল এসে বাকি কাজ সেরেছে। কিছু কিছু হাড় সৃক্ষভাবে কুরে খাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

‘বিদ্যাপতি, আজ রাতও আমাদেরকে এখানে কাটাতে হবে, বিরল একটা দৃশ্য দেখা থেকে বিশ্বিত হব নইলে।’

দিনের বেলা লম্বা একটা ঘুম দিয়ে নিলেন জামিল ও বিদ্যাপতি।

গোধুলি নামার সাথে সাথে শুরু হলো অপেক্ষার প্রহর।

পথবীর টাঁদের মত কোনও উপগ্রহ নেই কিউপিডের। তাই জোছনা এসে অক্ষকার তাড়াবে, সে সঞ্চাবন্নাও নেই। সার্চলাইট জ্বলে রাঙ্গসে প্রাণীগুলোকে ভয় পাইয়ে দিতে চান না জামিল। তাই ইনফ্রারেড ক্যামেরা চালিয়ে দিয়ে কক্ষালগুলোর ওপর নজর রাখছেন। মৃধ্যরাত পেরিয়ে গেলে এল ওরা।

‘স্যর। এগুলো আবার কী?’ বিদ্যাপতির প্রশ্ন।

‘এদের অপেক্ষাই তো করছি আমরা।’

‘এদের!’ বড় অবাক হয়েছে নিলিঙ্গ স্বভাবের বিদ্যাপতি। ‘এরা তো সামান্য পিপড়ে, স্যর।’

‘সবুর করো বিদ্যাপতি, এদের বিশাল সংখ্যা পৃষ্ঠিয়ে দেবে এদের আকারের ঘাটতিকে।’

সত্যিই তাই।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পিপড়ের মিছিলে ছেয়ে গেল গোটা এলাকা।

কোটি কোটি।

ভুল, বিলিয়ন বিলিয়ন কালো পিপড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ল লাখ লাখ ম্যামথের কক্ষাল।

‘একটা পিপড়ে ধরতে পারলে ভাল হত,’ আপন মনেই বিড়বিড় করলেন জামিল।

‘ধৰব, স্যর?’ মাইক্রোফোনের কল্যাণে জামিলের বিড়বিড় করা কথাও কানে গেছে বিদ্যাপতির।

‘খবরদার! এ বোকাখি কোরো না। মুহূর্তে ওরা আমাদের ছিড়ে খুঁড়ে অণ-পরমাণু বানিয়ে দেবে। বরং আলো জ্বলে দেখো কী প্রতিক্রিয়া হয়।’

সার্চলাইট জ্বলে দিল বিদ্যাপতি। মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল কালো পিপড়ের পাহাড়। ম্যামথের কক্ষালগুলো পেরিয়ে এল সেই পাহাড়ের আড়াল থেকে। কিন্তু অক্ষত নেই একটাও।

অবশ্যে ল্যাবোরেটরি থেকে বের হয়েছেন ড. জামিল। সোনারগাঁ হোটেলের বলরূমে বসেছে পৰিধীর বিখ্যাত সব বৈজ্ঞানিক আৰ নামকৰা সব নিউজ এজেন্সিৰ সাংবাদিকদেৱ মিলনমেল। যেন বড় এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন।

জামিল তাৰ কিউপিড অভিযানেৱ অভিজ্ঞতা সবিজ্ঞানেৰ জানালেন।

এখন কিউপিড-ব্যালাসেৰ পালা, সেটাও তিনি জানালেন।

বৈজ্ঞানিকৰা বুৰালেও সাংবাদিকৰা বুৰালেন না স্পষ্ট কৰে।

বিবিসিৰ এক সাংবাদিক বললেন, 'একটু বোলসা কৰে বলুন, স্যার। আমাদেৱ বুৰাতে অসুবিধা হয়েছে।'

জামিল মুচকি হেসে কিউপিড-ব্যালাস রহস্যেৰ ঘণ্টিপু খুললেন।

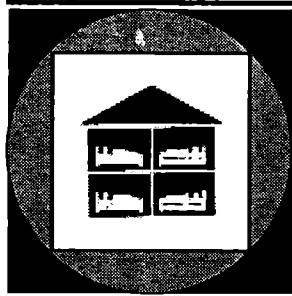
'আমাৰা প্ৰথমে যে জায়গায় ল্যাও কৰি শখানে শত্ৰু ম্যামথ ছাড়া অন্য কোনও প্ৰাণী নেই। আৱ ওই অঞ্চলে তখন শীতকাল। রোমশ ম্যামথ নিক্ষণ শীতে সাত্ত্বদ্যবোধ কৰে। আবাৰ উল্টোদিকে গেলাম। সেখানে গ্ৰীষ্ম কেবল শুক হয়েছে। লাৰ লাৰ ম্যামথ অৱে পড়ে বোৰেছে সেখানে। বুৰালাম গ্ৰীষ্মকালে কিড ভাইৱাসেৰ সংক্ৰমণে উজাড় হয়ে যায় ম্যামথেৰ পাল। সব যে উজাড় হয়, তা নয়। বিৱাট একটা অংশ গ্ৰীষ্মেৰ শুকতেই পাড়ি দেয় শীত-প্ৰধান অঞ্চলে। কিন্তু কিউপিডে ম্যামথেৰ সংখ্যা এত বেশি, সবগুলো একসাথে পালাতে অনেক সময় লেগে যায়। যেগুলো পেছনে পড়ে যায়, সেগুলো পালানোৰ আগেই কিড ভাইৱাসেৰ শিকাৰ হয়।'

ম্যামথেৰ মৃতদেহ পচানোৰ জন্য কাৰ্য্যকৰী কোনও ব্যাকটেৰিয়া নেই কিউপিডেৰ মাটিতে। কিন্তু ওগুলোকে সাবাড় কৰাৰ জন্য আছে বিলিয়ন বিলিয়ন কালো পিপড়েৰ পাল। মুহূৰ্তেই এৱা টুকুৱা-টুকুৱা কৰে ম্যামথেৰ মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যায় নিজেদেৱ গতে। এমনকী হাড়গোড়ও। এই পিপড়েৱা শীত-আলো কোনোটাই সহ্য কৰতে পাৱে না। অন্য কোনও প্ৰাণী যখন নেই, তাই এদেৱ চৰম খাদ্য সংকট দেখা দেয়াৰ কথা ছিল। কিন্তু এদেৱ খাদ্য যোগান দেয় কিড ভাইৱাস। ম্যামথেদেৱ সংক্ৰমিত কৰে। আবাৰ ম্যামথেৰ মৃতদেহে ঘাপটি যেৱে থাকা ভাইৱাসগুলো ঢুকে পড়ে

পিপড়েৱ দেহে। তবে ম্যামথকে যত সহজে মাৰতে পাৱে পিপড়েদেৱ তত সহজে পাৱে না। দু'তিন সঙ্গী লেগে যায়। এই দু'তিন সঙ্গীহেৰ মধ্যে স্তৰী পিপড়েগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন ডিম পেড়ে রেখে যায়। ডিম ফোটাৰ আগেই বয়ক পিপড়ে কিডেৰ সংক্ৰমণে উজাড় হয়। পাহাড়েৰ মত জমা হয় পিপড়েৰ মৃতদেহ। তাদেৱ জমা কৰা খাদ্যেৰ পাহাড় ভোগ কৰে ডিম ঝুটে বেৱোনা বাঢ়াগুলো।

পিপড়েৱ ডিম ঝুটে বাঢ়া বেৰ হওয়াৰ আগেই শেষ হয়ে যায় কিড ভাইৱাসেৰ আয়ুকাল। তাৰাও ম্যামথ ও পিপড়েৱ দেহে পৱৰতৰী প্ৰজন্মেৰ বীজ রেখে মৃত্যুৰ কোলে ঢলে পড়ে। পৱৰতৰীতে ম্যামথেৰ মৃতদেহেৰ ভেতৰে লুকিয়ে থাকা কিড ভাইৱাসেৰ বীজ খাদ্যেৰ সাথে চলে যায় পিপড়েৱ দেহে। সেখানেই তাদেৱ প্ৰথম প্ৰসেসিং হয়। পিপড়েৱ মলেৰ সাথে বেৱিয়ে মিশে যায় যাটিতে। শুক হয় কিড বীজৰ হিটীয়া প্ৰসেসিং। এই প্ৰসেসিং শেষ হতে হতে আবাৰ গ্ৰীষ্ম এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ম্যামথৰা ফিরে আসে শীতল এলাকায়। সেখানে গ্ৰীষ্ম আসা পৰ্যন্ত জমিয়ে রাখা ম্যামথেৰ মৃতদেহগুলোকে খেয়ে জীৱন ধাৰণ কৰে নতুন প্ৰজন্মেৰ পিপড়েৱো। আবাৰ এলাকায় গ্ৰীষ্ম এলে কিড ভাইৱাস আক্ৰমণ কৰে ম্যামথদেৱ। পিপড়েগুলো তখন তাদেৱ পৱৰতৰী বংশধৰণেৰ জন্য জমা কৰতে শুক কৰে ম্যামথেৰ মৃতদেহ।

'কৃতিৰ এই চমৎকাৰ সিস্টেম শীত-গ্ৰীষ্মেৰ ধাৰাবাহিকতা বৰ্কা কৰে কিউপিডেৰ সব অঞ্চলে ভাৱসাম্য। ও, হ্যা, একটা কথা বলা হয়নি। ভেঙে না বললেও বুৰবেন, কিউপিডেৰ গাছপালাৰ জন্য কাৰ্বন ডাই-অক্সাইডেৰ অভাৱ হয় না। এত এত ম্যামথ ও বিগুল সংখ্যক পিপড়ে ওই ডাই-অক্সাইড যোগান দেয়। কিন্তু এখনেও অসামঞ্জস্য থেকে যাচ্ছে না? যেহেতু পচানোৰ মত কোনও ব্যাকটেৰিয়া নেই, মৃত গাছপালাগুলোৰ কী হয়? ছোট ছোট গাছপালা খেয়ে সাবাড় কৰে ফেলে কিউপিডেৰ কোটি কোটি ম্যামথ। এদেৱ চোখ ফোকি দিয়ে যেগুলো বেঢ়ে ওঠে তাদেৱ শেষ পৱৰণতি দাবানলে ভশ্যভূত হওয়া। আৱ পিপড়ে? মৃত পিপড়েৰ স্তৃপণগুলো ও ভশ্যভূত হয় সেই দাবানলে! কথা শেষ কৰে আত্মস্তুতিৰ সঙ্গে হাসলেন ডষ্টেৱ জামিল। ■



ଘର-ସଂସାର

ଶାମୀମା ଆନ୍ତାର

ସକାଳେ ସୁମ୍ମ ଥେକେ ଉଠେ କ୍ଲେନ୍ଜିଂ
ନା କରଲେଣ୍ଡ ଚଲବେ, କିଷ୍ଟ ରାତେ
ଦୂମାତେ ଯାଓସାର ଆଗେ ତୃକ୍
ପରିଷକାର କରା ବିଶେଷ ଜରୁରି ।

ରୂପଚର୍ଚାୟ କ୍ଲେନ୍ଜିଂ

ପିଲ୍ ବୋନେରା,

ମବାଇକେ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜାନିଯେ ଶୁରୁ କରଛି ଏବାରେର ଆଲୋଚନା । ତୃକ୍ ପରିଷକାର ରାଖା ଅର୍ଥାଏ କ୍ଲିନ କ୍ଲେନ୍ଜିଂ ରୂପଚର୍ଚାର ଏକଟି ଅବିଜ୍ଞାନ୍ୟ । ସ୍ଵାଭାବିକ, ଶୁଦ୍ଧ, ତୈଳାକ୍ କିଂବା ଶିଶୁ ଯେ କୋନେଥିବେ ଧରନେରଇ ତୃକ୍ ହୋଇ ନା କେନ୍ତା, ତୃକେର ଯତ୍ନେର ଜନ୍ୟ କ୍ଲେନ୍ଜିଂ ଏକାକ୍ଷର ଜରୁରି । ସକାଳେ ସୁମ୍ମ ଥେକେ ଉଠେ କ୍ଲେନ୍ଜିଂ ନା କରଲେଣ୍ଡ ଚଲବେ, କିଷ୍ଟ ରାତେ ଦୂମାତେ ଯାଓସାର ଆଗେ ତୃକ୍ ପରିଷକାର କରା ବିଶେଷ ଜରୁରି । ତା ନା କରଲେ ସାବାନ ରାତ ତୃକେ ଧୂଲୋ ମୟଳା ଓ ମେକ-ଆପ ଜମେ ଥାକବେ । ସାରାଦିନ ଧରେ ତୃକେର ଉପର ଜମେ ଥାକା ଧୂଲୋ ମୟଳା ପରିଷକାର କରଲେ ତବେଇ ଦୂମାନୋର ଆଗେ ସତେଜ ତୃକ୍ ନିଯେ ଦୂମାତେ ଯେତେ ପାରବେନ । ଆମରା ଅନେକେଇ ତୃକ୍ ଧୋଯାର ସମୟ ସାବାନ ବ୍ୟବହାର କରି । କିନ୍ତୁ ସାବାନର ଅୟାଲକାଲାଇନର ପ୍ରଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ତୃକ୍ ଆରା ଶୁଦ୍ଧ ହେଁ ପଡ଼େ । କାରଣ ସାବାନ ତୃକେର ନ୍ୟାଚାରାଲ ଅଯେଲ ଓ ମୟେଚାରକେ ରିମ୍ବୁତ କରେ । ଏ ଛାଡ଼ା ତୃକେର ସ୍ଵାଭାବିକ ଅୟାସିଡ ଅୟାଲକାଲାଇନ ବ୍ୟାଲେଣ୍ଡ ନଟ କରେ ଦେଯ । ଏକ୍ରତପକ୍ଷେ ସାବାନ ବ୍ୟବହାର ତୃକେର ବିଭିନ୍ନ ରକମ କ୍ଷତିର କାରଣ ହତେ ପାରେ । ପାରାଫିଟିମ ରଖେହେ ଏମନ କୋନେଥିବେ ସାବାନ ସଂବେଦନଶୀଳ ତୃକେ ବ୍ୟବହାର କରବେନ ନା । ଶୁଦ୍ଧ ତୃକେ ଦୀର୍ଘଦିନ ସାବାନ ବ୍ୟବହାରେର ଫଳେ ତୃକ୍ ଆରା ଶୁଦ୍ଧ ହେଁ ଯିଗେ ଅକାଲ-ବାର୍ଧକ୍ୟେର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦିତେ ପାରେ । ଏହାଡ଼ା ସଂବେଦନଶୀଳ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ତୃକେ ଲାଲ ଛୋପ ଦେଖା ଦିତେ ପାରେ । ତୈଳାକ୍ ତୃକେ ଦିନେ ଦୁର୍ବାରେର ବେଶି ସାବାନ ବ୍ୟବହାର ନା କରା ଭାଲ । ସାବାନ ବ୍ୟବହାରେର ପର ଭାଲ କରେ ପାନି ଦିଯେ ତୃକ୍ ଧୂରେ ନେବେନ । ମନେ ରାଖିତେ ହବେ, ସନ ସନ ସାବାନ ବ୍ୟବହାର କରଲେ ତୃକେ ଅୟାଲକାଲାଇନର ମାତ୍ରା ବେଡ଼େ ଯାଇ, ଫଳେ ଇନଫେକ୍ଶନର ଆଶଙ୍କା ବୁଝି ପାଇ । ତୃକ୍ ପରିଷକାର ରାଖାର ବ୍ୟାପାରେ କଥେକଟି ବିଷୟ ଖେଲାଇ ରାଖୁଣ । ଯେମନ, ତୃକ୍ ପରିଷକାର କରାର ସମୟ ସୁର ବେଶି ଗରମ ପାନି ବ୍ୟବହାର କରବେନ ନା । କିଂବା ଅନେକକ୍ଷଣ ଧରେ ଗୋସଲ କରବେନ ନା । ଏତେ ତୃକେର ଅଯେଲ ବ୍ୟାଲେଣ୍ଡ ନଟ ହେଁ ଯାଇ । ୧୫ ମିନିଟ ବା ତାର କମ ସମୟେର ମଧ୍ୟେ ଗୋସଲ ସେରେ ଫେଲୁନ । ଗୋସଲେର ସମୟ କୁସୁମ ଗରମ ପାନି ବ୍ୟବହାର କରନ । ସାରାଦିନ କାଜେର ପର ରାତେ ଶୁତେ ଯାଓସାର ଆଗେ ମୁଖମର୍ତ୍ତଳ ପରିଷକାର କରତେ ଭୁଲବେନ ନା । ତୃକେର ଧରନ ଅସୁଧାରୀ କ୍ଲେନ୍ଜାର ବେଛେ ନିନ । ମେକ-ଆପେର ପର ବିଶେଷ କରେ ଚୋଥେର ମେକ-ଆପ ତୁଳେ ଫେଲାଇ ସମୟ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିନ । ନରମ ସ୍ପଞ୍ଜ, ସୁତିର କାପଡ଼ ବା ତୁଲୋତେ ମେକ-ଆପ ରିମ୍ବୁଡ଼ିଂ କ୍ରିମ ଲାଗିଯେ ଚୋଥେର ମେକ-ଆପ ତୁଳେ ଫେଲୁନ । ଖେଲାଇ ରାଖିବେନ, ଚୋଥେର ଚାରପାଶେର ନରମ ଟିସ୍ୟୁଟାଲୋତେ ଯେବେ ଆପାତ ନା ଲାଗେ । ତାରୀ ବା ଓୟାଟାର ଏକ-ଏକ ମେକ-ଆପ ବ୍ୟବହାର କରଲେ ଅଯେଲ ବେସଡ ପ୍ରୋଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ । ତୃକ୍ ପରିଷକାର କରାର ବା ଗୋସଲ କରାର

পর তোয়ালে দিয়ে হালকা করে মুখ মুছন। এতে তৃকের ময়েচার বজায় থাকবে। তারপর ময়েচারাইজার লাগান। কোন্ঠ ধরনের তৃকের জন্য কী রকম ক্লেনজিং ব্যবহার করতে হবে এবাব তা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। স্বাভাবিক থেকে শুক তৃক-এ ধরনের তৃকের জন্য রিহাইড্রেট ক্লেনজিং জেল বা ক্রিম ব্যবহার করুন। এতে তৃক নরম ও মস্ণ থাকবে। ক্লেনজার লাগানোর পর ভিজে তুলো দিয়ে তৃক মুছে নেবেন। এতে তৃকের ভিজে ভাব বজায় থাকবে। তৃক নরম ও মস্ণ হবে। স্বাভাবিক, তৈলাক্ত ও মিশ্র প্রক্রিয়ি তৃক-এক্সেত্রে ক্লেনজিং মিস্ক ব্যবহার করতে পারেন। সোপলেস ক্লেনজার বা ফেসওয়াশেও অসুবিধা নেই। ডিমের মত ফেসওয়াশ তৃকে লাগিয়ে নিন। তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কিন্তু টাইপ অনুযায়ী বাজারে যে ফেসওয়াশ পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। সংবেদনশীল তৃক-সংবেদনশীল তৃকে দাগ ছেপ কিংবা ত্রণের সমস্যা থাকলে মেডিকেটেড ক্লেনজার বা সাবান ব্যবহার করুন। এতে তৃকের অতিরিক্ত তৈলাক্ত ভাব দূর হবে। পাশাপাশি নিজেকে তরতাজাও লাগবে। ক্লেনজিং গ্রেন বা ফেশিয়াল স্ক্রাব ডিপ ক্লেনজিংয়ের জন্য ব্যবহার করুন। ব্ল্যাক হেডসের সমস্যা থাকলে স্ক্রাব খুব ভাল কাজ করে। এটি ডেড সেল পরিষ্কার করে ও রোমকুপের মুখ পরিষ্কার করতে সহায়তা করে। স্ক্রাব কখনো জোরে ঘষবেন না, এতে তৃক ক্রস্ফ হয়ে পড়বে। স্ক্রাব হালকাভাবে ঘষে তৃক ধুয়ে ফেলুন, তৃকে দাগ হবে না। এবাব ঘরোয়া উপায়ে স্ক্রাব তৈরির পদ্ধতি জানাচ্ছি। ● বডি স্ক্রাব প্যাক হিসেবে বেসন ও আটা ভাল কাজ করে। এক টেবল চামচ বেসনের সঙ্গে অর্ধেক লেবুর রস, হলুদ, আধ চামচ বেকিং সোডা, দুই টেবল চামচ দুধ মিশিয়ে বডি স্ক্রাব তৈরি করুন। গোসলের আগে সারা গায়ে পাঁচ মিনিট ঘষুন। প্যাক শুকনো হয়ে এলে গোসল করার সময় ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। শুক তৃকের জন্য বেসনের স্ক্রাব উপকারী। ● তৈলাক্ত তৃকেও বেসনের স্ক্রাব ব্যবহার করতে পারেন। এ ধরনের স্ক্রাব তৈরির জন্য অর্ধেক লেবুর

বদলে আন্ত একটা লেবুর রস দিন, আর দুধের বদলে দই মেশান। ● স্বাভাবিক তৃকের জন্য লেবুর রস ও চিনি মিশিয়ে হালকা হাতে মাখুন। শুকনো হলে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এবাব তৃকের বলিবেখার সমস্যায় দুটো ঘরোয়া প্যাকের উল্লেখ করাই। এক প্যাক-ডিমের কুসম, দু'চা-চামচ গোলাপজল, এক টেবল চামচ মধু ভাল করে মিশিয়ে এয়ারাটাইট বোতলে ভরে রাখুন। সঙ্গাহে একবাব এই প্যাক ব্যবহার করুন। শীতকালে এই প্যাক বিশেষ উপকারী। বলিবেখার সমস্যা থাকলে ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে তিন টেবল চামচ ওট পাউডার ও একচামচ মধু মিশিয়ে ব্যবহার করুন। তৃক অতিরিক্ত শুক হলে ডিমের কুসম, দু'টেবল চামচ কমলার রস, আধ চা-চামচ লেবুর রস, কয়েক ফেটাই আমও তেল একসঙ্গে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। লাগানোর পর আধ ঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন। এটি শুক তৃকে বলিবেখা মুছে ফেলতে ভাল কাজ করে। মিস্ক প্যাক-তৃকে ব্যসের ছাপ প্রতিরোধ করতে মিস্কপ্যাক ব্যবহার করুন। একদিন পরপর এই প্যাক লাগাতে পারলে ভাল ফল পাওয়া যায়। দু'টেবল চামচ ওট মিলের সঙ্গে আধ কাপ দুধ মিশিয়ে করি আঁচে ফুটিয়ে নিন। নরম হয়ে এলে দু'চা-চামচ অলিভ অয়েল দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। ঠাণ্ডা হলে মুখমণ্ডলে, গলায় ও ঘাড়ে পঁচিশ মিনিট লাগিয়ে রেখে কুসুম গরম পানিতে ধুয়ে ফেলুন। রোদে পোড়া তৃকের জন্য কয়েকটি ঘরোয়া প্যাক তৈরি পদ্ধতির কথা এবাব উল্লেখ করাই। স্ট্রবেরি প্যাক-শসার রস এক চামচ, একটা টোম্যাটো, ডিমের সাদা অংশ, চারটি স্ট্রবেরি একসঙ্গে করে পেস্ট তৈরি করুন। আধস্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন। দইয়ের প্যাক-বেসনের সঙ্গে অল্প দই মিশিয়ে ফেটিয়ে নিন। আধস্টা লাগিয়ে রাখার পর ধুয়ে ফেলুন। রোদে পোড়া তৃকের জন্য এই প্যাকটি খুব উপকারী। দইয়ের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে ২০-৩০ মিনিট লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন, উপকার পাবেন। ঠাণ্ডা দইয়ের সঙ্গে লেবুর শোসা শুকনো করে মিশিয়ে প্রতিদিন ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া আরও কিছু প্যাক আছে যেমন, 'এক চা-চামচ

মধুর সঙ্গে দু'চা-চামচ লেবুর রস; এটি প্রতিদিন ২০ মিনিট লাগিয়ে রেখে ধূয়ে ফেলতে হবে। এ ছাড়া ফ্রিজে রাখা দুধে তুলো ভিজিয়ে মুখে লাগান-এটা মুখের পোড়া তুকের জন্য উপকারী, সেই সঙ্গে তুকও নরম হবে। নিয়মিত ব্যবহারে তুক পরিষ্কার হবে। আমও প্যাক-ফেশিয়াল ক্রাবের জন্য বাদাম খুব ভাল। গরম পানিতে বাদাম ভজিয়ে রাখুন। বাদামের খোসা উঠে এলে বাদামগুলো শকিয়ে নিন। মিঞ্চারে বাদাম ঘুঁড়ো করে নিয়ে এয়ারটাইট কঠেনারে রেখে দিন। প্রতিদিন দু'চামচ বাদাম ঘুঁড়োর সঙ্গে অল্প দই বা ঠাণ্ডা দুধ মিশিয়ে তুকের ওপর ঘষে ঘষে লাগান।। তারপর পানি দিয়ে ধূয়ে ফেলুন। আপনার তুক যদি তৈলাঙ্গ হয় সে ক্ষেত্রে চাল ঘুঁড়ো ও দই একত্রে মিশিয়ে ব্যবহার করলে তাল ফল পাওয়া যেতে পারে। টোয়্যাটো প্যাক-টোয়্যাটো পাল়া, শসা কুরানো ও লেবুর রস একত্রে মিশিয়ে তুকে লাগিয়ে রাখুন। শকিয়ে গেলে মিশ্রণটা আর একবার হালকা

করে তুকের ওপর লাগিয়ে নিন। এবার শুকিয়ে গেলে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধূয়ে ফেলুন। এই প্যাক রোদে পুড়ে যাওয়া তুককে শুধু আরামই দেবে না, একই সঙ্গে তুকের ঔজ্জ্বল্যও ফিরিয়ে আনবে। তিলের প্যাক-তিল ঘুঁড়ো করে নিয়ে আধ কাপ পানি মেশান। পানি মেশানো অবস্থায় দু'ঘন্টা রাখুন। এরপর পানি ছেঁকে তিল মুখে লাগিয়ে রেখে কিছুক্ষণ পর ধূয়ে ফেলুন। এবার তুকের কালো দাগ ছোপ দূর করার জন্য কয়েকটা ঘরোয়া প্যাকের বর্ণনা দিচ্ছি। পিপারমেট প্যাক-চালের ঘুঁড়ো, টক দই, মূলতানি মাটি, কমলার খোসা ঘুঁড়ো, পিপারমেট অয়েল একসঙ্গে মিশিয়ে গলা ও ঘাড়ে ভাল করে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ভাল করে মাসাজ করে ধূয়ে ফেলুন। পেঁপের প্যাক-পাকা পেঁপে, তরমুজের রস, শসার রস, অল্প খেজুরবাটা, সুজি, ডিমের সাদা অংশ একসঙ্গে মিশিয়ে গলায় ও ঘাড়ে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা পানিতে ধূয়ে ফেলুন। পেঁপের সঙ্গে এক চামচ করে দই, মধু, চার চা-চামচ ওটিল, এক চামচ লেবুর রস অল্প মিশিয়ে মাঝ তৈরি করে নিন। সঙ্গাহে দু'বার এই মাঝ ব্যবহার করুন। এক ঘণ্টা লাগিয়ে রেখে ধূয়ে ফেলতে হবে। চন্দনের প্যাক-চন্দন ও মূলতানি মাটি গোলাপজল দিয়ে মিশিয়ে না শুকানো পর্যন্ত লাগিয়ে রাখুন। সঙ্গাহে চারবার এই প্যাক ব্যবহার করুন। পেট্রোলিয়াম জেলি প্যাক-পেট্রোলিয়াম জেলি বা ক্রিমের সঙ্গে কোর্স সল্ট মেশান। লাগানোর একটু আগে এই মিশ্রণ তৈরি করুন। তার্ক স্পেচের ওপর হালকা হাতে ঘষে লাগান। এরপর পানি দিয়ে মুখ ধূয়ে ফেলুন। মুখ মুছে নিয়ে ঠাণ্ডা দুধ ১৫ মিনিট মুখে লাগিয়ে রেখে আবার মুখ ধূয়ে ফেলুন। ঘরোয়া উপায়ে তৈরি ক্ষেপজার-আধ কাপ দুধের সঙ্গে ৫ ফেঁটা অলিভ অয়েল বা তিলের তেল ও সানফ্লাওয়ার অয়েল মেশান। মিশ্রণটি বোতলে ভাল করে বাকিয়ে নিন। এই মিশ্রণ তুলোয় লাগিয়ে মুখমণ্ডল পরিষ্কার করুন। তারপর ভিজে তুলো দিয়ে মুখ মুছে নিন। বাকি মিশ্রণটি ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। একবার মিশ্রণ তৈরি করে ৪-৫ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করতে

যা কিছু সংগীত তাই নিয়ে সরগম

দেশের সংগীত বিষয়ক একমাত্র নিয়মিত পঞ্জীয়ন

প্রকাশনার ১৬ বর্ষের  মাসিক
সংগীত

সংগীত সম্পর্কে জানতে
সংগীত শিখতে নিজে গড়ুন
অন্যকে গড়তে উৎসাহিত করুন

৩৪৫, সেগুন বাগিচা (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩২২৭০৬, ৮৩৫২১৬৭
ই-মেইল : sargam93@yahoo.com
visionad@agni.com

পারবেন। আরেকটি ক্লেজুর তৈরির পদ্ধতি
বলছি: ১ চা-চামচ লেবুর রস ঠাণ্ডা দুধের সঙ্গে
মিশিয়ে লাগান। ১৫ মিনিট রেখে মুখ ধুয়ে
ফেলুন। আজ এ পর্যন্তই। তুকের সুরক্ষায়
ক্লেজিং কর্তৃপূর্ণ তা এখন নিচয়ই
জানা হয়ে গেছে। সবাইকে আবারও অনেক
শুভেচ্ছা।

রান্নাঘর

ছোলার ডালের হালুয়া

উপকরণ: ছোলার ডাল-১ কাপ; চিনি-আধ
কাপ; ঘি-পেনে এক কাপ; দুধ- বড় এক
কাপ; খোয়াক্ষীর পরিমাণ মত; এলাচ গুঁড়ো-
সামান্য; কাজুবাদাম বাটা-৩ টেবেল চামচ;
কিশমিশ-পরিমাণমত।

প্রণালী: ছোলার ডাল ভিজিয়ে রাখুন। প্যানে ঘি
গরম করে কম আঁচে ডালবাটা নেড়ে নিন।।
হালকা বাদামি রং হলে খোয়াক্ষীর, চিনি ও
কাজুবাদাম বাটা দিয়ে ভাল করে মেশান।
এরপর দুধ দিন। একটু ঘন হলে এলাচ গুঁড়ো
দিয়ে নাখিয়ে নিন।

তিলের হালুয়া

উপকরণ: সদা তিল-১ কাপ; নারকেল
কোরা-আধ কাপ; কাজুবাদাম বাটা-৪ চামচ;
চিনি-আধ কাপ; দুধ-দেড় কাপ; খোয়াক্ষীর-
আদাজমত।

প্রণালী: কড়াইয়ে তিল ভেজে গুঁড়ো করে নিন।
দুধ ফুটিয়ে একটু ঘন করে নিন। তারপর দুধের
মধ্যে নারকেল কোরা ও চিনি মিশিয়ে আরও
কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন। চিনি মিশে গেলে গুঁড়ো

তিল ও চীর দিয়ে নাড়তে থাকুন। বেশ ভাল
করে নাড়ার পর শেষে কাজুবাদাম বাটা
মেশান। ওপরে আস্ত তিল ছাঁড়িয়ে নাখিয়ে
নিন। ঠাণ্ডা হলে পেস্তা কুচি দিয়ে সাজিয়ে
পরিবেশন করুন।

আপেলের হালুয়া

উপকরণ: আপেল-১টা; ছানা-পরিমাণমত;
চিনি-সাদমত; মাখন-১ চা-চামচ; দুধ-
পরিমাণমত; আপেল কুচি-১ টেবেল
চামচ।

প্রণালী: আপেল সিদ্ধ করে টকে নিন।
আপেলের পরিমাণের অর্ধেক ছানা নিন। সিদ্ধ
আপেলের সঙ্গে ছানা ভাল করে মাখুন।
কড়াইতে মাখন দিয়ে আপেল ও ছানার মিশ্রণ
দিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন। চিনি, কাজুবাদাম,
পেস্তা ও কিশমিশ মেশান। একটু নেড়েচেড়ে
অন্ত দুধ দিয়ে নরম করে নিন। পুরোটা মিশে
গেলে আপেলের কুচি ছাঁড়িয়ে নাখিয়ে নিন।
ঠাণ্ডা হলে পরিবেশন করুন।

আপনাদের

চিঠির জবাব



● আমার যখন বিয়ে হয় সে সময় বয়স ছিল
১৮ বছর। বিয়েটা হয়েছিল বাবা-মা'র পছন্দের
পাত্রের সঙ্গে। সে সময় স্বামীর বয়স ছিল ২৮
বছর। বিয়ের প্রথম প্রথম তার চাল-চলন
মাঝে-মাঝে কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকত।
যেমন, কোনও কারণ ছাড়াই হঠাত করে হেসে

আপনি কি হতাশ?

আর হতাশা নয়। নির্ভুল ভাগ্য গণনার মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে
• হলে স্বনামধ্যাত জ্যোতিষী কাজী সারওয়ার হোসেন পরিচালিত

“ভাগ্যচক্র”তে আসুন।

৩৪৫, সেগুনবাগিচা (চতুর্থ তলা)

(ভিশন অ্যাডভারটাইজিং সংলগ্ন)

শনি থেকে বৃহস্পতিবার: বিকেল ৫.৩০-৭.৩০

ফোন: ৮৩২২৭০৬, ৮৩৫২১৬৭ (অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য)

উঠত। বাড়ির অন্যান্যরা বলত, ও একটু আবুদে ব্রহ্মবের তাই সবাইকে আনন্দ দেয়ার জন্য এরকম করে। কিন্তু যে যা-ই বলুক না কেন, সার্বিক আচরণে তাকে কখনোই স্বাভাবিক মনে হয়নি। দু'বছর পরের কথা। আমার বয়স তখন ২০। একদিন শ্বামীকে নিয়ে বড় মামার বাসায় বেড়াতে গেলাম। শ্বামীর অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনে তার কপালে চিঞ্জার ভাঙ্গ দেখতে পেলাম। এর দুদিন পর বাবা-মা তেকে পাঠালেন আমাকে। শ্বামা তাঁদেরকে বলেছেন শ্বামী সিজোফ্রেনিয়ার রোগী। বাবা খুব দ্রুত এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিলেন। খন্তর ও অন্যান্যদেরকেও এ ব্যাপারে এক হাত নিতে ছাড়লেন না। এ রোগ নাকি ভাল হয় না। খন্তর বিষয়টি গোপন করে তাঁর ছেলের গতি করতে চেয়েছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার কদিন পর আমি বাবা-মা'র কাছে ঢেলে আসি। বাবা-মা ও বাড়ির অন্যান্য মূলবিবাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিয়েটা ভেঙে দেয়ার অর্থাৎ ছাড়াছাড়ি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আগে বাবা আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। আমি এখনও কোনও সিদ্ধান্ত দিইনি। আপা, বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে মতামত জানিয়ে আমাকে বাধিত করবেন।

শীলা মুহূর্তজ

দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

●● শীলা, পুরো বিষয়টি গোপন করে তোমার খন্তর খুব বড় ধরনের অন্যায় করেছেন। তোমার বাবা-মা ও অন্যান্য মূলবিবাহীয়া যে পথে এগোছেন তা বাস্তবতার নিরিখে সঠিক বলেই মনে হচ্ছে। মনে কোনও ধিহা-দন্ব না রেখে তৃতীয় তাঁদের কথায় রাজি হয়ে যাও। তোমার বয়স এখনও অনেক কম। বিষয়টিকে একটা দুঃঘটনা মনে করে তা থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়াই সব দিক দিয়ে মঙ্গলজনক হবে বলে আমার দ্রুত বিশ্বাস। ভবিষ্যতে হয়তো এমন কেউ তোমার জীবনে আসতে পারে যে কিনা তোমার অতীতের অপ্রাণিগুলোকে পূরণ করে দেবে। তোমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হোক এ কামনাই করি।

● সমস্যাটা আমার দুলাভাইকে নিয়ে। আমার বড় বোনের বিয়ে হয়েছে প্রায় দু'বছর হলো। এখনও বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি। তারা ধানমণ্ডিতে

থাকে। বোনের বিয়ের পর থেকে আমি মাঝে-মধ্যে তাঁদের বাসায় গিয়ে থাকতাম। বড় বোনের জোরাভুরিতে কথনও কথনও ৫-৭ দিনও একনাগড়ে থাকা হত। মাস ছয়েক আগের ঘটনা। দুলাভাই আমাকে নিয়ে মার্কেটে যাবেন। বাসা থেকে মার্কেট খুব দরে নয়। রিকসায় যাচ্ছিলাম আমরা, হঠাৎ তাঁনি আমার গায়ে আপত্তিকরভাবে হাত দিয়ে বসলেন। আমি কয়েকবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। মার্কেটে পৌছালো অবধি এই কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল। এরপর আমি তাঁর সঙ্গে রিকসায় কোনও জায়গায় যেতাম না। আরেকদিনের ঘটনা। বোনদের পাশের ফ্ল্যাটের অদৃশহিলা কী কারণে যেন বোনকে তেকে নিয়ে গিয়েছিল। ওইদিন ঘটল আরেক অঘটন। দুলাভাই এসে বোনকে না দেখতে পেয়ে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। এক পর্যায়ে জোর করে চুম্ব খেল। আমি উপায় না দেখে চিৎকার করতে উদ্যত হলে তবেই সে নিষ্পত্ত হলো। এরপর থেকে আমি আর ওই বাড়িতে যাই না। বোন বহুবার বলেছে কিন্তু আমি পড়ার চাপের অজ্ঞাত দিয়ে তাঁর ওখানে যাওয়া এড়িয়ে গেছি। মাকে আমি কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছি। মনে হয় মা বিষয়টি বুঝতে পেরেছে। কিন্তু, আপা, ভবিষ্যতে সবসময় কি আমি তাঁদের এড়িয়েই চলব, নাকি অন্য কোনও সমাধান আছে?

রীমা

মগবাজার, ঢাকা।

●● রীমা, বোনের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে তাৎক্ষণিকভাবে তৃতীয় ঠিক কাজটাই করেছে। কিন্তু এতে তো সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আমার মনে হয় সে যখন বাবা হবে তখন হয়তো এ ধরনের কুকুরের প্রতি আগ্রাহ মীরে ধীরে কর্মে যাবে। তবে একথা গ্যারান্টি দিয়ে বলার সুযোগ নেই। তাই তৃতীয় যে ওই বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে তাতে যে যা-ই বলুক না কেন, বাস্তবতার বিচারে ঠিক কাজটাই তৃতীয় করেছে। যদি একান্তই বোনের বাড়ি যেতে হয় তা হলে সঙ্গে কাউকে নিয়ে যেয়ো। সময়ই মানবস্বকে বদলে দেয়; এভাবে কিছুদিন যাক, দেখবে দুলাভাই হয়তো নিজেকে ওধরে নিয়েছে। আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি। ■

বিষাক্ত প্রজাপতি

আবুল ফাতাহ

আমি
একদিন দুষ্টুমি
করে
বলেছিলাম,
‘এতদিন
জানতাম,
মেয়েরা
মেয়েদের
সতীন হয়,
এখন দেখছি
তোমার এই
বন্ধুই আমার
সতীন হবে।’



‘শার লিফটের খ্যাতা পুড়ি! ’ বিড়বিড় করে গাল দিয়ে নষ্ট লিফটের সামনে থেকে সরে এল সাবির। হাতাশ চোখে তাকিয়ে বইল খাড়া সিড়ির দিকে। এখন এটা বেয়ে পাঁচতলা উঠতে হবে ভাবতেই গলা শুকিয়ে আসছে।

বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে উঠতে শুরু করল সিড়ি বেয়ে। সারাদিনের অফিসের ধকলে শ্রান্ত পা-দুটোকে টেনে নিতে বেশ পরিশ্রম হচ্ছে সাবিরের। দোতলা পর্যন্ত উঠতেই বুবতে পারল, মুসা ইব্রাহীমকে নিয়ে এত কেন হই-চই। ঘরে নতুন বউ অপেক্ষা করছে, তার ওপর এই জুলাতন সহ্য হয়?

যেন অনঙ্কাল পর নিজের ঝ্যাটের সামনে এসে দাঁড়াল সাবির। কলিংবেল চাপবে, আৰি এসে দৱজা খুলবে, এই ধৈর্য্যকুণ্ড হলো না সাবিরের। ওর কাছে বাড়তি চাবি আছে, ওটা দিয়ে দৱজা খুলে ভেতরে ঢুকল।

‘আৰি, আৰি,’ হাঁক ছাড়ল সাবির। কোনও সাড়া নেই।

কী ব্যাপার? কই গেল মেয়েটা? অন্যান্য দিন তো বাসায় ঢুকতেই ছুটে আসে। ভাবতে ভাবতে এক রূম থেকে আরেক রূমে উঠি দিতে লাগল সাবির। উঁহু, কোথাও নেই। বাইরে গেছে বোধহয়। সেলফোনটা বের করে ডায়াল করল আৰির নাথারে।

‘আপনার কাঞ্জিক্ত নাথারটিতে এই মুহূর্তে সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, অনুহ করে একটু

পরে আবার ডায়াল করন। আপনি আপনার নামার থেকে, এক, দুই, তিন ডায়াল করে দুই টাকা প্রতি মিনিটে...’ পর পর কয়েকবার সুরেলা কঢ়ে একবেয়ে কথাগুলো শুনতে শুনতে মেজাজটাই বিগড়ে শেল সাবিরের। খানিকটা ভয়ও লাগল। আৰি তো কখনও একা বাইরে

যায় না। দোকান টোকানেও যাতে না যেতে হয়, সেজন্য সাবির একটা দোকানে বলে রেখেছে, ফোন করলেই প্রয়োজনীয় জিনিস

দিয়ে যায় ওরা। তা ছাড়া, ঢাকা শহরে কোনও আয়ীয়-স্বজনও নেই আৰিৰ। তার ওপৰ মোবাইলটাও বৰ্জ। তা হলে?

মাত্ৰ একমাস আগে ওদেৱ বিয়ে হয়েছে। সাবিরের বাবা-মা দু'জনেই গ্রামে থাকে। সাবিরের নিজের ব্যবসা আছে। বেশ বড় ব্যবসা। আয়ও যথেষ্ট ভাল। প্রতিমাসে মোটা অংকের টাকা পাঠায় বাবা-মা'র কাছে। আৰি আৰি? সাবিরের পারিবারিক অবস্থা যতটাই ভাল, আৰিৰ পারিবারিক অবস্থা ততটাই সঙ্গীন। নিষ্প মধ্যবিত্ত পৰিবারে সৎ-মায়ের কাছে মানুষ আৰি। ওৱ মা ওকে জন্ম দিতে গিয়ে মাৰা যান। এৱপৰ বাবা আবারও বিয়ে কৰলে যা হয়, সৎ-মায়ের অত্যাচার' সহ্য না কৰে উপায় কী!

এৱ আগেও একবার বিয়ে ঠিক হয়েছিল আৰিৰ। বিয়েৰ কয়েকদিন আগে রোড অ্যাঞ্জিলেটে মাৰা যায় ছেলেটা।

এদেশে এসব মেয়েদের ‘অপয়া’ জাতীয় বিশেষণে ভূষিত কৰে দীৰ্ঘ একটা সময় পৰ্যন্ত তাদেৱ বিয়ে পাকাপাকিভাৱে বৰ্জ কৰে দেয়া হয়।

সাবিৰ যখন ওৱ অফিসেৰ এক কৰ্মচাৰীৰ পীড়ীপাড়িতে আৰিকে দেখাৰ জন্য ওদেৱ এলাকায় গেল, তখন কয়েকজন নিজ দায়িত্বে সাবিৰেৰ কানে কথাগুলো পৌছে দিয়েছিল। সাবিৰ তাদেৱ উদ্দেশে একটুকুৱা কৰুণাৰ হাসি হেসেছিল। এসব স্টুপিড কথাবাৰ্তা কৰনোই কানে তোলে না সাবিৰ।

আৰিকে দেখাৰ সাথে সাথেই সাবিৰ ঠিক কৰে ফেলেছিল, বিয়ে কৰলে এই মেয়েকেই কৰবে— হোক সে অপয়া— ডাইনী হলেও সমস্যা নেই। এত ঝুপবতী ডাইনীৰ

সঙ্গে জীৱন কাটাতে পাৱলে মন্দ কী!

এক সঞ্চাহেৰ মধ্যে ওদেৱ বিয়ে হয়ে গেল। পৰবতী মাস যেন উড়ে উড়ে চলল। সাবিৰেৰ মাৰো মাৰো আক্ষৰ লাগে, এই তো সেদিনই না ওৱা কৰুল বলে পৰম্পৰেৱ হাত ধৰল।

ওৱা প্ৰ্যান কৱেছে আগামী সঞ্চাহে হানিমুনে যাবে দেশেৰ বাইৱে।

প্ৰায় আধখণ্টাৰ বেশি হয়ে গেছে, এখনও কোনও খৰ নেই আৰিৰ। ফোনটা এখনও বৰ্জ। বগড়া-ৰাঁটিও তো ওদেৱ হয়নি! রাগ কৰে কোথাও চলে যাবাৰ কথা নয় আৰিৰ।

সাবিৰ ঠিক কৰল পুৱো ফ্লাট আবাৰ ভালভাৱে দেখবে। দেৱি না কৰে খুঁজতে শুৱ কৰল সাবিৰ। এক পৰ্যায়ে ওদেৱ বেড়ুমে এসে জিনিসটা চোখে পড়ল ওৱ।

একটা ভাজ কৰা কাগজ।

দেবেই বোৰা গেল, স্থলে কেউ রেখেছে খাটোৰ শিথানে।

পেপোৱওৱেটো সৱিয়ে কাগজটা হাতে নিল সাবিৰ।

আৰিৰ হাতে লেখা বেশ বড় চিঠি। কী এমন ঘটল যে এতবড় চিঠি লিখতে হবে, ঠিক মাথায় চুকল না সাবিৰেৰ। একটা ফোন কৰলেও তো হত।

চিঠিটা খুলে পড়তে শুৱ কৰল সাবিৰ। প্ৰথম লাইনটা পড়াৰ সাথে সাথেই যেন বাজ পড়ল ওৱ মাথায়। চিঠিৰ শুৱতে কোনও সমৰ্থন নেই। প্ৰথমেই লেখা, ‘নাইমকে মনে পঢ়ে? তোমাৰ প্ৰিয় বৰু নাইম?’

এই লাইনটাই সাবিৰেৰ সমস্ত অস্তিত্ব ঝোকি দেয়াৰ জন্ম যথেষ্ট।

হ্যা, নাইমকে ওৱ মনে আছে, খুব ভালভাৱেই মনে আছে, এবং বাকি জীৱন ওকে ভোলাৰ কোনও সুযোগই নেই।

ন্যাটো-কালেৱ দেন্ত' বলতে যা বোবায়, আক্ষৰিক অৰ্থে তা না হলেও নাইম এবং সাবিৰেৰ বক্সতু ছিল প্ৰগাঢ়, অস্তত একটা পৰ্যায় পৰ্যন্ত। ওদেৱ পৰিচয় কলেজৰ প্ৰথম দিনে। এৱপৰ বক্সতু। একটু একটু কৰে সেই বক্সতুৰে ব্যাণ্ডি কলেজ ছাড়িয়ে ভাৰ্সিটিৰ গতিপথত গিয়ে ঠেকে। একসাথেই পড়াশোনা শৈষ কৰে

ওরা । পারিবারিক দিক দিয়ে দু'জনের পরিবারই ছিল মোটামুটি সচল ।

আগে থেকেই প্রায়ন ছিল ওরা ব্যবসা করবে । সুতরাং পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ইন্টারডিভিউ দিতে গিয়ে জুতোর তলা ক্ষয় করার পেছনে সময় নষ্ট না করে দু'জনের পুঁজি এক করে একটা ব্যবসা দাঢ় করাল । এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা ।

প্রথম বছর ব্যবসায় বড় ধরনের শার খেয়েও হাল ছাড়িন ওরা ।

পুরুষকার হিসেবে দ্বিতীয় বছর থেকেই লাভের মুখ দেখা শুরু করাল ।

এর পরের বছরই শক্ত জমিনের উপর দাঁড়িয়ে গেল ওদের ব্যবসা । দু'জনেই ফ্ল্যাট কিনল, গাড়িও হলো ।

চলছিল ভালই ।

মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা একজন মানুষ যখন সম্পদের মুখ দেখে, একরকম দিশেহারা হয়ে পড়ে । ছেটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখে বড় হওয়া এই মানুষগুলো অধৰা স্বপ্ন হাতের মুঠোয় পূরতে গিয়ে হারিয়ে ফেলে অনেক কিছুই । যার মধ্যে অন্যতম হলো চরিত ।

সারিবরও ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল । ড্রিংকস, বার, জুয়ার যত ব্যাপারগুলোকে স্ট্যাণ্ডার্ড সোসাইটির যাপকাঠি ভেবে নিয়ে ‘জাতে ওঠার’ জন্য এগুলোকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে ।

নাস্তিম সবসময়ই এগুলো থেকে দূরে থেকেছে, আপাণ চেষ্টা করেছে সারিবরকে পথে আনবার জন্য ।

লাভ হয়নি ।

মাত্র তিন মাস আগে একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে নাস্তিম ।

জয়দেবপুরে একটা কাজে গিয়েছিল ওরা দুই বক্স । ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা গাছের সাথে গাড়ির প্রচণ্ড সংঘর্ষে নিহত হয়েছে নাস্তিম ।

স্পট ডেড ।

ড্রাইভ করছিল সারিবর । বড় ধরনের কোনও ক্ষতি না হলেও বেশ আহত হয় সারিবরও ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আঁধি কীভাবে নাস্তিমের কথা জানল?

নাস্তিমের মতুর পরই তো আঁধির সঙ্গে ওর পরিচয় ।

চিঠির বাকি অংশ পড়তে শুরু করল সারিবর ।

আঁধি লিখেছে: ‘অবাক হচ্ছ, তাই না? নাস্তিমকে আমি কীভাবে চিনলাম কিংবা তোমাদের বস্তুত্বের খবরই বা আমি কীভাবে জানলাম? তুমি বোধহয় জেনেছ, আমার এর আগেও বিয়ের কথা হয়েছিল, বিয়ের কয়েকদিন আগে আমার হ্বু বর রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় । হ্যা, ঠিকই ধরেছ, নাস্তিমই ছিল আমার সেই হ্বু বর । ও মারা যাবার দিন পনেরো আগে আমাদের এনগেজমেন্ট হয় । নাস্তিমের সাথে আমার পরিচয় মাত্র পনেরো দিনের হলেও ওই পনেরোটা দিনের জন্য আমি হাজার বছর অপেক্ষা করতে পারব । জানেই তো, ছেটবেলায় আমার নিজের মা মারা যান । এরপর বড় হয়েছি অনেক কষ্টে । সৎ-মা বাবার কান ভারী করে আমার প্রতি তাঁর মন বিষয়ে তুলেছিলেন । আমাকে দেখতে পারে না আমাদের বাড়ির কেউ । আজীবন ভালবাসা বৰ্ষিত আমি ওই পনেরোদিনে শেয়েছিলাম ভালবাসার এক অফুরন্ত আধাৰ ।

‘ওই ক’দিনে নাস্তিম চারবার ঢাকা থেকে ছুটে আসে নারায়ণগঞ্জে আমাদের বাড়িতে । মাকে বলে আমাকে নিয়ে বের হত । গল্প করতাম আমরা, দেখতাম স্বপ্ন । অস্তুর রংমাখা ছিল সেই স্বপ্নগুলো । ভালবাসা নিয়ে এত গল্প, কবিতা, গান কেন বচিত হয়েছে, আমি একটু একটু করে বুঝতে লাগলাম । মনে হত, বেঁচে থাকাটা তা হলে এত আনন্দে!

‘নাস্তিমের কাছেই তোমার সম্পর্কে জানি । আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বাইরে নাস্তিমের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল একটাই— সারিবর । সারাদিন তোমার কথা । আমি একদিন দ্যুর্মি করে বলেছিলাম, “এতদিন জানতাম, মেয়েরা মেয়েদের সতীন হয়, এখন দেখিছি তোমার এই বহুই আমার সতীন হবে ।” তোমার সাথে আমার দেখা হবার অনেক আগেই তোমাকে

আমি দেখেছি। নাইম সবসময় ওর মানিব্যাগে
তোমার ছবি রাখত। ওখান থেকেই
দেখেছিলাম। তবে তোমাকে সারপ্রাইজ দেবার
জন্য আমার কথা কিছু বলেনি তোমাকে।

‘নাইমের সান্নিধ্যে নিজেকে হারিয়ে যখন
জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে চাইছি, ঠিক তখনই
চলে গেল ও। উহু, তুল বললাম, চলে যাওয়ানি,
তুমি ওকে সরিয়ে দিয়েছ।’

এ পর্যন্ত এসে থামল সাবির।

পরিষ্কার বুঝতে পারছে এয়ারকুলারের
শীতল হাওয়া কপালে জমে ওঠা ঘামের বিরুদ্ধে
সুবিধা করতে পারছে না।

এটা কী লিখেছ আঁধি?

চৰম সত্যটা তা হলে জেনে ফেলেছে ও!

নাইম আর সাবির যখন ব্যবসা পুরু
করল, তখনই ওদের মাঝে একটা চুক্তি হয়।
ওদের কারও মৃত্যু হলে পুরো ব্যবসার মালিক
হবে অপরজন। আর একটা নির্দিষ্ট অংকের
টাকা প্রতি মাসে মুভের পরিবার পাবে।

সাবির ততদিনে রাতিনে গলা
পর্যন্ত ডুবে গেছে। জুয়া খেলেও প্রচুর দেশ
হয়েছে। কিন্তু নাইম হিসাবের বাইরে একটা
পয়সাও দিত না সাবিরকে। পাওনাদারদের
চাপে সাবির যখন দিশেহারা, তখনই ভয়ঙ্কর
প্ল্যান্টা মাথার খেলে গেল ওর।

নাইমের একটা অভ্যাস ছিল, নিজের
গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করত। কাউকে ড্রাইভিং
সিটে বসতে দিত না, এমনকী সাবিরকেও
নয়। অন্য কারও গাড়িতে উঠলেও সঙ্গে হলে
নিজেই চালাত। হয়তো কোনও ভীতি কাজ
করত ওর মধ্যে।

সেদিন ওরা দু'জন ব্যবসার কাজে
জয়দেবপুর যাওয়ার পর কেরার পথে এককরকম
জোর করেই সাবির ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ে।
প্রথমে অনেক বাধা দিলেও একপর্যায়ে
সাবিরকে চারিটা দিয়ে দেয় নাইম। কিছুদূর
আসার পরই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ শুরু করে
সাবির। প্রায় নকুই কিলোমিটার বেগে গাড়ি
ছুটিয়ে দেয় বড় একটা গাছের দিকে।
এমনভাবে, যেন গাছের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় পার্টির
বাঁ দিকের। নাইম সামনের বাঁ দিকেই
বসেছিল। অ্যাক্সিডেন্টের ফলে ড্যাশবোর্ডের

সঙ্গে মারাত্মকভাবে ঝুকে যায় ওর মাথা।
তৎক্ষণাত্মে মৃত্যু ঘটে নাইমের।

সাবিরও ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়েছিল। শুরুতর
আহত হলে মারাও যেতে পারত সাবির।

কিন্তু প্ল্যানটা ফুল প্রফ করতে এর বিকল্প
ছিল না।

নাইম মারা যাওয়ার পর পুরো ব্যবসার
একচক্র মালিক বনে গেল সাবির।

কেউ এতটুকু সন্দেহ করেনি।

কিন্তু আঁধি ব্যাপারটা জানল কীভাবে?

‘আবার চমকে দিয়েছি, তাই না?’ আঁধি
লিখেছে: ‘ভেবেছিলে পরম বন্ধুকে খুন করে
বেঁচে যাবে? তুমি হয়তো ঘুণাক্ষেত্রে ভাবতে
পারোনি তোমার নীচ মানসিকতা নাইম আগেই
টের পেয়েছিল। মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যাওয়া
মানুষ অনেক কিছুই বুঝতে পারে, যদিও
নিয়তির কাছে অসহায়তাবে আজস্রম্পর্ণ করা
ছাড়া কিছুই করার থাকে না। নাইম মারা
যাওয়ার দুইদিন আগে ওর সাথে আমার শেষ
দেখা হয়। সেদিন একেবারেই অন্যরকম
দেখেছিলাম ওকে। একপর্যায়ে আমাকে এমনই
ইঙ্গিত দিয়েছিল: ওর খুব কাছের একজন ওর
ক্ষতি করতে চাইছে। তখন আমল দিইনি
কথাটাতে। কিন্তু ওর মৃত্যু আবার সবকিছুই
গোড়া থেকে ভাবতে বাধ্য করেছে আমাকে।

জানতে পারি সেদিন তুমিই গাড়িটা ড্রাইভ
করছিলে, অথচ আঁধি জানি নাইম
কোনওভাবেই অন্যের হাতে নিজের গাড়ির
চাবি তুলে দেবে না। নিজেই সবসময় ড্রাইভ
করে। কিন্তু কী ঘটল? তুমি যেদিন ড্রাইভ
করলে অ্যাক্সিডেন্ট সেদিনই হলো। এতটা
কাকতালীয় ঘটনা সাধারণত ঘটে নাঁ। নাইমের
বলা সেই কথাতলো মুহূর্তেই অর্থবহ হয়ে উঠল
আমার কাছে। ব্যস, দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে
কোনও সমস্যাই হলো না। এরপর নাইমের
মৃত্যুতে তুমি পুরো ব্যবসার মালিক বনে
যাওয়ার পরও সামান্যতম সন্দেহ থাকে।

‘ওর মৃত্যু আমার জন্য কত বড় আঘাত,
তা ব্যাখ্যা করার মত ক্ষমতা আমার নেই। ধৰী
আমাইকে হারিয়ে শা-বাবার অবস্থা তখন
তৈরৈব। তাদের সমস্ত রাগ জ্ঞা হলো আমার
ওপর। সব দোষ যেন আমারই। অত্যাচারের

মাত্রাও বেড়ে গেল কয়েকগুণ।

‘এমন পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ মেয়েই আত্মহত্যা করে। আমিও সে পথটাই বেছে নিতে চেয়েছিলাম। তখনই মনে হলো, আমি আত্মহত্যা করলে কার কী লাভ? না নাস্তিষ্ঠের আজ্ঞা শান্তি পাবে, না আমার প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়া হবে— না তোমার অপরাধের শান্তি দেয়া হবে। প্রমাণহীন আমি একা এক মেয়ে কীভাবে তোমার মত পিশাচের সাথে আইনী লড়াইয়ে নামব? তাই বলে ছেড়ে দেব তোমাকে? বন্ধুকে খুন করেও পার পেয়ে গিয়ে তাৰ সম্পদ ভোগ কৰবে আজীবন? আল্লাহর দুনিয়া এতটা নির্মম নয়।

ঠিক করলাম তোমার মৃত্যুদণ্ড আমিই দেব, তবে মৃত্যুটা হবে ভয়ঙ্কর, একটু একটু করে। নাস্তিষ্ঠের সাথে আমার এনগেজমেন্ট হয়েছিল তোমাদের অফিসের এক কর্মচারীর মাধ্যমে। তিনি আমাদের বাড়ির পাশেই থাকেন। আমাকে খুব মেহ করেন। নাস্তিষ্ঠের মৃত্যুর পর একদিন তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, তোমাকে যেন একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসেন। আমার বিশ্বাস ছিল আমাকে দেখলে তোমার পছন্দ হবেই। হলোও তাই। বিয়ে হয়ে গেল আমাদের। বিয়ের পর একটা মাস তোমাকে ভালবাসার অভিনয় করে গেলাম।

ঘৰন বুৰুলাম আমার প্ৰেমে পুৱোপুৱি মজে গেছ, তখন কাজ শুরু কৰলাম। আমার কাজ শেষ। আমি চলে যাচ্ছি। এখন তুমি তোমার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব কৰো ভালবাসার মানুষকে হারিয়ে ফেললে কতটা শূন্য মনে হয় নিজেকে। যে শূন্যতায় তুমি আমাকে ডুবিয়েছিলে, আজ আমি তোমাকে সেই শূন্যতা উপহার দিলাম। আমার প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়া হলো। কিন্তু নাস্তিষ্ঠের রক্ষণ তো বুঢ়া যেতে পারে না, সে ব্যবস্থাও হয়েছে। আমি আজ চলে যাচ্ছি। আমাকে যোজার কোনও চেষ্টা কোরো না। অবশ্য চিন্টিটা শেষ কৰার পর এমনিতেও তোমার সে

ইচ্ছা থাকবে না।’

এ পর্যন্ত পড়ে বাকিটুকু পড়াৰ সাহস অৰ্জন কৰতে পাৰল না সাৰ্বিব। সমস্ত শ্ৰীৱ থৰথৰ কৰে কাঁপছে ওৱ। ইই চিন্টিটা পড়াৰ আগ পৰ্যন্ত নাস্তিষ্ঠেৰ মৃত্যুৰ জন্য কোনও অপৰাধবোধ কাজ কৰেনি ওৱ মধ্যে। কিন্তু আৰ্থিব লেখা প্রতিটা শব্দ ওকে মনে কৰিয়ে দিচ্ছে, ও এক কোন্ত ব্লাডেড মার্ডারার ছাড়া আৱ কিছুই নয়। আমানুষ মনে হচ্ছে নিজেকে ওৱ। সেই সঙ্গে এটোও উপলব্ধি কৰছে, কতটা ভালবেসে ফেলেছিল আৰ্থিকে। বিয়েৰ পৰ শুধু আৰ্থিব প্ৰতি ওৱ ভালবাসাকে সম্ভল কৰে সব ধৰাপ অভ্যাস আস্তে আস্তে ছাড়তে শুৰু কৰেছিল সাৰ্বিব। সেই আৰ্থিই... উপযুক্ত প্রতিশোধই নিয়েছে মেয়েটা।

সাৰ্বিব জানে, চিঠিৰ শৈষটা ওৱ জন্য আৱও ভয়াবহতা নিয়ে অপেক্ষা কৰছে। ভয়ঙ্কৰ প্রতিশোধেৰ বাকি অংশটুকু কী হতে পাৱে তা সম্পর্কে কোনও ধাৰণাই নেই ওৱ।

সেটা নিছক মৃত্যুৰ চাইতেও আৱও বেশি কিছু হবে, এ ব্যাপারে নিচিত ও।

ওৱ সহজ মৃত্যু আৰ্থিকে সঞ্চষ্ট কৰবে না।

দীৰ্ঘবাস ফেলে তিঙ্গ সত্যটাৰ মুখোযুৰি হলো সাৰ্বিব। আবাৰও মন দিল ও চিঠিতে:

‘তোমাকে বলেছিলাম তোমার মৃত্যু হবে তিল তিল কৰে। নিজেকে ধৰ্মস কৰে হলোও আমি তা কৰতে পেৱোছি। যাৰয়াৰ আগে তোমাকে একটা উপহার দিয়ে গেলাম। কী সেটা— জানো? ইইচআইভি ইইডসেৰ জীবাণু! ওটা এখন আমার মাধ্যমে তোমার শৰীৱে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। বিদায়, সাৰ্বিব, বিদায়।’

আৰ্থিব দেহে কীভাবে প্ৰবেশ কৰেছিল ইইডসেৰ জীবাণু, তা জানে না সাৰ্বিব। হয়তো প্রতিশোধেৰ ভয়ঙ্কৰ নেশায় কাদৰে কাছে নিজেকে সমৰ্পণ কৰেছিল আৰ্থি! ও সব হারিয়ে কেড়ে নিয়েছে সাৰ্বিবেৰ সবই!

থৰথৰ কৰে কাঁপছে সাৰ্বিব, ধপ বসে পড়ল খাটে।



বাঁশ কাহিনি, ফেলু ছাত্রী ও রহস্যপত্রিকার পাঠক

হাফিজুর রহমান হাসান

কী লাগবে জানতে চাইলেন অন্দুলোক।
ছেলেটি জানাল, রহস্যপত্রিকা। 'রহস্যপত্রিকা'!
কথাটি শনে কৌতৃহলী হলাম বৈকী!

এক

আমার এক ছাত্র ছিল রকি। তার একটি নিত্যসঙ্গী। বর্তমানে ক্লাস টেনের ছাত্র সে। তবুও তার নিত্যসঙ্গী সেই বাঁশ। ত্তীয় শ্রেণী থেকে বাঁশটা তার সাথে আছে। ও যখন ঘরে একা থাকে, তখন সে ওই বাঁশ নিয়ে খেলে। বদুক বানিয়ে গুলি করে, তলোয়ার বানিয়ে ফাইট করে, বউ বানিয়ে কাছে নিয়ে শয়ে থাকে!

কখনও সে ওই বাঁশ কাছ ছাড়া করে না।
বাঁশ না পেলে সে প্রায় পাগলের মত হয়ে
যায়!

ওর মা একবার বাঁশটি পোড়ানোর জন্য
নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন রকি কেঁদে কেঁটে বাঁশটি
মাথায় তুলেছিল। বলতে গেলে প্রায় পাগলই
হয়ে যেতে বসেছিল।

এমনিতে সে ছাত্র খুবই ভাল। কিন্তু বাঁশ
ছাড়া অচল।

ঘরে বসে যে কোনও কাজ করতে বাঁশটি
তার পাশে চাই-ই চাই। ওই বাঁশটি না পেলে
সে কোনও কাজ করতে রাজি নয়।

এজন্য রকির মা প্রায়ই তাকে রাগ করে
বলেন, তার ছেলের তো আর মেয়ের দরকার
নেই, বাঁশের সাথেই তার বিয়ে দেবেন।

রকি মুক্তি মুক্তি হাসে।

তার মানে সে অরাজি নয়।

আমি রকির এই বাঁশের খবর পেলাম
আমার আরেক ছাত্র রকির চাচাতো ভাই
লিঙ্গের কাছ থেকে।

শনে তো প্রথমে বিশ্বাসই হতে চাইছিল
না।

রকিকে জিজ্ঞেস করেও সদৃশর পেলাম
না।

মনে খটকা লাগল।

লিওন আমাকে মিথ্যে বলবে কেন?

তা ছাড়া রকির সাথে তো তার কোনও
শত্রুতাও নেই।

কৌতৃহলী হয়ে পড়লাম।

ব্যাপারটা যাচাই করে দেখতে হয়।

গেলাম রকির আশুর কাছে, জিজেস
করতেই আস্টি জানালেন, ঘটনা সত্য।

আমি বাঁশটা দেখতে চাইলে আস্টি রাজি
হলেন।

কিন্তু বাগড়া দিল রকি।

সে কিছুতেই আমাকে বাঁশটা দেখতে
দিতে রাজি নয়।

কিন্তু ওর আপনি ধোপে টিকল না।

হাজার হোক, আমি ওর স্যর!

অবশ্যে রকির টৌত্র আপনি উপেক্ষা করে
দেখলাম সেই বিখ্যাত বাঁশ।

বাঁশটির দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই হাত, দেড় ইঞ্চির
মত ব্যাস।

দেখলাম ভালই।

সেই রকম তেলতেলে।

অথচ আস্টি জানালেন, রকি নাকি
কখনোই বাঁশে তেল ব্যবহার করেনি! অধিক
ব্যবহারেই নাকি বাঁশটা এমন তেলতেলে!

কথাটা শুনে কেমন যেন বিশ্বাস হতে
চাইল না।

তেল না দিয়ে শুধু ব্যবহারেই এত
তেলতেলে, অসম্ভব!

কী জানি বাপু, আবার হতেও পারে।

রাতে নাকি বউয়ের মত কোলে নিয়ে
শোয়, কত কিছুই না হতে পারে! নাকি বলেন
আপনারা?

তখনকার মত বিদেয় নিলাম আস্টির কাছ
থেকে। ভাবলাম, একদিন হয়তো এই বাঁশ
নিয়ে রকির বউয়ের সাথে আমেলা লাগবে
রকির।

এ লেখার সাথে বাঁশটির একটি ফটোগ্রাফ
পাঠাতে চেয়েছিলাম; কিন্তু রকির আপনির
কারণে তা সভ্য হয়নি।

দোয়া করি চিরকাল বেঁচে থাকুক রকির
বাঁশ!

দুই

এবার বলব আমার এক ছাত্রীর গল্প। না, ফেলু
ছাত্রীর গল্প। ভাবছেন রাম-রাম-রাম!

নিজ ছাত্রীকে ফেলু বলছি, তো আমারই
দূর্মায়!

ভাইরে, ফেলু কী আর সাধেই বলি?

এ মাল এমন এক চিজ, শুধু ফেলু বললে
বৰং কঢ়ই বলা হয়।

এর উপর শুধু আমি কেন, ওর বাবা-মা-
আজ্ঞায়-বজন-পাড়া প্রতিবেশী-সক্রাই বিৱৰণ;
তিতিবিৱৰণ।

ওর বাপ-মা এত বিৱৰণ যে। ওর মাৰ
নাম দিবা। তাৰ স্বামীৰ কাছে একজন বোকা-
শোকা মহিলা হিসেবেই বেশি গ্ৰহণযোগ্য
তিনি।

আমি বলি, দিবা আপা।

একদিন চৰম রাগে বিৱৰণ হয়ে বলল,
‘স্যুৰ, আপনে এত লোককে নিয়ে গল্প লেখেন,
আপনার ফেলু ছাত্রীকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে
পারেন না!’

ছাত্রীৰ মায়েৰ এমন অগ্ৰিশৰ্মা মূৰ্তি দেখে
আমি তো একদম থ!

বলে কী মহিলা!

এতই সহজ!

এমনভাৱে বলছে যেন লেখাটা বাজারে
বিকোনো কোনও পণ্ডিতব্য, বললাম আৰ পয়সা
দিয়ে কিনে আনলাম। তা ছাড়া, আমি এমন
কেৱল লেখকও না। তেমন লিখতে পাৰি না
বলে কলম প্ৰায় ধৰি না বললেই চলে। আৱ
লিখলেও যে ছাপা হবে, তাৰ কোনও
নিচয়তা নেই।

সেই আমাৰ কাছে এমন বায়না!

মায়াৰ বাড়িৰ আবদার আৱকী!

কবে হয়তো কথাৰ ছলে বলেছিলাম যে
আমি দুই-এক কলম লিখতে পাৰি, তাতই কি
না তাৰ এমন ধাৰণা হয়েছে!

আমি তৃতীলয়ে বললাম, ‘আপা, এ
আপনি কী বলছেন? আসলে আপনি যা
ভাৱছেন, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আমি তেমন
লিখক তো নই, তা ছাড়া নিজেৰ ছাত্রীকে নিয়ে
এসব লিখলে মান-সমান কী আৱ
থাকবে? এ ছাড়া আপনার মেয়েৰ কী হবে?
তাকে নিয়ে লেখাটা পড়লে লোকে কী বলবে?
আৱ লিখলেই যে ছাপা হবে এমনও নিচয়তা
নেই।’

‘যে যা বলে বলুক, আপনে লেখবেন কি
না তাই বলেন? মেয়েটোৱে একটা শিক্ষা হওয়া
দৰকাৰ। যাতে লজ্জা হয়, লেখাপড়াটা ঠিকমত

করে। বেহায়া মেয়ে। এমনি বলে বলে তো
কথা শোনাতে পারলাম না, এভাবে যদি কাজ
হয়।'

মজার ব্যাপার হলো কী, মেয়ের
লেখাপড়া ঠিক মত না হওয়ার পিছনে কিন্তু
মহিলাও অনেকাংশ দায়ী।

একটা ঘটনা বললে ব্যাপারটা ক্লিয়ার
হবে।

গতবছর রাঙ্গা ২য় পত্র পরীক্ষার রাতে
মহিলা নিজে তার মেয়েকে নিয়ে স্টার জলসায়
সিরিয়াল দেখেছিলেন।

পরদিন পরীক্ষা।

সকালে পড়াতে শিয়ে দেখি কোনও প্রশ্নই
কমপ্লিট না।

কারণ অনুসন্ধান করতেই জানতে
পারলাম, মায়ের এই কীভূতির কথা!

যেখানে যা-ই এমন অসচেতন, সেখানে
মেয়ের কথা আর কী বলব!

তো যা বলছিলাম, আমি কাঁচুমাচু হয়ে
বললাম, 'আপা, যা বলছেন বুঝে বলছেন তো?
ভাবুন, পরে আফসোস করে কিন্তু শাড হবে
না।'

'হ্যাঁ, ভেবেই বলছি,' প্রায় চেতে উঠলেন
মহিলা। 'আপনাকে যা বলছি করবেন কি না
বলেন? আপনের ছাত্রীর শিক্ষা হওয়া দরকার।'

একটু চিন্তা করে দেখলাম, যা যখন
বলছে আর লিখলে ছাত্রীরও যদি শিক্ষা হয়,
দোষ কী!

তা হলে গিবিই না।

আমার মত ছোটখাট লেখকের আবার
প্লটেরও অভাব'কি না!

দিবা আপাকে বললাম, 'ঠিক আছে,
লিখব, তবে ছাপা হবে কি না, এ নিচ্যতা
দিতে পারব না।'

'ভাল করে লিখবেন যাতে ছাপা হয়,'
ছাত্রীর মায়ের উত্তর।

ফোস করে শ্বাস ছাড়লাম, 'আচ্ছা।'

'লেখা ছাপা হলে দেখাবেন, পড়ে
শোনাবেন।'

'ঠিক আছে।' এই হলো এ লেখার
ইতিহাস।

ছাত্রীর নাম সাউজিয়া আলম। ডাক নাম

ইত্বা। সেই ক্লাস থ্রি থেকে ওকে পড়াচ্ছি।
তখন থেকেই দেখছি এই মেয়ের পড়ার প্রতি
ভীম অনীশ। কোলকাতার টালিগঞ্জ সিনেমার
নায়ক দেব ভক্ত ছাত্রী একদমই পড়তে চায়
না। চরম ফাঁকিবাজ বলতে যা বোঝায় এ ঠিক
তাই।

দিন-রাত চবিশ ঘণ্টা কখনোই বই নিয়ে
বসার নায়িক পর্যন্ত করে না। সারাক্ষণ থালি
দেবের ছবি আর দেবের গান। উঠতে দেব
বসতে দেব, শেতে দেব পড়তে দেব, শুতে
দেব, ঘুমাতে দেব, গোসল করতে দেব।
এমনকী টয়লেটেও দেব!

সব কিছুতে শুধু দেব-দেব আর দেব!

দেব নাকি রাতে ওর কাছে আসে!

দেব ওকে বিয়ে করবে।

নায়ক দেব ছাড়া নাকি ও কাউকে বিয়েই
করবে না!

বুরুন ঠেলা!

প্রত্যেক সাময়িক পরীক্ষায় কোনও না
কোনও বিষয়ে ফেল এর থাকতই।

বেন যে খারাপ, তা কিন্তু নয়।

আসলে পড়তই না।

অবশ্য পড়বেই বা কী, ওর সব কিছুতেই
থালি দেব আর দেব।

চোখ বুজলেই ইত্বা দেবে দেবকে, চোখ
মেললেই পয় আরও কাছে।

দেব ভক্ত ইত্বাকে পরীক্ষার ব্যাপারে কেউ
কিছু বললেই বলত: 'অনেকেই তো ফেল করে,
আমি ফেল করলে কী হয়?'

বুরুন, এই যখন চিন্তা-ভাবনা, তাকে
আপনি পাশ করাবেন কীভাবে?

ইত্বার আশ্মা ও ছিল ওই কিসিমেরই
মহিলা।

মহিলা চাইতেন মেয়ে পরীক্ষায় পাশ
করুক, কিন্তু আদতে তিনি নিজেও ছিলেন
মেয়ের পড়ালেখার ব্যাপারে চরম উদাসীন।
যুখে বড় বড় কথা বললেও মেয়ের লেখাপড়ার
দায় তার উপরও অনেকাংশেই বর্তায়। বলতে
গেলে চরম তীতু এই মহিলাও মেয়ের পড়ার
অনেক ক্ষতি করে থাকেন।

ওই যে বললাম, মেয়েকে পড়ায় উৎসাহ
না দেখিয়ে উল্টো নিজেই পরীক্ষার রাতে সঙ্গে

নিয়ে সিরিয়াল দেখেন।

এ ছাড়া, আমি ইতার পড়ার ব্যাপারে ওর চাকরিজীবী বাবার কাছে কোনও অভিযোগ করলেও মা যুক্তি করে কথনেই শ্বাসীর কাছে তা বলত না।

পরে আমি জিজেস করলে ইনিয়ে-বিনিয়ে এ কথা সে কথা বলে এড়িয়ে যেত। উচ্চট ক্যারেষ্টার এই মা-মেয়ের।

আমার সাত বছরের টিউশনির অভিজ্ঞতায় এরকম কোথাও কথনও দেখিনি।

অথচ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোলে দিবা আপার মুখেই ধাকত উল্টো সূর। 'কী ছাত্রী, খালি ফেল করো! মনে হয় ওর রেজাল্ট আমি পা দিয়ে পাড়ই। সবার ছেলে-মেয়ে পাশ করে আর আমার মেয়ে করে ফেল! একটাই মেয়ে, কোথায় ভাল করে পড়বে...' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলাই বাহ্য্য, ইতার ফেলু নামটিও তারই দেয়া!

ছাত্রী ফেল করলে আমারও যে দোষ হয় না, তা কিন্তু নয়।

বরং প্রথম বছর যখন পড়াতে গেলাম, সব দোষ তো আমারই হলো। আমিও দায় নিয়ে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাইলাম; কিন্তু ইতার বাবার আমার বিরক্তে কোনও অভিযোগ ছিল না। তা ছাড়া, তিনি মেয়ে-পঞ্জীয় স্বত্ব খুব ভালই জানতেন। ইতার আশ্চর্য আমাকে আরেকবার চেষ্টা করতে বললেন।

সেই থেকে প্রত্যেক বছর এক, দুই বিষয়ে ফেল করে বিবেচনায় পাশ করে ক্লাসে উঠছে ইতা, আর আমাকেও বিবেচনা করে আরেকবার চেষ্টা করার অনুরোধের টেকি শিল্পতে হচ্ছে।

প্রত্যেক সাময়িক পরীক্ষার পর ইতার আবু ছাত্রীর ফেল রেজাল্ট দেখে বিরক্ত হয়ে পড়ানো স্থগিত রাখতে চাইলে শুরু হত ইতার নাটক।

সে কী নাকি কান্না!

স্কুল হয়েছে, এবার থেকে আর এমন হবে না... যান তেন সাত সতেরো ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আমি তো জানি, এ আবার সেই পুরানো নাটক।

গত পাঁচটা বছর ধরে এই তো দেখছি।

এতে বাপ-মায়ের মন গলবে, তারপর ছাত্রী থাকবে সেই তাদের মতই। পড়াশোনার ধার দিয়েও যাবে না।

এই নাটক করে আমার ছাত্রী পথতে শ্রেণী পাশ না করেও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল!

এখন এই ফেলু অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী।

তার ধারণা JSC-তে সে ই প্রেত পাবে; কিন্তু আমার ধারণা অমন পড়লে আরেক বছর ওর এইটৈই থাকা নিশ্চিত।

এরকম ছাত্রী পড়ালে শিক্ষকের দুর্বাম হয়। ছেড়ে দিতে চাই; ওরা ছাড়ে না।

আমার পড়া বোঝাতে বা ওর বুঝতে কোনও সমস্যা নেই।

আর একজন শিক্ষকের অধান কাজ তো পড়া বুঝিয়ে দেয়াই!

কিন্তু পড়তে তো হবে স্টুডেন্টদেরই।

স্যার কি আর পড়া মুখস্থ করে দেবে?

আর বাড়িতে গার্ড দেয়ার দায়িত্ব তো অভিভাবকদের।

ইতা যদি ঠিকমত লেখাপড়া করে, আমার বিষয়স শুধু পাশ কেন ভাল রেজাল্টই করতে পারবে সে।

এখন এই লেখাটা পড়ে যদি সংশোধন হয় ও!

তিনি

রহস্যপত্রিকা ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সংখ্যাটি কেনার জন্য বেশ আগেভাগেই অর্ধীৎ ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখেই পাবনা শহরের র.প. এজেন্ট ইসলাম ব্রাদার্সে গিয়ে হাজির হলাম। র.প. ফেব্রুয়ারি ২০১৩ অবশ্য ঢাকা থেকে আরও একদিন আগে প্রকাশ পাওয়ার কথা। কিন্তু প্রিয় পত্রিকাটি ঢাকে আসায় পাবনার মত জেলা শহরগুলোতে আরও দূরেক দিন বেশি লাগে।

আমি ২৮ তারিখ থেকেই খোঁজ-খবর শুরু করে দিই। কপাল ভাল হলো মাঝে মধ্যে ওই তারিখে পেয়েও যাই। নিরাশ হতে হলো আমাকে-পত্রিকা আসেনি।

পরদিন ২৯ তারিখ।

আবার গেলাম।

ইসলাম ব্রাদার্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, দোকানিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অপেক্ষা

করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ইতোমধ্যে আরেকজন লোক... ঠিক লোক না, এক তরুণ এল। আমার যতই দোকানদারকে না পেয়ে এন্ডি-ওডিক চাইতে লাগল। কৌতুহলবশত ছেলেটাকে লক্ষ করতে লাগলাম আমি।

বলে রাখা ভাল, আমি দোকান থেকে একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং ইসলাম ব্রাদার্স পত্রিকার দোকানের অপযিটৈই তার বড় ভাই ইসলাম ইলেক্ট্রনিক্সের দোকান। ছেট ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে মাঝে মধ্যে ইনিও কাস্টমারদের চাহিদা মিটিয়ে থাকেন।

ছেলেটাকে উকি-বুকি মারতে দেখে কী লাগবে জানতে চাইলেন ভদ্রলোক।

ছেলেটি জানাল, রহস্যপত্রিকা।

'রহস্যপত্রিকা!' কথাটা শুনে একটু কৌতুহলী হলাম বৈকী!

অবাক বিশ্ময়ে এবার ভাল করে তাকালাম ছেলেটির দিকে।

সাইকেলের উপর থাকায় উচ্চতা টের পাওয়া যাচ্ছে না, তবে বয়স আন্দাজ অঠারো-ডিনিশ। লাঘতে মুখমঙ্গল; গায়ের রং শ্যামল। সম্ভবত কলেজে টলেজে পড়ে। ছেলেটির প্রশ্নের জবাবে দোকানির বড় ভাই বললেন, 'এখনি আসে? কেবল আজ ২৯ তারিখ। ২-৩ তারিখে আসো।'

শুনে হতাশ হলো ছেলেটি। বলল, 'গতমাসে ৩ তারিখে এসে পত্রিকা পাইনি; শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই এইমাসে আগে আগে এসেছি।'

কথা শুনে বুঝলাম, ছেলেটি সম্ভবত র.প.-এর নতুন পাঠক এবং সম্ভবত এই শহরেও নতুন। তাই র.প. কবে প্রকাশ পায় এবং কবে নাপাদ আসে, এ সম্পর্কে ধারণা কম। এ-ও বুঝলাম, পাবনা শহরে ইসলাম ব্রাদার্স বাদেও যে জাহান বুক স্টল, বিকিকিনি মার্টসহ আরও বেশ কয়েকটা দোকানেও র.প. পাওয়া যায়, এ ব্যাপারে সে অজ্ঞ।

তাই সুযোগ থাকা সম্ভেদে সে গত মাসের র.প.টা সংগ্রহ করতে পারেনি।

ছেলেটির শেষ কথার কোনও জবাব দিলেন না ইসলাম ইলেক্ট্রনিক্সের কর্ণধার।

ব্যাখ্যিত মনে সাইকেল ঘূরিয়ে ছেলেটি

চলে যেতে উদ্যোগী হলো।

আমার মনে হলো ছেলেটিকে ডাক দিয়ে পাবনা শহরে আরও কোথায় কোথায় র.প. পাওয়া যায়, এ সম্পর্কে বলি এবং আরও দুয়েকটা তথ্য দিই। ওর সম্পর্কেও কৌতুহল হচ্ছিল। কবে থেকে র.প. পড়ে, বাড়ি কোথায় ইত্যাদি। এ ছাড়া দোকানির বড় ভাই তাকে ভুল তথ্য দিয়েছেন। আমার ধারণা ভুল না হলে, র.প. আগামীকাল অর্থাৎ ৩০ তারিখেই আসবে। এরকমই হয়। ২৭, ২৮ মে তারিখেই প্রকাশ পাক, কোনও গওগোল না হলে পাবনা শহরে র.প. সাধারণত ৩০ তারিখের মধ্যেই চলে আসে।

পরে অবশ্য তাই হয়েছিল।

আমি পরদিন ৩০ তারিখে গিয়েই ফেরুয়ারি '১৩ সংখ্যাটা সংগ্রহ করি।

এই তথ্যটা জানানোর জন্য হলো তাকে আমার ডাকা উচিত ছিল। ছেলেটি হয়তো ২-৩ তারিখে এসে ওই সংখ্যাটাও মিস করবে। কেননা পাবনা শহরে ইসলাম ব্রাদার্স একটি পরিচিত পত্রিকা স্টল হওয়ায় এখানে র.প. আনার দুয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু লাজুক মুখচোরা এই আমি ডাকতে পারলাম কই ছেলেটাকে!

সাইকেল ঘূরিয়ে সে চলে যেতে উদ্যত হতেই নিজের ব্যর্থতার জন্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৌতুহল দমাতে না পেরে পিছু নিলাম তার। দেখি তো কোথায় যায়!

অনেক দূর থেকে অনুসরণ করায় ব্যাপারটা টের পেল না ও।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর পাবনা শহরের একটা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কেচিং-এ প্রবেশ করল ছেলেটা।

হঠাতে ভীষণ মন-খারাপ লাগল আমার।

র.প.-এ একজন পুরানো পাঠক হওয়া সম্ভেদে ছেলেটির জন্যে কিছু করতে পারলাম না, এই ভেবে।

লজ্জিত মন নিয়েই নিজের সাইকেলটা ঘূরিয়ে নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম।

এই সেখাটার মাধ্যমে সেই পাঠককে বলতে চাই, I am sorry. ক্ষমা করো হে বুঝু, আমার এই অক্ষমতাকে! ■

ଚା-ବାଗାନେର ଫୁଲ ସମନଭାଗ ଲେକ

ଦିଗନ୍ତ ସୌରଭ

ସମନଭାଗ ଲେକେର କାହେ ଯେତେ ପା ବାଡ଼ିଲାମ, ତଥନଇ ଚୋଖେ ପଡ଼ିଲ ସୋନାଲି ରଙ୍ଗେ
ଚମ୍ରକାର ଆରେକଟି ଫୁଲ, ଯାର ମୁଖ୍ୟ ଛଡ଼ିଯେ ଆହେ ଚାରାଦିକେ ।

ଚାକା ଥେକେ ଆମି ଏବଂ ନିସଗ୍ନୀ ମୋକାରମ ହୋମେନ, ଦୁଃଜନ ମିଳେ ରାତର ଉପବନ ଟ୍ରେନେ ରାତନ ହଲାମ ଗତବ୍ୟ ଲକ୍ଷ କରେ । ସାରାରାତ ଜାରି କରେ କାକ ଡାକ ଡେରେ ନାମଲାମ କୁଲାଡ଼ିଆ ସେଟଶିଳେ । ସେଥାନ ଥେକେ ସିଏନଜି ନିଯେ ବଡ଼ଲେଖାୟ ଗିଯେ ଆଗେ ଥେକେ ଠିକ କରା ହେଟୋଲେ ଉଠି ବ୍ୟାଗପତ୍ର ରେଖେ ଝଟପଟ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ରାତନ ଦିଲାମ ସମନଭାଗ-ଏର ଉଦ୍ଦେଶେ । ପ୍ରଥମେ ସିଏନଜିତେ ଦକ୍ଷିଣଭାଗ ଗେଲାମ । ସେଥାନେ ନାତ୍ରା ସେରେ ଆବାର କଲାଜୁରା ବାଜାରେ । ଏଥାନ ଥେକେ ରାତ୍ରା ଖୁବ ଭାଲ ନା । କୋନ୍‌ଓରକମେ ରିକଶାଯ ଯାତାଯାତ କରତେ ହେଁ । ଏକଟା ରିକଶା ଠିକ କରେ ଆବାର ଯେତେ ଥାକଲାମ । ପାକା, ଆଧା-ପାକା ତାରପର କିଛିଟା ଚା ବାଗାନ ଏଲାକାର ପଥ ଦିଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକଟା ଗେଟେର ସାମନେ ଆସାର ପର ଡ୍ରାଇଭାରକେ ଭାଡ଼ା ଯିଟିଯେ ପାଯେ ହାଟିତେ ଶୁରୁ କରଲାମ । ଯାଓସାର ପଥେ ମୋକାରମ ଭାଇ ଆମାକେ ବଲନେନ, ଯେଭାବେଇ ହୋକ ଚା-ଏର ଫୁଲେର ଛବି ତୁଳତେ ହେଁ । କାହାକାହି ଖୋଜାଯୁଜି କରେ

ଏକଟା ଗାହେ ଫୁଲ ପେଯେ ଗେଲାମ । ମୋକାରମ ଭାଇ ତୋ ଫୁଲ ଦେଖେ ଭୀଷଣ ଖୁଣି । ଠିକଠାକ ମତ ଲେଖ ସେଟାପ କରେ ଦୁଃଜନେ ମିଳେ ବେଶକିଛ ଛବି ତୁଲାମ । ତାରପର ଚା-ବାଗାନେର ଏକଦମ ଭିତର ଦିଯେ ଚଲାମ । ଏବାର ଆମରା ଆରେକଟି ଫୁଲେର ଦେଖା ପେଲାମ । ଆମି ଓ ମୋକାରମ ଭାଇ ଦୁଃଜନେଇ ଭାବଲାମ, ଏଟା ତୋ ନିଶ୍ଚଯ ବକଫୁଲ । କିନ୍ତୁ ଫୁଲେର ପାପଡ଼ି ହାତେ ନିଯେ ବୋବା ଗେଲ, ଏଟା ବକଫୁଲ ନୟ, ଅନ୍ୟ କୋନ୍‌ଓ ଫୁଲ । ହାନୀଯ ଚା-ବାଗାନେର ପାହାରାଦାରେର କାହେ ଥେକେ ଜାନା ଗେଲ, ଏଇ ଫୁଲେର ନାମ 'ମେଡଲା' । ଚା-ବାଗାନେର ଭେତର କରେକ ଫୁଟ ଦୂରେ ଦୂରେ ଏଇ ଗାହ ଲାଗାନୋ ହୟ ।

ତାର କାରଣ, ଏଇ ଗାହେର ମୂଳ ଓ ଶାଖା-ମୂଳ ମାଟିତେ ପାନି ଧରେ ରାଖତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତାଇ ଚା-ବାଗାନଶିଳେତେ ଏହି ଫୁଲ ଲାଗାନୋ ହୟ । ଚା-ବାଗାନେର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ଗିଯେ ଖାଦେର ମତ ଏକଟା ଜାୟଗା ପାପଡ଼ି ଦିଯେ ପେଲାମ ଏକଟି ଛୋଟ ଲେକ । ଲେକେ କିଛି ଶାପଲା ଫୁଲ ଫୁଟେ ଆହେ । ସେଥାନ ଥେକେ ସମନଭାଗ ଲେକେର କାହେ

ଶାଓନ ବହି ସର

ପ୍ରୋ: ଶାହିନ ଶେଖର

ବି. ଏ କଲେଜ ରୋଡ, ସିରାଜଗାର୍ଜି

ସିରାଜଗାର୍ଜି ଜେଲ୍ ଶହରେ ଏକମାତ୍ର ପରିବେଶକ

ସେବା ଏକାଶନାର ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ବହି ପାଉରୀ ଯାଇ ।

ମୋବାଇଲ୍: ୦୧୭୧୦୭୨୦୮୮୦, ୦୧୬୭୦୭୮୭୮୫୧, ୦୧୯୧୨୯୪୫୫୧୭

প্রকাশিত হয়েছে কিশোর ক্লাসিক দুটি বই একত্রে চিল্ড্রেন অভ দ্য নিউ ফরেস্ট

ক্যাটেন ম্যারিয়াট/নিয়াজ মোরশেদ
গৃহসুন্দ চলছে ইংল্যাণ্ড। রাউওহেডদের হাতে
বন্দি রাজা চার্লস পালানেন হ্যাস্পটন কোর্ট
দুর্গ থেকে। ভার খোঁজে আশপাশের এলাকা,
বিশেষ করে নিউ ফরেস্ট জঙ্গল, চমে ফেলন
সৈনিকরা। আগুন ধরিবে দিল রাজার সমর্থক
যুদ্ধে নিহত কর্নেল বিভারলির বিশাল
বাড়িটায়। একবারও ভাবল না ফুলের মত
নিষ্পাপ বাচ্চাগুলোর কথা। কী হলো ওদের?

বু লেগুন

এইচ দ্য ভের স্ট্যাকপোল/মায়নুন শফিক:
ছেট্ট দুটি ছেলেয়ের কাহিনি। সাগরভ্রমণে
বেরিয়েছিলেন লেন্টেন্জ। মাঝ-সমুদ্রে আগুন
ধরে গেল জাহাজে। তিনি নৌকায় উঠল
যাত্রী ও নাবিক। কিন্তু ছেট্ট ডিপিটা ছেলে
ডিক, ভাইবি এমেলিন ও বুড়ো নাবিক
বাটনকে নিয়ে হারিয়ে গেল ঘন কুয়াশায়।
পাগলপারা হয়ে গেছেন লেন্টেন্জ। গোটা
দুনিয়াটা চমে ফেলছেন তিনি ওদের খোঁজে।

কিন্তু কেখায় ওরা?

দাম ■ আটান্তুর টাকা সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০



যাবার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। তখনই চোখে
পড়ল সোনালি রঙের চমৎকার আরেকটি
ফুল, যার সুআগ ছড়িয়ে আছে চারদিকে।
যেটাকে মোকাররম ভাই নাম দিয়েছিলেন:
'পাথারিয়ার সোনার ফুল'।

লেকের পথে হাঁটতে হাঁটতে প্রচণ্ড তৃষ্ণা
পেল। এদিকে আমাদের সাথে যে বোতলটি
ছিল, তা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।
হানীয় এক সাঁওতাল বাড়িতে গিয়ে পানি
চাওয়া মাঝেই বিনয়া এক মহিলা বালতি দিয়ে
কৃপ থেকে পানি তুলে আমাদের দিলেন।
তখন আমরা লেকের প্রায় কাছাকাছি চলে
এসেছি। পাহাড়সম বিশাল একটি চা-
বাগানের টিলা পাড়ি দিয়ে কাঞ্চিত সেই
সমনভাগ লেকের দেখা পেলাম। চারদিকে
চা-বাগান বেষ্টিত এই লেকের সৌন্দর্যে
আমরা হারিয়ে গেলাম। সবুজে স্নিফ এই
প্রকৃতি। লেকে অনেক শাপলার গাছ। বর্ষা ও
হেমন্তে ফুলে তরপুর থাকে পুরো লেক। চা-
বাগানের ছায়ায় গাছগুলোতে অনেক সাদা
বক বসে থাকতে দেখা গেল। লেকের এক
কোনায় দেখলাম পানকৌড়ির মাছ শিকারের
নিপুণ দৃশ্য। আসলেই চা-বাগান বেষ্টিত
নয়নাভিরাম এই লেকের সৌন্দর্য অন্যসব
লেক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ■

যাতায়াত

ঢাকা থেকে সমনভাগ লেকে যেতে হলে
প্রথমে বাসে অথবা ট্রেনে গিয়ে কুলাউড়ায়
নামতে হবে। সেখান থেকে দক্ষিণভাগ
নামের জায়গায় গিয়ে, কলাজুরায় যেতে
হবে। তারপর রিকশা অথবা পায়ে হেঁটে
গেলেই সমনভাগ। থাকার জন্য কুলাউড়া
অথবা বড়লেখায় অনেকগুলো মধ্যমযানের
ভাল হোটেল আছে। তা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ
তথ্য গাইডের প্রয়োজন হলে হানীয়
একটি ট্যুর অপারেটরের ০১৯৯৯৩০১৮৫
এই নামারে ফোন করে সহায়তা নিতে
পারেন।



১৯৭১- আমার দেখা সেসব দিন পারভীন আক্তার

পাক সেনারা ঘরে-ঘরে গিয়ে সে রাতে
যুন্মত মানুষকে ডেকে তুলে লাইন দিয়ে দাঁড়ি
করিয়ে গুলি করে মেরেছে।

আমার জন্ম পাকিস্তানে, ১৯৭১ সালে সেটা

ছিল পক্ষিয় পাকিস্তান। তখন পড়তাম
তৃতীয় শ্রেণীতে, বয়স আট-নয়।

বয়সের তুলনায় শ্রেণিপথে ছিল বেশি।

সেই দিনগুলো যেন চোখের সামনে ভাসে।

১৯৭১ সালে আমাদের বাসা ছিল
সমুদ্রবন্দর করাচিতে।

বাবা ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা।

সে সুজেই আমাদের পক্ষিস্তানে থাকা।

বাসার সামনে ছিল বিশাল মাঠ, সেখানে
সবসময় জনসভা হত।

সারাদিন বাস্তায় ছয়দফা, এগারো দফার
দাবিতে মিছিল হত।

আমরা ছোট ছোট ভাই-বোনরা জানালা
দিয়ে তা দেখতাম।

হট-হট করে কারফিউ ঘোষণা দেয়া হত।

মানুষ ঠিকমত বাজার করতে পারত না।

রাত্না হত কেরোসিন চুলায়।

কারফিউরের সময় পাশের বাসার প্রতিবেশী
চাচা ঘরে কোনও কেরোসিন ছিল না।

ছোট বাচ্চাকে কীভাবে যাওয়ানেন চিন্তায়
অঙ্গুর হয়ে গেলেন।

বাইরে যাওয়াই যাবে না, কী করবেন?

শেষে ঘরের চৌকি ভেঙে আগুন জ্বলে রাত্না
করলেন।

বাইরে বেরোতে পারত না কেউ।

যদি কেউ বাসার বাইরে বেরোত, তাকে
মুরগি বানানো হত।

মুরগি বানানো মানে বসা অবস্থায় হাত
হাটুর নিচে দিয়ে কান ধরা।

কী যুবক কী বৃক্ষ, সবার জন্যই ছিল এই
শাস্তি।

‘৭১ সালে আমাদের আত্মীয়-জ্বন
বাংলাদেশে চলে এলেন।

আকারার ঢাকরির জন্য আমরা আসতে
পারছিলাম না।

জানুয়ারি মাসে আমাদের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা
হয়ে যাওয়ার পর আকা ছুটি পেলেন বাংলাদেশে
বেড়াতে আসতে।

আমরা বেড়াতে এলাম।

তখনও জানতাম না আমাদের এই আসা
শেষ আসা।

জানুয়ারির ২৪ তারিখে আমরা বাংলাদেশে
এলাম।

বুর আনন্দ লেগেছিল ঢাচা, ফুফু, যামা
সবাইক কাছে পেয়ে।

যেকুন্যারি মাসে গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী

বেড়াতে গেলাম।

এক মাস ভালই কাটল।

এল ২৬শে মার্চ কালরাত্রি।

আমরা যেহেতু গ্রামে ছিলাম, তাই কিছু বুবালাম না।

কিন্তু দলে-দলে লোক এসে বলতে লাগল: ঢাকা শহরে মানুষ মেরে আর রাখেনি!

কেউ আমির হাত থেকে রেহাই পায়নি।

পাক সেনারা ঘরে-ঘরে গিয়ে সে রাতে ঘুমত মানুষকে ডেকে তুলে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে শুলি করে মেরেছে।

আমার ফুফু ও চাচা তখন ঢাকায় ছিলেন।

আমার দাদী খুব চিন্তিত ছিলেন তাদের জন্য।

আজ এই লেখা লিখছি আমার চাচাকে স্মরণ করে, যিনি চার বছর আগে আমাদের স্বাইকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন।

আমাদের ছেটেবলা পাকিস্তানে কেটেছে।

যত আবদার ছিল, এই চাচার কাছে।

উনি শিল্প ব্যাকের বড় কর্মকর্তা ছিলেন।

পাকিস্তানে বাস করেছেন অনেক বছর।

তাদের ব্যাকের ওই শাখার স্বাই ১৯৭১ সালে চলে আসছিল পাকিস্তান থেকে, ঠিক হয় একক্ষেত্রে রওনা হবেন, আমার চাচা ও তখন যুক্তক্ষীণ সময়ে আবাকাকে পাকিস্তান থেকে খবর দেয়া হলো: আবা যদি বদলি হংসে বাংলাদেশে যেতে চান, তবে এখনই যেন পাকিস্তান চলে আসেন।

তো আবা খবর পাওয়ার পর চলে গেলেন।

আমরা গ্রামে।

তখন রাতে কেউ ঘুমাতে পারত না, এই রুঁধি এল পাকিস্তানি সেনা।

তারা গ্রামকে গ্রাম জালিয়ে দিত।

আর মেয়েদেরকে নিয়ে যেতে ওদের ক্যাস্পে ধর্ষণ করতে।

আমাদের গ্রামে যারা বড় যেয়ে, বিয়ের উপযুক্ত, তাদেরকে পাট খেতে ঝুকিয়ে রাখা হত। কাউকে-কাউকে আবার মুখে কলি মেখে রাখা হত।

তখন মে মাস।

আমরা বাবা পাকিস্তানে, চাচা তখন ঢাকায়।

এমন একদিন চাচা গেলেন ফুফুকে দেখতে শুলশানে।

গিয়ে দেখলেন বোন তখন গেছেন গ্রামে।

চাচা গিয়েছিলেন বিকেলে, যেতে-যেতে রাত হয়ে গিয়েছিল।

চাচা সে রাতে আর ভয়ে বাসায় ফিরলেন না।

পরদিন সকালে আশপাশে যত মানুষ ছিল,

স্বাইকে পাক সেনারা শুলশান দেকের পাড়ে এক লাইনে এগারো 'শ' মানুষকে দাঁড় করাল শুলি করবার জন্য।

ওখান থেকে আমার চাচাকে সেনারা আলাদা করে নিয়ে গেল সেনাবাহিনীর বড় অফিসারের কাছে।

চাচাকে অফিসার বলল, 'তুমি যুক্তিবাহিনীর কমান্ডার, মুক্তি কই! আমাদের বলো, নতুন তোমাকে মেরে ফেলব!'।

চাচা যতবারই বলছে, 'আমি পাকিস্তানে এগারো বছর ছিলাম!'।

ওরা ততবারই বলছে, 'না, তুমি যুক্তিবাহিনী! মুক্তি কোথায়?'।

চাচার দিকে মেশিনগান তাক করল তারা। শুলিও করল, কিন্তু একটা শুলি বেরোল না।

এদিকে সে শুরূতে আমার দাদীর কাছে এক বুড়ি মত ফিরিব এসে বলেছিল, 'তুই আমাকে নামাজের শাড়ী দে, আমি নামাজ পড়ব'।

দাদী দুই ছেলের চিন্তায় অস্ত্রি, তাবলেন: যাক, একে নামাজের শাড়ী দিয়ে দিই, আমার ছেলেরা খুব বিপদে আছে। এতে আল্লাহ যদি খুশ হয়ে আমার ছেলেদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন!

তাই উনি নিজের নামাজের শাড়ীটা দিয়ে দিলেন।

আর এদিকে পাক সেনার অস্ত্র থেকে কিছুই শুলি বেরোচ্ছে না।

যতবার ওরা চেষ্টা করছে, বিকল হয়ে যাচ্ছে ওদের মেশিনগান।

পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল সকালবেলা, বিকেল পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

সারাদিন তাদের কোনও খাবার দেয়া হয়নি।

এমনকী কাউকে প্রস্তাৱ পর্যন্ত করতে দেয়নি।

স্বাইকে মেরে ফেলবে, ঠিক তখনই একদল বিদেশি দেখে ফেলল কী ঘটতে চলেছে।

ওরা বাধা দেয়াতে সে যাত্রায় বাঙালিয়া রক্ষা পেয়েছিল।

এরপর চাচা বহু কষ্টে হেঁটে আমাদের গ্রামে পৌছেছিলেন।

আমরা স্বাই চাচাকে দেখে খুব খুশি হয়েছিলাম।

চাচা অনেকদিন পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন।

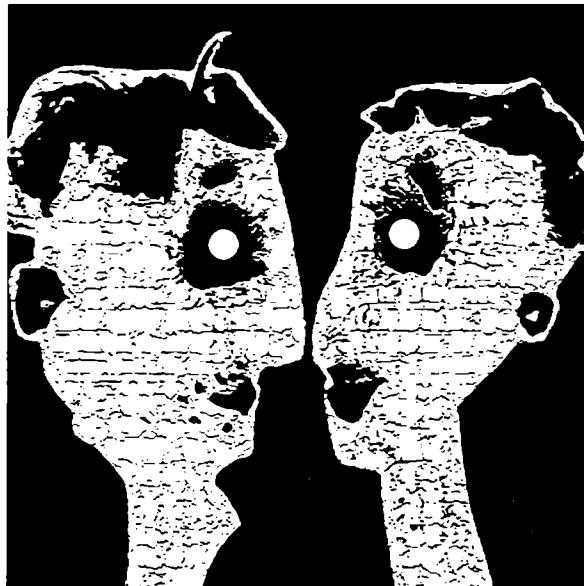
আজ চাচা নেই, বড় ভালবাসতেন আমাদেরকে।

তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমার এই লেখা। ■

অপারেশন অয়েলহেভেন

রাতুল খান

‘এটা
পথিবীর
বৃহত্তম
তেলক্ষেত্র’—
এরকম
ইনফরমেশন
কনফার্ম করার
পরই এই
মিশনটা
চালানো
হয়েছে।



অঙ্কার হতেই চারদিক ধিরে ফেলল ডেল্টা-সীল ফোর্সের ১২ জন চৌকস কমাণ্ডো। অত্যাধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত মার্কিন এলিট ফোর্স ডেল্টা'র ৮ জন এবং সীল-এর ৪ জনের সমষ্টিয়ে গঠিত ১২ সদস্যের চৌকস এই দলটির নেতৃত্বে আছেন মেজর রোলিস, যাঁর কোডনেম ‘ডেল্টা ওয়ান’। তাঁরা যে টপ সিঙ্কেট মিশনে এসেছেন তাঁর কোড নেম ‘অপারেশন অয়েলহেভেন’, পথিবীর বৃহত্তম তেলক্ষেত্র দখলের কমাণ্ডো মিশন! তেলের জন্য একের এর এক দেশ আক্রমণ করে তৈরি সমালোচনা এবং চাপের মুখে থাকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট পরীক্ষামূলকভাবে নতুন কোশল নিয়েছেন। পুরো দেশ আক্রমণ না করে শুধুমাত্র বৃহত্তম তেলক্ষেত্রটি দখলে নেয়া, পরবর্তী বিষয়গুলো কূটনৈতিকভাবে সামলানো হবে।

‘ডেল্টা ওয়ান কলিং ডেল্টা সেভেন। ডু ইউ কপি?’

‘কপি ডেল্টা ওয়ান।’

‘ইজ এভরিওয়ান ইন পজিশন?’

‘পজিটিভ, ডেল্টা ওয়ান।’

‘গুড। ঠিক আটটা বাজতেই আমরা আক্রমণ করব। ওভার।’

‘রাইট, স্যার। ওভার আ্যাও আউট।’

অঙ্ককারে লুমিনাস ঘড়িটার দিকে তাকালেন মেজের, আটটা বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। মেজের রোলিং স্বত্ত্ব বোধ করলেন, এভারিথিং ইজ গোয়িং অ্যাজ প্ল্যানড। পৃথিবীর বৃহত্তম তেলক্ষেত্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে এই পরিস্থিতিতেও হাসি পেল মেজেরে, পুরো সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যানালিসিস করে নিচিত হওয়া গেছে ১০ জনের একটা সুদৃশ্ক কমাণ্ডো ইউনিটই যথেষ্ট তেলক্ষেত্র দখল করার জন্য। বাড়িত সতর্কতা হিসেবে আরও দু'জনকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরেকবার ঘড়ির দিকে তাকালেন মেজের, ঠিক আটটা বাজে। ঘড়িটার একটা বিশেষ সূচীতে চাপ দিলেন মেজের, সাথে সাথে অত্যোক কমাণ্ডোর হাতের ঘড়িতে সিগন্যাল পৌছে গেল। অঙ্ককারে কমাণ্ডোর ভূতের মত নিশ্চিন্দে একে-একে দেয়াল টপকে ঢুকে পড়ল তেলক্ষেত্রের সীমানায়, চোখে বিশেষ নাইট ফ্লাস থাকায় প্রায় দিনের মতই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তারা। প্রথমেই মূল গেটের কাছে থাকা চারজন নিরাপত্তারক্ষীকে নিরস্ত্র করে ফেলল দুজন কমাণ্ডো, বাধা দেয়ার কোন সুযোগই তারা পেল না। তারপর তারা ছুটল মূল ভবনের দিকে। নিতান্ত বাধ্য না হলে রক্তপাতের কোন ইচ্ছে নেই কমাণ্ডোদের।

আপারেশন শুরুর মাত্র আড়াই মিনিটের মাথায় প্রায় বিনা বাধায় দখল হয়ে গেল তেলক্ষেত্র। দশ মিনিটের মধ্যেই তেলক্ষেত্রে কর্মরত বেশিরভাগ কর্মীকেই একটা বড় হলুক্রমে এনে ঢোকানে হলো। একটা শিথি আও ওয়েসন পিঙ্কল হাতে মেজের রোলিং পায়চারী করছেন হলুক্রমে। মেজেরের মুখ অস্বাভাবিকরকম গঁষ্টীর, বিজয়ের আনন্দ

ঠিক যেন উপভোগ করতে পারছেন না। ‘এটা পৃথিবীর বৃহত্তম তেলক্ষেত্র’—এরকম ইনফরমেশন কনফর্ম করার পরই এই মিশনটা চালানো হয়েছে, অর্থাৎ চারদিকের পরিবেশ দেখে এটাকে মোটেই কোন তেলক্ষেত্র বলে মনে হচ্ছে না! বরং...হঠাৎ একজন তরুণ কমাণ্ডো হলুক্রমে প্রবেশ করায় চিন্তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হলো মেজেরে।

‘স্যার, তেল পাওয়া গেছে!’

‘গুড়! কোথায় তেল? আমাকে নিয়ে যাও সেখানে।’

‘যেতে হবে না, স্যার! আমি সাথে করে নিয়ে এসেছি!—হাসিমুরে দু'হাত তুলে দুটো প্লাস্টিকের ট্যাক্সি দেখাল তরুণ কমাণ্ডো।

একটা তেলে পরিপূর্ণ, আরেকটা প্রায় খালি।

‘হোয়াট! আর ইউ কিডিং যি, সোলজার! হোয়াট দু’ ইউ থিক, আমরা এই টপ সিক্রেট আপারেশন চালিয়েছি এই পৌনে দুই ট্যাক্সি তেলের জন্য।’ গর্জে উঠলেন মেজের।

‘আর তো কোথাও পেলাম না, স্যার, জেনারেটর রুমে এই ট্যাক্সি দুটো পেলাম।’ ধূমক খেয়ে মিনিমিন করে জানাল তরুণ কমাণ্ডো।

‘কিন্তু...’ বেগে গিয়ে কিছু বলতে চাইলেন মেজের, কিন্তু রুমের ডেতর সেলফোন হাতে আরেকজন কমাণ্ডো প্রবেশ করায় থেমে গেলেন।

‘স্যার, মিস্টার ওবামা লাইনে আছেন। মিশনের সফলতার জন্য আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানাতে চান।’

বিরস মুখে ফোনটা হাতে নিলেন মেজের, তারপর মুখে জোর করে হাসি টেনে এনে

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

দিনাজপুরে সেবা প্রকাশনীর যে কোন বই-এর জন্য আসুন

বন্ধু পত্রিকা এজেন্সি

স্টেশন রোড, দিনাজপুর।

মোবাইল: ০১৯১৮-৫১০২৭৬

বললেন, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

'কঠোচুলেশনস, মেজর, অন ইয়োর
ব্রিলিয়ান্ট সাকসেস।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। ইটস
আওয়ার সাকসেস, স্যার।'

'আফকোর্স, মেজর! বাট তোমার কষ্ট
এরকম শোনাচ্ছে কেন? ইজ দেয়ার এনি
প্রোবলেম?'

'স্যার, অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ ওয়ান!
তেলক্ষেত্র দখল করেও দেড় ট্যাক্সির বেশি
তেল পাওয়া যায়নি কোথাও!'

'হোয়াট! ওনলি ওয়ান অ্যাও হাফ
ট্যাক্সি! তোমার ঠিক তেলক্ষেত্রাই দখল
করেছ তো? বিটিভি ভবন, রামপুরা, ঢাকা,
ব্যাংলাড্যুশ?'

'পজিটিভ, স্যার! আমরা এখন বিটিভি
ভবনের কংক্রিট রুমে।'

'অ্যাও ইউ সি নো অয়েন? আর ইউ
আউট অভ ইয়োর মাইগ, মাই বয়? হ্যাভ ইউ
সার্চড দ্য নিউজ প্রেজেটেশন রুম? ৮টার
সংবাদ হয় যেখানে!'

'হোয়াট ৮টার সংবাদ, স্যার? নেতার হার্ড
অ্যাবাউট দ্যাট!'

'ওহ, পুওর বয়! গো অ্যাও সি দ্য নিউজ
স্টুডিও, ৮ টার সংবাদ হচ্ছে যেখানে। তবে
সাবধানে পা রেখো, তেলে পিছল খেয়ে আছাড়
খেলে মাজা ভাঙতে পারে! হা হা হা! মোবাইল
কানে ধরে রেখেই প্রায় হতভদ্র অবস্থায় নিউজ
স্টুডিওতে উঁকি দিলেন মেজর, ৮ টার সংবাদ
পাঠ হচ্ছে সেখানে। বাংলাদেশে আসার
আগে বাংলা ভাষাটা মোটামুটি রঙ করে
এসেছেন, কাজেই সংবাদের ভাষ্য বুঝতে
কোন সমস্য হলো না মেজরের। মাত্র এক
মিনিট দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মেজর
রোলিং।

'ইউ আর ড্যাম রাইট, মিস্টার
প্রেসিডেন্ট! রীতিমত তেলের বন্যা বইছে।
জাস্ট লাইক আওয়ার নায়গ্রা ফলস!'

'হা হা হা! বলেছিলাম না, আমার কাছে
তথ্য আছে! বাউ টেল মি, মেজর, হাউ মেনি
ব্যারেলস ক্যান উই গেট ডেইলি?' ■

প্রকাশিত হয়েছে তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১৩২

শামসুন্দীন নওয়াব

আমি ভূত/শামসুন্দীন নওয়াব: কিশোর ভূত
বিশ্বাস করে না। কিন্তু মৃত্যু আর বিবন বলছে
কিশোরদের নতুন বাড়ো ভূতভূতে। দুটো
পরিবার স্বেচ্ছ উদ্ধাও হয়ে গিয়েছিল ও বাড়ি
থেকে। ডেন বলছে ও নাকি ঘরের তিতরে ভূত
দেখেছে। কিশোর উড়িয়ে দিল ওর কথা। কিন্তু

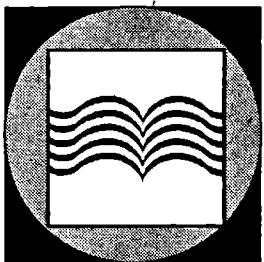
আসলে কী ঘটছে বাড়িতাতে?
মহাকাশের ভূম্বকর/শামসুন্দীন নওয়াব: ঘটনার
শুরু দুর্ঘটনা দিয়ে। মহাকাশে দুটি স্পেসশিপ
পরস্পর জড়ে গেছে। এসময় উদয় হলো
কিশোর আর হিকু চাচা। শিপ দুটোকে আলাদা
করার দায়িত্ব নিল তারা। আবিষ্কার করল,
যাঁদের মধ্যে কেউ ড্রাগ চোরাচালানে
জড়িত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিশোর আর হিকু
চাচাকেই চোরাচালানকারী হিসেবে অভিযুক্ত
করা হলো। দেয়া হলো দেখামাত্র শুলির
নির্দেশ। এদিকে তাওব শুরু করেছে হিংস্র জন্ম
যানন্দেশের দল, খুন করছে মানুষ। কতদিক
সামলাবে চাচা-ভাতজি?

রহস্যতেলী/শামসুন্দীন নওয়াব: কানাডা পৌছেই
তিন গোয়েন্দা জানল, খদের জন্য রয়েছে
মহাজিল দু-দুটি কেস: জাদুয়ার থেকে কোথায়
গেল শত বছরের পুরানো সোনা ও সেখক জ্যাক
লণ্ঠনের ব্যাগ?...নামকরা প্লেডের প্রতিযোগিতায়
মাশারদের স্যাবোটাজ করলে কে বা কারা?
তদন্তে নামল কিশোর-মুসা-রবিন্স, জানত না
মন্ত্র বিপদে পড়বে!

দাম ■ আশি টাকা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-কুম্ব
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০





বই-পরিচিতি

মীর কাশেম আলী

বাউলি হাস্টার্স ১,২-কাজী
আনোয়ার হোসেন। প্রকাশক:
সেবা প্রকাশনী।

পঞ্চ-ব্যাখ্যামে ২৭২ ও ২৫৬
(নিউজিপ্রিণ্ট)। দাম-ব্যাখ্যামে
শীঘ্ৰশি ও আশি টাকা।

মাসুদ রানা সিরিজের ৪৩৩,
৪৩৪ তম বইয়ের কাহিনি
এটি। সাংবাদিক বিপদে
পড়েছে রানার ঘনিষ্ঠ বক্তৃ রবিন
কাল্টন। চিফের অনুমতি
পেনে বক্তৃকে সাহায্য করতে
সাইবেরিয়া উদ্দেশে রওনা
হলো রানা। কিন্তু ও জানে না
বিশ্বের সবচেয়ে ড্যাক্সে
ব্যবসায়ী সংগঠন ও সহ মোট
১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড
দিয়েছে—কার্যকর করা হবে
তিনি দিনের মধ্যে।

সাইবেরিয়ায় পৌছেই ও
বুক্তে পারল, সত্যিকারের
বিপদ কাবে বলে। ওকে ঘিরে
ফেলল একদল রক্তপিণ্ডাচ
বাউলি হাস্টার...এখানে
কাহিনির সামান্য অংশ তুলে
দিচ্ছি: সাগরের গভীর অংশে
ভাসছে একজন—মাসুদ রানা!
জ্বলন্ত যাগরিগ রাস্তা ছাড়তেই
গিয়ে সাগল ভাসমান মিরাজ
সাইটারের নাকে। কিন্তু তখন



ওখানে রানা ছিল না। রাস্তা
থেকে ট্রাকের চাকা সরতেই
ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে
ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মুহূর্তের
জন্য ওর মাথার ওপর দিয়ে
গেছে ট্রাক। তারপর ফাইটারে
গিয়ে লাগল ইয়াজদাহা রিং।
তখনই ড্যাক্সের বিক্ষেপণ
হলো। আওয়াজে তালা লেগে
গেল কানে। চারপাশে ছিটকে
গেল ভাঙ্গচোরা, পোড়া ধাতব
টুকরো। ওই বিক্ষেপণের
তিরিশ ফুট নীচেই ছিল রানা।
সাই-সাই করে পড়েছে, আর
তখনই দেখল উপরে কাজা
আওনের গোলা। তিশা বা
কুয়াশা ওর পতন দেখেনি।
ট্রাক থেকে খসে পড়ার সময়
নিজেকে সত্যিকার বুলেট ঘনে
হয়েছে রানার। পড়তে লাগল
ও, কিন্তু তখনও ট্রাকের
গতিরেখের কারণে একপাশে
ছিটকে যাচ্ছে। পাশ কাটিয়ে
উপরে উঠতে শুরু করেছে
খাড়া পাহাড়ের
প্রাচীর...কাহিনিটি শুরু থেকে
শেষপর্যন্ত পাঠককে মুক্তুর্মুক্ত
করে রাখে। রনবীর আহমেদ
বিপুরের প্রচন্দ কাহিনির সঙ্গে
সামুজ্য রক্ষা করতে পেরেছে।

হেওরেসন দ্য রেইন কিং-সল
বেলো। কৃপাত্তি: বাবুল
আলম। প্রকাশক: সেবা
প্রকাশনী। পঞ্চা-১৬০
(নিউজিপ্রিণ্ট)। দাম-সাতাশ
টাকা।

নোবেলজয়ী লেখক সল
বেলোর এটি একটি
আডভেঞ্চার কাহিনি।
কাহিনির নায়ক

হেওরেসন-ভবয়ুরে কিন্তু দরিদ্র
নয়। কারণ বাবাৰ কাছ থেকে
সে পেয়েছিল তিৰিশ লাখ
ডলার। হট করে সে চলে এল
আফ্রিকায়। এৰপৰ সে জড়িয়ে
পড়ল নানা ধৰনেৰ রোমাঞ্চকৰ
ঘটনায়। বন্দি হলো
আদিবাসীদেৱ হাতে। প্রাণ
যায় যায় অবস্থা...এখানে
বইটি থেকে সামান্য অংশ
তুলে দিচ্ছি: আমাৰ কানে
ডেসে এল প্রচণ্ড এক গৰ্জন।
নীচে তাকালায় আমি। চোখে
পড়ল প্রকাণ, ড্যাক্সে, খেপা
সিংহেৰ মুখ। কেশৰে ঢাকা।
সমস্ত মুখে অসংখ্য কুৰুণ।

ফুলে ফুলে উঠছে হত্যাৰ বন্য
আক্রমণে। হস্তৰ দিছে,
বিক্ত হচ্ছে চওড়া কপাল।
রঞ্জেৰ লোতো দাপাছে জিভ।

আমাৰ শৰীৰে লাগছে
সিংহটাৰ নিঃশ্বাস। নামানো
হয়েছে হড়কালা দৱজাটা।
সিংহটা এখন ঘৰোৱা মধ্যে
বন্দি। হাত থেকে দড়ি আলগা
কৰলেন দাহকু। দোল খেল
খাচাটা, নেমে গেল একটু
নীচে। পাথৰ ও খাচাটা নজৰে
পড়ল সিংহটাৰ।

পাথৰগুলোকে ধৰা মারার
জন্য লাফিয়ে উঠল ও কিন্তু
বৰ্ষ হলো ওৱ প্ৰচেষ্টা। দাহকু
খাচাটাৰ উপৰে চোখ রেখে
শক্ত হাতে ধৰে রাখলেন
দড়িটাকে। বাদক দলেৱ

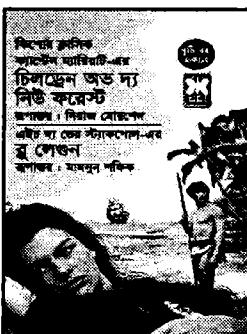


সামনে দাঁড়িয়েছিল বুনাম-এর
সহকারী। কিছুটা এগিয়ে
বশীর গোড়া দিয়ে সিংহটার
কপালে খোঁচা মারল ও।
মাচানের খুঁটিতে ধার্ঘা খেল
সিংহটা; মড়মড় শব্দে থেকে
যেতে লাগল খুঁটিগুলো। আর
একবার একবার পাথর ছোড়া
হলো ওকে শক্ষ করে। ওকে
ভাড়িয়ে ঝুলত বাঁচাটাৰ নীচে
নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে
ওয়ারিরিৱা। বাঁচার দড়ি আৱাণ
একটু ছেড়ে দিলেন রাজা,
কিন্তু ওটাকে ঠিক যত ফেলতে
পারলেন না তিনি। সিংহের
শুধু মাথাটাই আটকে পড়েছে
জালে, সামনের থাবা দুটো
জাল সেদ করে বাইরে বেরিয়ে
আছে...আগাগোড়া টানটান
উজেজনায় ভৱপূর এই
কাহিনিৰ সব শ্ৰেণীৰ পাঠকের
কাছে আন্দৃত হবে। বইটিৰ
দৃষ্টি নদন প্রচন্দেৰ জন্য
ৱনবীৰ আহমেদ বিপুলকে
ধন্যবাদ।

চিল্ড্রেন অভ দ্য নিউ ফরেস্ট
ও বু সেন্টুন-ক্যাপ্টেন
ম্যারিয়াট ও এইচ দ্য ডের
স্ট্যাকপোল। ইপ্পোতু: নিরাজ
মোৱাল্দেদ ও মায়মুন শফিক।
পৃষ্ঠা-২২৪ (নিউজিঞ্চি)।

দাম-আটাস্টাৰ টাকা।
অনেক দিন আগে এ দুটো
ক্লাসিক কাহিনি পথক
পথকভাৱে প্ৰকাশিত হয়েছিল।

এবাৰ ওই দুটো কাহিনি
একত্ৰে ভলিউম আকাৰে
প্ৰকাশিত হলো। 'চিল্ড্রেন
অভ দ্য নিউ ফরেস্ট'-এৰ
কাহিনি গৃহযুদ্ধ চলাকলীন
ইংল্যাণ্ডে। গৃহযুদ্ধ চলছে
ইংল্যাণ্ডে। রাজা চাৰ্লস
পালালেন হ্যাম্পটন কোর্ট দুৰ্গ
থেকে। তাৰ খোজে জঙ্গল
চৰে ফেলল সৈনিকৰা। শেষে
কৰ্নেল বিভারলিৰ বিশাল
বাঁচাটায় আভন্ন ধৰিয়ে
দিল...কাহিনি এগিয়েছে
এভাৱেই। বইটিৰ অপৰ
কাহিনি 'বু সেন্টুন' থেকে
সামান্য অংশ এখানে তুলে
দিছিঃ নৌকোটা জলেৰ মাঝে
দেখতে পেয়ে দাঢ় বেয়ে
ডাঙীয়া ফিৰিবাৰ চেষ্টা কৰেছিল
এমেলিন। ভয়, আতঙ্কে হাত
কাঁপছিল ভাৰ। দাঢ় পড়ে
গেল জলে। একটা দাঢ় নিয়ে
সে অসহায় হয়ে পড়ল। তা
ছাড়া গুলুইতে বসে একটা
দাঢ় দিয়ে নৌকো চালানোৰ
কায়দাও সে জানে না। তয়



বিবৰণ কুনিস
অভিযোগ মারিয়াট-এৰ
চিল্ড্রেন অভ দ্য
নিউ ফরেস্ট
অভ দ্য নিউ ফরেস্ট
ক্লাসিক কাহিনিৰ পথক
পথকভাৱে প্ৰকাশিত হয়েছিল।

কাটিয়ে ওঠাৰ চেষ্টা কৰল
পয়লা, ভাবল, ডিক এসে
পড়বে। ভাতা আৰ নৌকোৱ
দূৰত্ব বাড়ছেই। ডিকেৰ পাতা
নেই। ওৱ শৰীৰ ভয়ে বৰফ
হয়ে গেল। বাঁড়িৰ ভয়কৰ
দৃশ্য কৰ্মেই কাছিয়ে আসছে।
বড় হয়ে আসছে উন্মুক্ত মুখেৰ
হা। বাঁড়িৰ ফাকে নৌকোটাকে
টেনে নিয়ে যাচ্ছে সমুদ্ৰ।
তখনি দেখতে পেল সে
ডিককে। বাঁপিয়ে পড়ল ডিক
জলে। হাত-পাণ্ডলো
প্ৰপেলারেৰ মত দ্রুত পানি
কাটছে। শাস বৰু হয়ে
আছে এমেলিনৰ। দাঢ়াটা
ধৰে ফেলল ডিক। স্বতিৰ
নিঃশ্বাস ফেলল এমেলিন।
আৱ অল্প বাঁকিটা পথ- দ্রুত
এগিয়ে আসছে ডিক...য়াৱা
ক্লাসিক কাহিনিৰ ভঙ্গ তাঁদেৰ
জন্য বইটি অৰশ্য পাঠ্য
হিসেবে বিবেচিত হবে।
কাহিনিৰ সঙ্গে সংস্কৃতিৰ রেখে
প্ৰচন্দ কৰেছেন শিল্পী ডিক্টুৰ
নীল। ■

বইয়েৰ জগতে আপনাকে স্বাগতম

সেবা ও প্ৰজাপতি প্ৰকাশন-এৰ গল্প, উপন্যাস, ওয়েস্টাৰ্ন, ক্লাসিক, অনুবাদ, তিন
গোয়েন্দা, কিশোৱ হৱৱ, মাসুদ রানা ও যাবতীয় রিপ্ৰিণ্ট বই বিক্ৰেতা

নিউজ হোম

৭ গোল্ডেন প্লাজা, সোনাদীঘিৰ মোড়, রাজশাহী।



Aohor Arsalan HQ Release

**Please Buy The Hard Copy if You
Like this Book!!**

www.Banglapdf.net